সহকারি মৎস্য কর্মকর্তা/ক্ষেত্র সহকারীদের জন্য এনএটিপি-২ প্রকল্পাধীন মাছচাষের প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

মেয়াদ ঃ দিন

b¨vkbvj GwMÖKvjPvivj †UK‡bvjwR †cÖvMÖvg- †dR II cÖKí (GbGwUwc-2),
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ক্ষেত্র সহকারীদের জন্য এনএটিপি-২ প্রকল্পাধীন মাছচাষের প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

(মেয়াদ: ৩ দিন)

দিন	কোর্সের বিষয়m~wP									
	০৮.০০-০৮.৩০	০৮.৩০-০৯.৩০	চা	০৯.৪৫-১০.৪৫	১০.৪৫-১১.৪৫	চা	১২.০০-১৩.০০	১৩.০০-১৪.০০	Pv	সান্ধ্যকালীন কাজ
১	নিবন্ধন ও কোর্স উদ্বোধন	কোর্সের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রাক-মূল্যায়ন, কোর্স পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা	বিরতি	এনএটিপি-২ প্রকল্পের পরিচিতি ও কার্যক্রম	চাষযোগ্য মাছ ও চিংড়ির পরিচিতি , বিভিন্ন ধরনের মাছচাষ পদ্ধতি ও পুকুরের শ্রেণিবিন্যাস	বিরতি	মাছচাষে মাটি ও পানির গুণাগুণ	নার্সারি ব্যবস্থাপনা (কার্প ও গলদা)	w i w!	পুকুর রেকর্ড বই বহার, ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
২	পুনরালোচনা ও প্রতিভাব	মাছচাষে মজুদ-পূর্ব ব্যবস্থাপনা		মাছচাষে মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা	মাছচাষে মজুদ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা		প্রকল্প কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ পরিচিতি ও তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, ও রুই-জাতীয় মাছের বাণিজ্যিক চাষ		জেন্ডার সচেতনতা ও মাছচাষে নারী
৩	পুনরালোচনা ও প্রতিভাব	উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (GAqP), এবং মাছের রোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা		মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যায় বরফের ব্যবহার	মাছচাষে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা		মৎস্য সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা	কোর্স পুনরালোচনা, প্রশিক্ষণ-পরবর্তী মূল্যায়ন, কোর্স মূল্যায়ন এবং সমাপনী		

সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ক্ষেত্র সহকারীদের জন্য এনএটিপি-২ প্রকল্পাধীন মাছচাষের প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ‡Kvm© *(মেয়াদ: ৩ দিন)*

‡Kv‡m©i w #$m~P

w%b	ক্রমিক নং	w #$	c&
		প্রশিক্ষণ সময়সূচি	০২
১ম দিন			
	১.১	নিবন্ধন, কোর্স উদ্বোধন	
	১.২	কোর্সের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রাক-মূল্যায়ন, কোর্স পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা	
	১.৩	**এনএটিপি-২** প্রকল্পের পরিচিতি ও কার্যক্রম	১৩
	১.৪	চাষযোগ্য মাছ ও চিংড়ির পরিচিতি , বিভিন্ন ধরনের মাছচাষ পদ্ধতি ও পুকুরের শ্রেণিবিন্যাস	২০
	()*	মাছচাষে মাটি ও পানির গুণাগুণ	৪১
	১.৬	নার্সারি ব্যবস্থাপনা (কার্প ও গলদা)	৪৮
	১.৭	পুকুর রেকর্ড বই ব্যবহার, ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৫৭
2$ w%b			৭৪
	২.১	মাছচাষে মজুদ- পূর্ব ব্যবস্থাপনা	৭৬
	২.২	মাছচাষে মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা	৯০
	২.৩	মাছচাষে মজুদ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা	১০০
	২.৪	প্রকল্প কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	১১৪
	২.৫	বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ পরিচিতি, এবং তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, ও রুই- জাতীয় মাছের বাণিজ্যিক চাষ	১২১
	২.৬	জেন্ডার সচেতনতা ও মাছচাষে নারী	১৩৭
+$ w%b			১৪২
	৩.১	উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (GAP), ও মাছচাষে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	১৪৪
	+)2	মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যায় বরফের ব্যবহার	১৫১
	৩.৩	মাছচাষে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা	১৬৪
	৩.৪	মৎস্য সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা	১৭১
	৩.৬	কোর্স পুনরালোচনা, প্রশিক্ষণ-পরবর্তী মূল্যায়ন, কোর্স মূল্যায়ন এবং সমাপনী	১৮৭

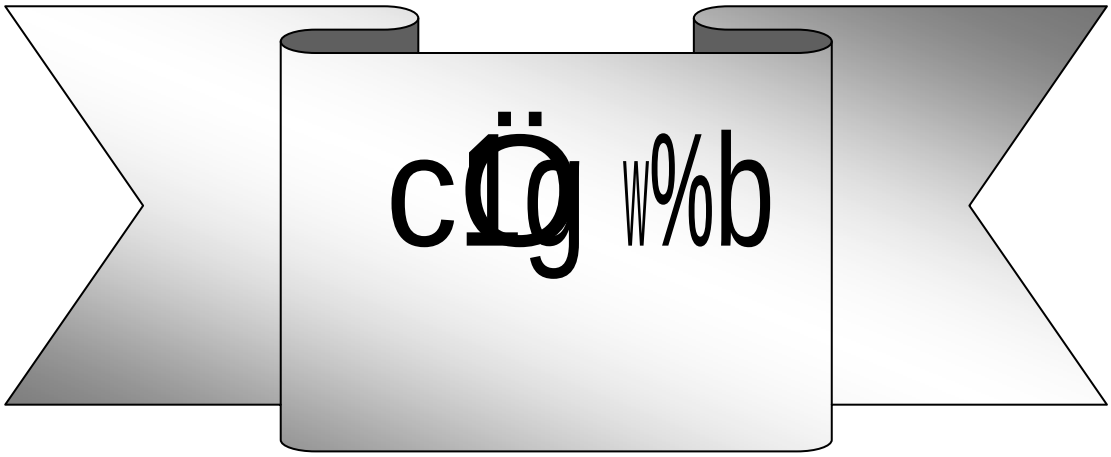

cÖg w%b

- নিবন্ধন, কোর্স উদ্বোধন
- কোর্সের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কোর্স পরিচিতি, প্রাক-মূল্যায়ন, ও প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা
- **এনএটিপি-২** প্রকল্পের পরিচিতি ও কার্যক্রম
- চাষযোগ্য মাছ ও চিংড়ির পরিচিতি , বিভিন্ন ধরনের মাছচাষ পদ্ধতি ও পুকুরের শ্রেণিবিন্যাস
- মাছচাষে মাটি ও পানির গুণাগুণ
- নার্সারি ব্যবস্থাপনা (কার্প ও গলদা)
- পুকুর রেকর্ড বই ব্যবহার, ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

2wgKv

বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা প্রধানত ক্ষুদ্রচাষিদের সমন্বয়ে গঠিত। শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, ইত্যাদির প্রত্যেকটিতেই সংশ্লিষ্ট চাষিদের উৎপাদনশীলতা যথেষ্ট নয়। নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ব্যবহারের দ্বারা এই উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর প্রয়োজন হয়েছে ক্রমবর্ধমান চাহিদা বৃদ্ধির কারণে। অপর দিকে উৎপাদিত পণ্যের যথেষ্ট মূল্য না পাওয়া গেলে ক্ষুদ্রচাষিসহ সকল চাষিই ক্ষতিগ্রস্থ হবেন, ফলে চূড়ান্ত বিচারে উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাহত হবে। এ অবস্থা নিরসনকল্পে বাংলাদেশ সরকার বর্ধিত উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন, সাপ্লাই চেইন (ব্যবসায়, প্রক্রিয়াজাতকরণ), মূল্য সংযোজন এবং বাজার সংযোগের মাধ্যমে কৃষিখাতের উন্নয়নের প্রতি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে সমন্বিত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য এনএটিপি-২ প্রকল্প সরকার বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কিত এই কর্মসূচিটি ৩ টি ফেইজে বাস্তবায়িত হবে।প্রথম ফেইজ ২০০৮-২০১৪ সনে বাস্তবায়িত হয়েছে। এনএটিপি-২ সার্বিক কর্মসূচির দ্বিতীয় ফেইজ বা পর্যায়। এই প্রকল্পের পুরোনাম National Agricultural Technology Program Phase II Project (NATP-2).

K) cÖKí m-3wK'! mv4vi. !1¨v wj

১. প্রকল্পের নাম ঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-ওও প্রকল্প (এনএটিপি-২)

২. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ ক. কৃষি মন্ত্রণালয় (Ministry of Agriculture) এবং
খ. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (Ministry of Fisheries & Livestock)।

৩. বাস্তবায়নকাল ঃ ০১ অক্টোবর ২০১৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

৪. প্রকল্প এলাকা ঃ ক. গবেষণা অংগঃ সমগ্র বাংলাদেশ; এবং
খ. সম্প্রসারণ কর্মসূচি : ৫৭টি জেলার ২৭০টি উপজেলা (পুরাতন ১ টি উপজেলাসহ)
গ. ভ্যালুচেইন কর্মসূচি : মৎস্য অধিদপ্তর অংশে ২০টি উপজেলায় ২০টি প্রডিউসারস অর্গানাইজেশন (PO/ পিও), ময়মনসিংহ ও নাটোরে ২টি বিশেষ পিও

৫. বাস্তাবয়নকারী সংস্থাঃ

এনএটিপি- ২প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে ৩টি বিষয়ের সমন্বয়ে। সেগুলো হলো- (ক) কৃষি গবেষণা, (খ) কৃষি সম্প্রসারণ এবং (গ)সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন। এ তিন ধরনের বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ করবে প্রকল্প সমন্বয়কারী ইউনিট (পিএমইউ), যা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বধায়নে কাজ করে। কৃষি সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার সাথে তিনটি সরকারী সংস্থা, যথা- (১) মৎস্য অধিদপ্তর, (২) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, এবং (৩) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জড়িত। মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য উপখাতের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি দায়িত্বপ্রাপ্ত।

৬. প্রকল্পের উন্নয়ন উদ্দেশ্য ঃ

ক. এনএটিপি-২ প্রকল্পের উন্নয়ন উদ্দেশ্য হল ক্ষুদ্রচাষিদের কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং নির্বাচিত জেলাসমূহের বাজারে ক্ষুদ্রচাষিদের প্রবেশ-সুবিধার উন্নতি করা।

খ. প্রকল্পের মৎস্য অধিদপ্তর অংশের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্পের মৎস্য অধিদপ্তর অংশ প্রকল্পের উন্নয়ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবে-একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা, মান এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং মৎস্যচাষিদের জন্য উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করে; এবং

গ. উচ্চ মূল্য সম্পন্ন পণ্যের সংগ্রহোত্তর মূল্য সংযোজন ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি।

৭. প্রস্তাবিত মূল কর্মসূচি

প্রকল্পটি মূলত ৩টি অংগে বিভক্ত-

(১) কৃষি গবেষণা অংগ- যা শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ গবেষণাসহ সার্বিকভাবে কৃষি গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করবে;

(২) কৃষি সম্প্রসারণ অংগ- যা শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পালন সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করবে; এবং

(৩) ভ্যালু চেইন উন্নয়ন অংগ যা উৎপাদিত কাঁচামালের সাথে মূল্য সংযোজন করে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বাড়াতে সহায়তা দেবে।

এই তিনটি অংগের কার্যাবলির সমন্বয়

এনএটিপি-২ এর বিভিন্ন অংগ বাস্তবায়নে একাধিক মন্ত্রণালয় ও সংস্থা জড়িত থাকায় এর সার্বিক সমন্বয়ের কাজ করবে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Project Management Unit/ PMU)। তাছাড়া প্রতিটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা যথা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর নিজ নিজপ্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (Project Implemenation Unit/ PIU) থাকবে।
এছাড়া কৃষকদের চাহিদা মোতাবেক কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সার্বিক চাহিদা মেটানোর নিমিত্ত আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সাধন করা হবে। অপরদিকে, নীতি নির্ধারণ বা চাহিদা মাফিক নীতি প্রণয়নের জন্য উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটিগুলো কাজ করবে। জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটিগুলো উপজেলা পর্যায়ের সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটিগুলোর কাজ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনে কারিগরী পরামর্শ প্রদান করবে।

5) g,m¨ m-cÖi. 6 cÖ7. m-3K'! Kv/'Ög

প্রকল্পের বিকেন্দ্রীকৃত সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর অংশের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

() Kgb 8Uv‡i: MÖc (mAv8R) **(Common Interest Group- CIG)** M<b

প্রকল্পভুক্ত উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে ২ (দুই) টি করে সিআইজি গঠন করা হবে। সিআইজির সদস্য হবে মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবি ও মৎস্য কার্যক্রমে জড়িত ব্যাক্তিবর্গ। সিআইজি সদস্যদের মধ্যে ন্যূনতম শতকরা ৩ ভাগ মহিলা সদস্যের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে। একই ধরনের মৎস্য কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে একই সিআইজি-এর আওতায় সংগঠিত করা হবে। সিআইজি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হবে যা তাদের নিজস্ব বাই-লজ দ্বারা পরিচালিত হবে।

ইউনিয়ন সম্প্রসারণ সহায়তাকারী দল **(Union Extention Facilitation Team- UEFT)**এর সহায়তায় কৃষকরাই সিআইজি-এর গঠনতন্ত্রের আলোকেনিজ নিজ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সিআইজি-এর কাজের পরিধি প্রধানত ইউনিয়ন এক্সটেশন মাইক্রো প্লান তৈরি ও বাস্তবায়ন; সিআইজি সদস্য ও সাধারণ কৃষকদের কারিগরী সমস্যা সমাধানে **UEFT-**এর সাথে পরামর্শ করা; সময়মত সার ও বীজসহ অন্যান্য উপকরণ পেতে **UEFT**এর সাথে কাজ করা; সাধারণ ও কারিগরী পরামর্শের জন্য **FIAC** এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সর্বোপরি সিআইজি সদস্যরা নিয়মিত প্রশিক্ষিত হয়ে তৃর্ণমূল পর্যায়ে সাধারণ কৃষকদের মধ্যে মানসম্মত সম্প্রসারণ বিকেন্দ্রীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া সিআইজিগুলো সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হবে এবং সঞ্চয় করবে। সঞ্চিত অর্থ পুনঃবিনিয়োগে ব্যয় করারমাধ্যমে নিজেদের আয় বাড়ানোয় সচেষ্ট থাকবে। এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২ এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে প্রতিযোগীতায় উত্তীর্ণ সিআইজিসমূহ তাদের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে।

2) =b?$ g,m¨ m-cÖi. cÖb4 (jd)**(Local Extension Agent for Fisheries- LEAF)** b Pb@

ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে কোন সম্প্রসারণ কর্মী না থাকায় প্রতি ইউনিয়নে স্থানীয় মৎস্যচাষি, পোনা চাষি, পোনা ব্যবসায়ী বা মৎস্য কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্য হতে ০১ (এক) জন লিফ নির্বাচন করা হবে। সম্প্রসারণ পদ্ধতি ও মৎস্য কার্যক্রম সর্ম্পকে কারিগরী বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লিফগণের দক্ষতা উন্নয়ন করে স্থানীয়ভাবে মৎস্য বিষয়ক সাধারণ পরামর্শ প্রদানের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা হবে। লিফগণকে সম্প্রসারণ ও পরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি বাইসাইকেল, একটি পানির গুণাগুণ মাপার কীট এবং মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ ও উপজেলা কার্যালয়ে তা প্রেরণের জন্য একটি করে ঞধনষবঃ চঈ দেওয়া হবে।

লিফগণ ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থাপিত **FIAC**-এ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা **(SAAO)** এবং কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্ট ফর লাইভস্টক **(CEAL)** এর সাথে ইউনিয়ন সম্প্রসারণ রিসোর্স টিমের **(UEFT)** সদস্য হিসেবে কাজ করবে। সিআইজি প্রশিক্ষণ, মৎস্যচাষ প্রদর্শনী স্থাপন ও চাষিদের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরসহ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে লিফ উপজেলা মৎস্য টিমকে সহায়তা প্রদান করবে।

+) cÖWBmvm"Ai Mvbv8‡Rkb **(Producers' Organization- PO)** M<b@

সিআইজি তাদের কাজের গতি তরান্বিত করার জন্য ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলাভিত্তিক প্রডিউসার্স অরগানাইজেশন **(Producers' Organization- PO)** গঠন করবে। প্রতিটি পিও গঠিত হবে ন্যূণপক্ষে ১,০০০ জন উৎপাদকের সাহায্যার্থে এবং তা পরিচালিত হবে একটি নির্বাচিত কার্যকরি পরিষদ দ্বারা।

প্রডিউসার্স অরগানাইজেশন প্রধানত সিআইজিকর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে। এ প্রকল্পের স্থায়িত্বের জন্য প্রডিউসার্স অরগানাইজেশনগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পে ময়মনসিংহ এবং নাটোর জেলায় দুইটি স্থানে বিশেষ পিওসহ আরও ২০ টি সাধারণ পিও অন্য ২০ টি উপজেলায় গঠিত হবে। বিশেষ পিও কেন্দ্রে উৎপাদিত মাছের প্রাথমিক পরিচর্যা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। যেমন : মাছ ধরার ব্যবস্থা, বরফের ব্যবস্থা, স্বল্প সময়ের জন্য বরফ ও মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা, মাছ প্যাকেজিং এর ব্যবস্থা, তাজা মাছের জন্য পানির ব্যবস্থা, কার্যাবলি সমন্বয় ও পরিচালনার জন্য একটি অফিস, ইত্যাদি।

C) cÖKÒ. Kv/Ug @

(()mÉEj †2vM?‡%i cÖKÒ.

নূতন-পুরাতন সকল সিআইজি সদস্যকে মাছচাষ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সিআইজি নেতাদেরকেও দলীয় সৃংখলা রক্ষা এবং দলীয় ভিত্তিতে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সিআইজিদের কাছ হতে যে সব সাথি চাষি প্রযুক্তি গ্রহণ করে মাছচাষ কার্যক্রমে বিশেষ ভাবে আগ্রহী থাকবেন তাদেরকেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যেন প্রযুক্তি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ তাদের জন্য সহজ হয়। উপজেলা মৎস্য অফিস এসকল প্রশিক্ষণ সরাসরি বাস্তবায়ন করবে। প্রডিসারর্স অর্গানাইজেশন এর নেতাদেরকে মাছচাষের পাশাপাশি উৎপাদিত পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

ইউনিয়ন পর্যায়ে সিআইজি চাষিদের একটি কর্মশালা পরিচালিত হবে যেখানে চাষিগণ তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা একে অপরের সাথে বিনিময় করতে পারবেন।

লিফগণ মাছচাষ ও সম্প্রসারণ ছাড়াও অন্যান্য কয়েটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন, যেমন : প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ, পানির গুণাগুণ পরিমাপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং তথ্য প্রযুক্তি ও ভিডিও ক্লিপভিত্তিক সম্প্রসারণ পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ। মৎস্য অধিদপ্তরের সুবিধাজনক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ প্রশিক্ষণসমূহ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষিত লিফগণ সিআইজি সদস্যগণের মাছচাষ কার্যক্রম তদারক করতে পারবেন, নিজেদের মাছচাষকে আরও উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবেন এবং সম্প্রসারণ পদ্ধতির সফল প্রয়োগ দ্বারা ইউনিয়নের সকল চাষির নিকট পরামর্শ সেবা দিতে পারবেন।

কিছুসংখ্যক নার্সারি অপারেটরকে তাদের কাজের ওপর ৩ দিন ব্যাপি বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এই প্রশিক্ষণ বিশেষ বিশেষ প্রজাতির যথেষ্ঠ সংখ্যায় সুস্থ সফল পোনা সহজ প্রাপ্য করবে। একইভাবে কিছু সংখ্যক হ্যাচারি অপারেটরকেও বিশুদ্ধ (Pureline Brood) জাতের পোনা উৎপাদনের উপর ২ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। কিছু সংখ্যক উদ্যোক্তাকে স্থানীয় উপাদান সহকারে মৎস্য খাদ্য তৈরি বিষয়ে ১ দিনের একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এটি অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে স্থানীয়ভাবে উন্নতমানের মৎস্য খাদ্য তৈরিতে সয়াহক হবে।

মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকৃত মূল্য সংযোজনী দ্রব্যাদি উৎপাদন বিষয়ে কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

*) Pvlx# !1¨ 6 civgk'†K›`ª(Farmers' Information & Advice Centre- FIAC) cÖ'v@

শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের সঙ্গে সংশিষ্ট চাষি বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিগণ এক জায়গা থেকেই যেন তাদের সমস্যা সমাধানের পরামর্শ পেতে পারেন সেজন্য ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে ফারমার্স ইনফরমেশন এ্যান্ড এ্যাডভাইস সেন্টার **(FIAC)** প্রতিষ্ঠিত হবে।কৃষকের চাহিদা উপযোগী আধুনিক তথ্য কেন্দ্র হিসাবে প্রতিটি **FIAC**-কে গড়ে তোলা হবে। কৃষি সংক্রান্ত সেবাদানের জন্য **UEFT**-এর সদস্যবৃন্দ **(SAAO, LEAF, CEAL,) FIAC**-এ নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে উপস্থিত থাকবেন। ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে একটি কক্ষ লিফ ও সিল এর জন্য নির্দিষ্ট করে সংরক্ষিত থাকবে। ইউনিয়নে পর্যায়ে **FIAC**P ।ষিদের জন্য ***One Stop Service Center*** হিসাবে কাজ করবে।

F) Bc‡Rjv wi‡mvm'U?g (Upazila Resource Team- URT) M<b@

উপজেলাভিত্তিক দক্ষ ও কারিগরী কর্মকর্তাদের নিয়ে উপজেলা রিসোর্স টীম গঠন করা হবে। যেহেতু, উপজেলা কৃষি অফিসার/ উপজেলা মৎস্য অফিসার/ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার সার্বক্ষণিকভাবে প্রশাসনিক কাজ এবং রাজস্ব খাতের বিভিন্ন কার্যক্রম অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যস্ত থাকেন, সেহেতু, উপজেলায় অবস্থানরত কারিগরী কর্মকর্তাগণই এ টীমের সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবেন। বিশেষভাবে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এই টিম-এ অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত কৃষি অফিসার (এএও) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার (এইও), মৎস্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ অফিসার (ইও) ও সহকারী মৎস্য অফিসার এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভেটিরিনারী সার্জন (ভিএস) সমন্বয়ে **URT**গঠিত হবে। উক্ত দলের দলনেতা/ সদস্য সচিব হিসেবে পর্যায়ক্রমে এইও, ভিএস এবং ইও দায়িত্ব পালন করবেন।

URTএর কাজের পরিধি হবে- ইউনিয়ন এক্সটেনশন মাইক্রোপ্লান প্রণয়নে **UEFT**-কে সহায়তা করা; কর্মশালার মাধ্যমে উপজেলা সম্প্রসারণ কর্মসূচী তৈরী ও বাস্তবায়নে টউঈঈ-কে সহায়তা করা; কর্ম পরিকল্পনা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম তৈরীতে **UECC-**কে সহায়তা করা; প্রশিক্ষণ কর্মসূচী তৈরি এবং কৃষক, সম্প্রসারণ কর্মী, ও কৃষি পণ্য ব্যবসায়ীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান; নিয়মিত UEFT এবং **CIG**সদস্যদের কার্যক্রম তদারকী করা; এবং মাসিক বা প্রয়োজন অনুযায়ী সভার ব্যবস্থা করা।

G) Bc‡Rjv m-cÖmviY mgš^q KwgwU (Upazila Extension Coordination Committee- UECC) M<b@

উপজেলা পর্যায়ে সকল সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের নিমিত্ত কৃষি সংক্রান্ত সকল সংস্থার সমন্বয়ে উপজেলা সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটি **(UECC)** গঠন করা হবে। এ কমিটির প্রধান দায়িত্ব হবে মাইক্রোপ্লান অনুমোদন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ। জেলা সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটি **(District Extension Coordination Committee- DECC)** এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটি **(National Extension Coordination Committee- NECC)** উপজেলা পর্যায়ের কাজের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ করবে।

উপজেলা কৃষি অফিসার, উপজেলা মৎস্য অফিসার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, কৃষি পণ্য ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, **CIG**সদস্যদের প্রতিনিধি, উপজেলা প্রডিউসার্স অরগানাইজেশন-এর চেয়ারম্যান, এএও/এইও সমন্বয়ে **UECC** গঠিত হবে। উক্ত কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে এএও/এইও দায়িত্ব পালন করবেন।

UECC-এর কাজের পরিধি হলো- বিভিন্ন **UEFT**-কে **CIG**গঠন করতে এবং সকল **CIG**-কে একত্রে কাজ করতে সহযোগিতা করা; ইউনিয়ন মাইক্রোপ্লান প্রণয়নসহ সকল বিষয়ে **URT** এবং **UEFT**-কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করা; ইউনিয়ন মাইক্রোপ্লান সমন্বয়ে উপজেলা সম্প্রসারণ কর্মসূচী তৈরী করা; উপজেলা সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনাসহ অন্যান্য দপ্তরের **(DAE, DOF & DLS)**কর্ম পরিকল্পনা

(Action Plan) তৈরী করা; সরবরাহ ও সেবার মধ্যে সমন্বয় ও সেতুবন্ধন স্থাপন; উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; ভেলিডেশন ট্রায়াল স্থাপন ও সঠিকভাবে তদারকি করা: এবং উপজেলা সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন, তদারকি ও সঠিক সময়ে রিপোর্ট তৈরি নিশ্চিত করা।

J) g,m¨Pv# cÖ`k©bx?

প্রকল্পে স্থানীয় পর্যায়ে প্রণীত পরিকল্পনার আলোকে প্রকল্পভূক্ত পুরাতন ইউনিয়নসমূহে ৪টি করে এবং নতুন ইউনিয়সমূহে ৫টি করে উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি প্রদর্শনী স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। প্রতিটি সিআইজি একটি করে প্রদর্শনী স্থাপন করবে। প্রকল্প হতে প্রতিটি প্রদর্শনীর জন্য সর্বোচ্চ ২০,০০০/= (বিশ হাজার) টাকা ব্যয়ের সুযোগ রয়েছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য মূলত পোনা ও খাদ্য ক্রয়, সাইন বোর্ড স্থাপন, অজৈব সার ক্রয়, শ্রমিক মজুরী, ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ণিত ২০,০০০/= টাকা ব্যয় করা যাবে। সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ভার নির্বাচিত সিআইজি চাষি বহন করবেন।

. gv< w% m cvjb

প্রতিটি প্রদর্শনী বাস্তবায়নের পরপরই ১টি করে মাঠ দিবস পালন করা হবে। মাঠ দিবস পালনের জন্য প্রকল্প হতে প্রতিটি মাঠ দিবস পালনের জন্য ৩,০০০.০০ টাকার সংস্থান আছে। এ অর্থ প্রধানত প্রচারণা ও সমাবেশের কাজে ব্যয় করা হবে। মৎস্যচাষ প্রযুক্তি বিস্তারে মাঠ দিবস পালন কর্মসূচি বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

(K) Aw2L!v w wbg$ mdi

প্রকল্পভুক্ত এক এলাকার চাষিদের মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়নের লক্ষ্যে অন্য এলাকার সফল মৎস্যচাষ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের ব্যবস্থা করা হবে। এর মাধ্যমে চাষিরা নিজেদের মৎস্য চাষ কার্যক্রমকে আরও উন্নত এবং সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হবে।

(() w MN ªA Bb$b **(Pureline Brood Development)**

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় এনএটিপি-২ ভিয়েতনামী পাঙাস ও কৈ, তেলাপিয়া GIFT মাছের বিশুদ্ধ ব্রুড উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এর উদ্দেশ্য, এসব প্রজাতির কৌলিতাত্বিক বিশুদ্ধতা বজায় রেখে ব্রুড তৈরি করা যেন ব্রুড থেকে যথেষ্ট বিশুদ্ধ রেনু পোনা উৎপাদন করা যায়। এই পোনা পরে ৪টি নির্বাচিত সরকারী ফার্মের মাধ্যমে চারাপোনা উৎপাদন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে। একই সাথে কিছু নার্সারি অপারেটরকে চারাপোনা উৎপানে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যেন পরে তারা নিজেরাও উক্ত প্রজাতিসমূহের বিশুদ্ধ চারাপোনা যথেষ্ট সংখ্যায় উৎপাদন করতে সক্ষম হয়।

(2) GwMÖjPvivj 8‡bv‡2kb dvP

GAv8Gd-2

মৎস্যচাষে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে গেলে অনেক সময়েই কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন পড়ে। অনেক কৃষকই আর্থিক কারণে এসব ব্যবহার করতে পারেন না। এনএটিপি-২ প্রকল্প এসব ক্ষেত্রে কৃষকদের সহায়তার জন্য এআইএফ-২ চালু করেছে। সিআইজি সদস্যগণ দলগতভাবে এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এই ফান্ড হতে আংশিক আর্থিক সহায়তা পাবেন। প্রকল্প মেয়াদে ন্যূনপক্ষে ৭৪০টি সিআইজি এই ধরনের আর্থিক সহায়তা পাবে। প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ সিআইজিদেরকে নিজস্ব তহবিল হতে ৩০% ব্যয় নির্বাহ করতে হবে, অবশিষ্ট ৭০% প্রকল্প দেবে এআইএফ-২ আকারে যার সর্বোচ্চ সীমা প্রতিটির জন্য প্রায় ৩.৯০ টাকা।

GAv8Gd-+

গ্রমীণ ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা যারা মৎস্যচাষ ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত কাজে প্রয়োজনীয় উন্নত উপকরণের ব্যবসাতে আগ্রহী তাদের আংশিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এই ফান্ড ব্যবহৃত হবে। উদাহরণ : মাঝারী বা বড়

আকারে মৎস্য খাদ্য তৈরির পেলেটিং মেশিন, বরফ কল, ইত্যাদি। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে লিফগণও এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন । ন্যূনপক্ষে ১৩৩ জন উদ্যোক্তা তাদের আবেদন উপযুক্ত বিবেচিত হলে এই ফান্ডের আর্থিক সহায়তা পাবেন। উদ্যোক্তাকে তার প্রয়োজনের ৫০ শতাংশ নিজ উৎস হতে যোগান দিতে হবে। অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ এআইএফ-৩ দেবে যার মূল্যমান সর্বোচ্চ ৬ লক্ষ টাকা। এআইএফ-২ ও ৩ এর অর্থিক সহায়তা অনুদান হিসাবে বিবেচিত হবে।

(+) !1¨ c(ÖÉ)i ¨ Rvi

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এনএটিপি-২ সম্প্রসারণের সকল প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নূতন নূতন তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করবে অথবা বিদ্যমান ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলোর প্রসার ঘটাবে। সম্ভব সকল ক্ষেত্রে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এর ব্যবহার সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে। চাষিদের সাথে যোগাযোগের অন্যন্য মাধ্যম যেমন স্মার্টফোন, মোবাইল ফোন, ইত্যাদি ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। মাঠ পর্যায়ে হতে তথ্য সংগ্রহ এবং যথাস্থানে প্রেরণের জন্য লিফদেরকে ঞধনষবঃ চঈ প্রদান করা হবে। সম্প্রসারণ ভিডিও তৈরি করা হবে প্রকল্পের নিজস্ব উদ্যোগে এবং তা প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করা হবে।

BcmsRvi

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী তথা মৎস্যচাষিসহ পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত অন্যান্য সুফলভোগীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণ-গবেষণায় তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে দপ্তরসমূহের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে আন্ত:সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। আর এ সমস্ত সাফল্য নির্ভর করছে প্রকল্প বাস্তবায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলের কর্মসম্পাদনে আন্তরিকতা ও পরিশ্রমে প্রকল্পটির সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর।

Pv#‡/vM¨ gvS 6 wPswTi cwiwPwZ!

বাংলাদেশের স্বাদু পানিতে প্রায় ২৯৩ প্রজাতির মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। এ ছাড়াও বর্তমানে আরও ১২ প্রজাতির বিদেশী মাছ বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই চাষ হচ্ছে। কিন্তু এ সমস্ত মাছ ও চিংড়ির সবগুলোই পুকুরে লাভজনকভাবে চাষযোগ্য নয়। অধিক উৎপাদন প্রাপ্তি ও লাভজনকভাবে চাষ করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মাছের প্রজাতি নির্বাচন করা উচিত-

- পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের যথার্থ ব্যবহারে সক্ষম
- স্বল্পমূল্যের ও সহজলভ্য সম্পূরক খাদ্য খায়
- খাদ্য শিকল ছোট এবং দ্রুত বর্ধনশীল
- রাক্ষুসে স্বভাবের নয়
- এলাকাগত চাহিদা ও বাজারদর ভাল
- বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক
- পোনার সহজ প্রাপ্যতা
- অন্য প্রজাতির সাথে খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে না।

উলেখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে লাভজনকভাবে চাষযোগ্য প্রজাতিগুলো হচ্ছে-

‡%k? Kvc"

- কাতলা
- রুই
- মৃগেল
- কালবাউশ

w ‡%k? Kvć

- গ্রাসকার্প
- wmj2vi Kvc"
- কমন কার্প (কার্পিও, মিরর কার্প)
- সরপুঁটি

Ab¨vb¨

- থাই/ভিয়েতনামী পাঙ্গাশ
- থাই/ ভিয়েতনামী কৈ
- ‡!jwc$v
- wks
- cv %v
- Ujkv

wPswT

- Mj%v
- vM%v

পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে চাষযোগ্য প্রজাতির মাছ ও চিংড়ির পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

. i;8 (*Labeo rohita*)

wR¨K V wk:¨

রুই মছের মাথা দেহের তুলনায় ছোট, দেহ লম্বাটে। লেজের দিক ক্রমশ সরু। সমস্ত শরীর উজ্জ্বল আঁশ দিয়ে ঢাকা, আঁশগুলো গোলাকার, মসৃণ এবং সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। এদের ঠোঁট কুঁচকানো, খাঁজ কাটা, উপরের ঠোঁটে এক জোড়া শুং থাকে।

Aw% vm=Þb

ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল ও মায়ানমার। তবে বর্তমানে ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, জাপান, মালয়েশিয়া, রাশিয়া, থাইল্যান্ড এবং আফ্রিকার, কয়েকটি দেশেও চাষ হচ্ছে।

Av vm=Þ

খাল, বিল, নদী- নালা হাওর- বাঁওড়ও পুকুরের পানির মধ্যস্তরে বাস করে।

5v%¨v2¨vm

রুই মাছ সাধারণভাবে পানির মধ্যস্তরে বিচরণ করে এবং স্তরে বিদ্যমানে খাদ্যগ্রহণ করে থাকে। তবে পানির উপর এবং নিচের স্তরেও রুইয়ের অবাধ বিচরণ পরিলক্ষিত হয়। প্রাণি- পাঙ্কটন, পচা জৈব পদার্থ ও ছোট কীট প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আর সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ফিশ মিল, খৈলের গুঁড়া, চালের কুড়া, গমের ভুসি গ্রহণ করে।

W%wRK wÆ

পরিবেশ ও চাষ ব্যবস্থাপনার ওপর দৈহিক বৃদ্ধি নির্ভর করে। পুকুর-দীঘিতেই রুই মাছ ১ বছরে ১-১.৫ কেজি এবং ২ বছরে ২- ৩ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

প্রজনন

অনুকূল পরিবেশে ২ বছর বয়সে রুই প্রজননক্ষম হয় এবং মে- জুলাই মাসে প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রজনন ঘটায়। অপেক্ষাকৃত কম গভীর এবং স্রোতশীল পানিতে এরা ডিম ছাড়ে। বদ্ধ জলাশয়ে রুই মাছের প্রজনন ঘটে না। তবে হ্যাচারিতে প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে রেণু উৎপাদন হয়। একটি প্রজনন উপযোগী স্ত্রী রুই থেকে ৩ লক্ষাধিক ডিম পাওয়া যেতে পারে।

. Kv!jv (*Catla catla*)

wR¨K V wk:¨

কাতলা মাছের মাথা বেশ বড়, দেহের মাঝের অংশ চওড়া। মুখের হা বেশ বড়, নিচের ঠোঁট মোটা এবং সামনের দিকে প্রশস্ত। দেহের রং রূপার মত চকচকে সাদা তবে পিঠের রং কিছুটা কালচে।

Aw% vm=Þb

ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার। বর্তমানে রাশিয়া থাইল্যান্ড, চীন, জাপান, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়াসহ অনেক দেশে কাতলার চাষ হচ্ছে।

Av vm=Þ

কাতলা বিশেষভাবে স্রোতস্বিনী নদ-নদীর মাছ। তবে খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড়, পুকুর-দীঘিসহ মিঠা পানির যে কোন জলাশয়ে বাস করতে পারে। এমন কি অল্প লবণাক্ত পানিতেও কাতলা খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

5v%¨v2¨vm

কাতলা সাধারণভাবে পানির উপর স্তরে বিচরণ করে। এরা ছোট অবস্থায় প্রধানত উদ্ভিদ-পাঙ্কটনভোজী। তবে কৈশোরের পর থেকে পুকুরের পরিবেশ থেকে শেওলা, ছোট কীট, উদ্ভিদের খন্ডাংশ, পচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। সম্পূরক খাদ্য হিসাবে গমের ভুসি, চালের কুড়া, ফিশমিল, খৈল গ্রহণ করে।

W%wRK wÆ

কাতলা মাছ দ্রুত বর্ধনশীল। দৈর্ঘ্যে এরা সর্বাধিক ৬ ফুট এবং ওজনে ৪৫ কেজি পর্যন্ত বড় হতে পারে। পর্যাপ্ত খাবার পেলে কাতলা ১ বছরে ২-৩ কেজি এবং ২ বছরে ৪-৫ কেজি পর্যন্ত বড় হতে পারে।

cR©bb

প্রাকৃতিক পরিবেশ ৩ বছর বয়সেই কাতলা পরিপক্ব হয়। তবে বাংলাদেশের পরিবেশে পুকুরে কাষকৃত মাছ ৪ বছরের আগে পরিপক্ব প্রজননক্ষম হয় না বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এ মাছ জলাশয়ে ডিম পাড়ে না। মে-জুলাই মাসে

স্রোতযুক্ত নদীতে ডিম পাড়ে। সেখানে থেকে রেণু পোনা সংগ্রহ করে চাষ করা যায়। বর্তমানে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমেই বেশির ভাগ রেণু উৎপাদন করা হয়ে থাকে। প্রজনন উপযোগী বয়সে কাতলা মাছ হতে ৪-৫ লক্ষ ডিম পাওয়া যেতে পারে।

. g&Mj (*Cirrhinus mrigala*)

wwR¨K V wk:¨

দেহে লম্বাটে ও কিছুটা গোলাকার। মাথা খুবই ছোট কিন্তু মুখের গহ্বর অপেক্ষাকৃত বড়। গায়ের রং পিঠের দিকে তামাটে, দু'পাশ ও পেট রুপালী। মৃগেল মাছের ঠোঁট পাতলা ও উপরের ঠোঁট কিছুটা লম্বাটে এবং নিচের দিকে বাঁকানো।

Aw% vm=hb

বাংলাদেশ ও ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলেই বিস্তৃত। এ ছাড়াও মায়ানমার ও পাকিস্তানে এ মাছের বিস্তৃতি রয়েছে।

Av vm=j

রুই, কাতলার মত মৃগেল মাছ মিঠা পানির যে কোন জলাশয়ে বাস করতে পারে। বর্ষাকালে ধান ক্ষেতে এ মাছ খুব বেশি দেখা যায়। এরা পানির নিচের স্তরে বিচরণ করে।

5v%¨v2¨vm

মৃগেল মাছ জলাশয়ের তলদেশে স্তর থেকে খাদ্যগ্রহণ করে। প্রাণি-পাঙ্কটন, তলার ছোট/বড় কীট-পতঙ্গ, পচা জৈব পদার্থ, কাদা, বালি ইত্যাদি মৃগেলের খাদ্য। সম্পূরক খাদ্য হিসাবে চালের কুঁড়া, ফিসমিল, গমের ভুসি, সরিষার খৈল খায়।

W%wRK w&L

মৃগেল মাছ রুই এর চেয়ে বেশী এবং কাতলার তুলনায় কম বর্ধনশীল। এক বছরে এ মাছ ৬০০-৮০০ গ্রাম পর্যন্ত বড় হতে পারে। পরিণত মাছ লম্বায় ৩ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

cRÖb

মৃগেল মাছ ১ বছর বয়সেই পরিপক্ব হয়। কারও কারও মতে এ মাছ ৬ মাসেই পরিপক্ব হয়ে থাকে। একই বয়সের পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছের তুলনায় অপেক্ষাকৃত আগে পরিপক্বতা অর্জন করে। পরিণত বয়সে ১ কেজি ওজনের একটি মৃগেল মাছ হতে ১ লাখ ডিম পাওয়া যেতে পারে। এ মাছও বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে না। মে- জূলাই মাসে স্রোতযুক্ত নদীতে ডিম দেয়। এপ্রিল মাস থেকেই কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে রেণু উৎপাদন করতে দেখা যায়।

. Kvj vBk (*Labeo calbasu*)

wwR¨K V wk:¨

দেহের তুলনায় মাথা ছোট। সমস্ত দেহ কালো বা ধূসর কালো আঁশ দিয়ে ঢাকা, চোখ লাল রংয়ের, মুখের দুই পাশে একজোড়া করে গোঁফ থাকে। রুই ও কাতলা মাছের তুলনায় কমবর্ধনশীল।

Aw% vm=hb

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমারে এই মাছ পাওয়া যায়।

Av vm=j

নদী, খাল, বিল, হাওর-বাঁওড় ও পুকুর ইত্যাদি জলাশয়ে নিচের স্তরে বাস করে।

5v%¨v2¨vm

কালবাউশ নিচের স্তরে বাস করে এবং নিচের স্তরেই খাদ্য সংগ্রহ করে। পরিণত বয়সে পচা ও অর্ধপচা জলজ উদ্ভিদ এবং কীটপতঙ্গ খায়। পোনা অবস্থায় এককোষী শেওলা, পচা ও অর্ধপচা জলজ উদ্ভিদ গ্রহণ করে।

W%wRK w&L

কাল বাউশ রুই, কাতলার তুলনায় ক্রমবর্ধনশীল, ১ বছরে ৬০০-৭৫০ গ্রাম পর্যন্ত বড় হয় ও বছরে ১.৫ কেজি পর্যন্ত ওজন হয়।

cÖRbb

২য় বৎসরে কাল বাউশ মাছ প্রজননশীল হয়। এরা বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে না। বর্ষাকালে স্রোতশীল পানিতে ডিম দেয়। হ্যাচারিতে ইনজেকশন প্রয়োগ করে কৃত্রিমভাবে প্রজনন করানো হয়। বাংলাদেশে সকল অঞ্চলেই হ্যাচারিতে এই মাছের পোনা পাওয়া যায়।

. MÖm Kvc©*(Ctenopharyngodon idelle)*

wR¨K V wk:¨

দেহ লম্বাটে, মাথা চওড়া, মুখ ছোট, ঠোঁট সামান্য লম্বা। শরীরের রং পেটের দিকে রুপালী সাদা কিন্তু পিঠের দিক কালচে ধূসর বা সবুজাভ, গলার ভিতরে চিরনির দাঁতের মতো দু'সারি দাঁত রয়েছে। সারা শরীর মাঝারি আকারের আঁশ দ্বারা আবৃত।

Aw% vm=¯þb চীন, হংকং ও রাশিয়ার আমুর নদী। এ মাছটি ১৯৬৬ সালে হংকং থেকে প্রথম আমাদের দেশে আনা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭০ সালে জাপান থেকে এবং ১৯৭৯ সালে নেপাল থেকে আমদানি করা হয়। ১৯৮০ সালে গ্রাসকার্পের প্রজনন করানো সম্ভব হয়।

Av vm=¯þ

পুকুর, খাল-বিলের সকল স্ড়রে বিচরণ করে। তবে এরা জরাশয়ের পাড় ঘেঁষে চলাচল করতে পছন্দ করে।

গ্রাসকার্প প্রধানত তৃণভোজী স্বাভবের। পোনা অবস্থায় এরা প্রাণিপ্লাঙ্কটন ও মশার লার্ভা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত হয় এবং পুকুরের পরিবেশ থেকে ঝাঁঝি, হাড্রিলা, স্পাইরোডেলা, ক্ষদি পানা, কুটি পানা, নরম ঘাস ইত্যাদি খেতে শুর করে। বাইরে থেকে সরবরাহকৃত কলার পাতা, আলুর পাতা, সজনে পাতা, শীতকালীন শাকশব্জি খেতে ও এরা বেশ পছন্দ করে। গ্রাসকার্প দৈনিক দেহের ওজনের প্রায় ৪০-৫০% উদ্ভিদ জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে পারে।

W%wRK w&

বিদেশী মাছের মধ্যে গ্রাসকার্পের দৈহিক বৃদ্ধি তুলনামুলকভাবে বেশি। নিয়মিত খাবার দিয়ে চাষের প্রথম বছরে এ মাছ ৩-৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। পরিণত অবস্থায় এরা দৈর্ঘ্যে ১.৫ মিটার এবং ওজনে ৩০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

প্রজনন

পুরষ ও স্ত্রী মাছ যথাক্রমে ২ ও ৩ বছরে পরিপক্বতা অর্জন করে। পুকুরে বা বদ্ধ জলাশয়ে এদের পরিপক্বতা আসে কিন্তু প্রজনন করে না। কৃত্রিম উপায়ে মে-আগস্ট মাস পর্যন্ত এদের প্রজনন করানো হয়। একটি পরিপক্ব গ্রাসকার্প মাছ হতে প্রায় ২ লাখ পর্যন্ত ডিম পাওয়া যেতে পারে।

. wmj2vi Kvc©*(Hypophthalmicththys molitrix)*

wR¨K V wk:¨

সিলভার কার্প দেখতে অনেকটা ইলিশ মাছের মত দেহের মাঝের অংশ চওড়া, মাথা লেজের অংশ সরু। মুখ কাতলা মাছের মতো উপরের দিকে তোলা। দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুপালী আঁশে ঢাকা। মাথা ও পিঠের দিক গাঢ় ধূসর। এদের নালীর দৈর্ঘ্য গ্রাসকার্প অপেক্ষা বেশি এবং ফুলকায় অনেকগুলো ফুলকা রেকার বর্তমান বলে পানি থেকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটন গ্রহণ করতে পারে।

Aw% vm=¯þb

দক্ষিণ ও মধ্য চীনের নদীসমূহে এবং আমুর নদীর অববাহিকা মাছটির আদি বাসস্থান। সেখান থেকেই এ মাছচাষ ও গবেষণার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৬৯ সালে হংকং থেকে আমাদের দেশে আনা হয় এবং ১৯৭৬ সালে সফলভাবে কৃত্রিম প্রজনন ঘটানো সম্ভব হয়।

Av vm=¯þ

এরা নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও পানির উপরের স্তরে বিচরণ করে।

5v%¨v2¨vm

অপেক্ষাকৃত ছোট পোনা সাধারণত প্রাণি-প্লাঙ্কটন খেতে অভ্যস্ত। পোনার আকার কিছুটা বড় হলে এরা উদ্ভিদ- প্লাঙ্কটন খেয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে এবং বাকি জীবন প্রধানত উদ্ভিদ- প্লাঙ্কটন খেতে খুবই পছন্দ করে।

W%wRK w&

সিলভার কার্পের দৈহিক বৃদ্ধির হার খুব বেশি। দেখা গেছে পুকুরে চাষ করলে এ মাছ ১ বছরে ১-৫ কেজি এবং ২ বছরে ৪-৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

cÖRbb

সিলভার কার্প ২ বছরের মধ্যেই প্রজননক্ষম হয়। এ বয়সের একটি মাছ হতে সর্বাধিক ৮ লক্ষ পর্যন্ত ডিম পাওয়া যেতে পারে। এরা বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে না, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা হয়। মার্চের শেষ দিকে এদের প্রজনন মৌসুম শুর হয়।

. Kwc© *(Cyprinus carpio)*

wR¨K V wk:¨

কার্পিও এর মাথা শরীরের তুলনায় ছোট, পেট মোটা এবং পিঠ ধনুকের মতো বাঁকানো। এর গায়ের রং হালকা সোনালি-বাদামি। সারা দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে।

Aw% vm=wb

এশিয়া মহাদেশের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল বিশেষ করে চীন এদের আদিবাস বলে মনে করা হয়। ১৯৬০ সালে থাইল্যান্ড থেকে এ মাছটি আমাদের দেশে আনা হয়।

Av vm=j>

হাওর-বাঁওড় ও পুকুরের পানির নিচের স্তরে বাস করে।

5v%¨v2¨vm

পুকুরের তলদেশ থেকে এ মাছ খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্যের জন্য এরা পুকুরের তলদেশ, পাড় ও চারপাশের মাটি খামচে আলগা করে। রেণু অবস্থায় এরা প্রাণি- প্লাঙ্কটন ভক্ষণ করে। পরিণত বয়সে প্লাঙ্কটন, ছোট/বড় কীট, ছোট, শামুক, কেঁচো, পচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে।

W%wRK w&

কার্পিও একটি দ্রুত বর্ধনশীল মাছ। মিশ্রচাষ পদ্ধতিতে এ মাছ বছরে ১-৩ কেজি পর্যন্ত বড় হতে পারে।

প্রজনন

৫-৬ মাসেই এ মাছ প্রজননক্ষম হয়। এরা বদ্ধ জলাশয়ের অনুকূলে পরিবেশ প্রাকৃতিক প্রজননে অভ্যস্ত এবং বছরে দু'বার (জানুয়ারি-মার্চ ও জুলাই- আগষ্ট) প্রজনন করে। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এ মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়।

. micK *(Puntius gonionotus)*

wR¨K V wk:¨

উজ্জ্বল রুপালি রঙের দেহ, লেজটি খাঁজকাটা, পায়ু ও শ্রোণী পাখনার প্রান্ত রক্তিম গোলাপী। মাছের নাসাগ্র গোলাকার এবং মুখে দু'জোড়া গোঁফ থাকে। মাছটি চ্যাপ্টা।

Aw% vm=wb

থাইল্যান্ড। ১৯৮৭ সালে এ মাছটি থাইল্যান্ড থেকে আমাদের দেশে আমদানী করা হয়।

Av vm=j>

নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড় ও পুকুরের পানির সকল স্তরে এরা বিচরণ করে।

5v%¨v2¨vm

রেণু অবস্থায় এরা এককোষী শেওয়াও ছোট প্রাণি- প্লাঙ্কটন খায়। পরিণত অবস্থায় এরা উদ্ভিদভোজী। উদ্ভিদ হিসেবে ক্ষুদি পানা, হাইড্রিলা, নরম ঘাস, পেঁপে পাতা, আলু পাতা, বাধাঁকপি ইত্যাদি এদের খুবই প্রিয় খাদ্য। সম্পূরক খাদ্য হিসাবে চালের কুড়া ও সরিষার খৈল পছন্দ করে।

W%wRK w&L

মাছটি দ্রুত বর্ধনশীল। ৩-৬ মাসের মধ্যে এরা খাওয়ার উপযোগী (১০০-২০০ গ্রাম) হয়। অনুকূল পরিবেশে থাইল্যান্ডে এ মাছ সর্বাধিক ৩-৩.৫ কেজি পর্যন্ত বড় হতে পারে। তবে বাংলাদেশে ১.০-১.৫ কেজি পর্যন্ত বড় হতে দেখা গেছে।

cRÖbb

সরপুঁটি ১ বছরেই প্রজননক্ষম হয় এবং এপ্রিল-মে মাসে এরা প্রজনন করে। এরা বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে না, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন করা হয়। তবে বিশেষ অবস্থায় যেমন হ্যাচারি সংলগ্ন পুকুরে যদি পানির প্রবাহ থাকে কিংবা বৃষ্টির পানি যদি পুকুরে গড়িয়ে ঢোকার সুযোগ থাকে তাহলে পুকুরেও প্রজনন করতে সক্ষম।

. cvsMvm ***(Pangasius sutchi)***

wR¨K V wk:¨

দেহের তুলনায় মাথা ছোট, দেহের উপরের অংশ সবুজাভ নীলাভ, তলদেশ উজ্জ্বল সাদা। মাছের গায়ে কোন আঁশ থাকে না। বিড়ালের ন্যায় গোঁফ থাকার কারণে এ মাছ ক্যাটফিশ নামে পরিচিত। পৃষ্ঠ পাখনা ধূসর কালো রঙের। পৃষ্ঠ,বক্ষ ও পায়ু পাখনায় শক্ত কাটা আছে এবং পৃষ্ঠদেশে লেজের সামনের অংশ মাংসযুক্ত এডিপোজ ফিন বিদ্যমান।

Aw% vm=Þb

থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ড থেকে আমাদের দেশে আমদানি করা হয় এবং ১৯৯৩ সালে সফলতার সাথে কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদনের পর থেকে এর চাষ ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

Av vm=Þj

নদী ও পুকুরের তলদেশে বাশ করে।

5v%¨v2¨vm

পাঙ্গাশ মাছ সর্বভুক। জলাশয়ের পরিবেশ থেকে এরা উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন -, প্রাণি-প্লাঙ্কটন, তলদেশের পোকা-মাকড়, কেঁচো শামুক, পচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। পুকুরে চাষকালে খাদ্য হিসেবে খৈল, কুড়া, ভুসি, ফিশমিল, পশুর রক্ত ও নাড়িভূড়ি ইত্যাদি খেতে খুবই পছন্দ করে।

W%wRK w&L

পরিমিত খাদ্য প্রয়োগে চাষ করলে পুকুরে এরা প্রথম বছরে ১ কেজির উপরে বড় হয় এবং ২ বছরে ৪-৫ কেজি পর্যন্ত বড় হতে পারে। পরিণত বয়সে এরা ১৫০ সেমি লম্বা ও ওজনে ১০-১৫ কেজি পর্যন্ত বড় হতে পারে। সাধারণভাবে পুরুষ মাছ আকারে স্ত্রী মাছের চেয়ে ছোট হয়।

cRÖbb

পাঙ্গাস মাছ ৩-৪ বার প্রজনন করতে পারে কিন্তু সাধারণত পুকুরে এরা ডিম ছাড়ে না। পুকুরে এরা যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং কৃত্রিম প্রজনন মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা যায়।

. ‡!jwc$v

2wgKv

তেলপিয়া দ্রুত বর্ধনশীল সুস্বাদু মাছ। দেখতে আকর্ষণীয় এবং অধিক উৎপাদনশীল হওয়ায় চাষ লাভজনক। এ মাছ একক, মিশ্র, সমন্বিত পেনে ও খাঁচায় চাষ করা যায় বলে বাংলাদেশে এর চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশে পাঁচ ধরণের তেলাপিয়া চাষ হয় যেমন- মোজাম্বিক তেলাপিয়া, নাইল তেলাপিয়া, লাল তেলাপিয়া, গিফ্‌ট তেলাপিয়া এবং মনোসেক্স তেলাপিয়া। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ জাতের গিফ্‌ট তেলাপিয়া অধিক উৎপাদনশীল হওয়ায় চাষি ও খামারীদের কাছে এ মাছ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। গিফ্‌ট তেলাপিয়া থেকে উৎপাদিত মনোসেক্স (এক লিঙ্গ) পুরুষ তেলাপিয়া আরও দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় এর চাষ ব্যবস্থাপনা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে।

A1Mbw!K Ui;!Y

- তেলাপিয়া মাছ সুস্বাদু এবং দেখতে আকর্ষণীয় হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই একে বৈশ্বিক মাছ বলা হয়;
- সর্বভুক বিধায় মাছ চাষে উৎপাদন খরচ কম হয় এবং চাষ লাভজনক;
- রোগ প্রতিরোধক্ষম এবং প্রকৃতির বিরুপ পরিবেশে এবং অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়; এবং
- স্বাদু ও লবণাক্ত পানি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের জলাশয়ে চাষ করা যায়।

wR¨K V wk:¨Z তেলাপিয়ার সমস্ত শরীর আঁইশে ঢাকা। মাথা ছোট। পৃষ্ঠ পাখনা কাঁটাযুক্ত। বক্ষ পাখনা ছোট। একই বয়সের পুরুষ তেলাপিয়া স্ত্রী অপেক্ষা বড়। মোজাম্বিক তেলাপিয়া আকারে ছোট, রং ধুসর থেকে কালো। এর উৎপাদনশীলতা কম। নাইল তেলাপিয়া দেখতে ধুসর নীলাভ থেকে সাদা লালচে। পুরুষ মাছের গলার অংশে লালচে এবং স্ত্রী মাছের বর্ণ লালচে হলুদাভ। আকার আকৃতি অন্য সব তেলাপিয়ার মতই কিন্তু রং লাল এবং এর উৎপাদন কম বলে জনপ্রিয়তা পায়নি। গিফ্ট তেলাপিয়ার লেজের আড়াআড়ি রেখা সমূহ নিরবচ্ছিন্ন। নাইল তেলাপিয়ার গায়ের রং এর চেয়ে এটির গায়ের রং হালকা। মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছগুলি সম আকৃতির গিফ্ট তেলাপিয়ার মতো উচ্চ ফলনশীল, তাপমাত্রার সহনশীল মাত্রা ১২-৩৫° সে., ২-৮ পিপিএম অক্সিজেন এবং ৩-২৫ পিপিটি লবণাক্ততায় বাঁচতে পারে। মনোসেক্স তেলাপিয়া অধিক উৎপাদনশীল জাত, এরা কম অক্সিজেন এবং বিস্তৃত তাপমাত্রায় খাপ খাওয়াতে সক্ষম।

Aw% vm=*bZ তেলাপিয়ার আদি বাসস্থান আফ্রিকা। মোজাম্বিক তেলাপিয়ার উৎস আফ্রিকার মোজাম্বিক যা ১৯৫৪ সালে থাইল্যান্ড থেকে আনা হয়। নাইল তেলাপিয়ার উৎস আফ্রিকার নীল নদ। ১৯৭৪ সালে এই তেলাপিয়া থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে আনা হয়। লাল তেলাপিয়া মূলতঃ তাইওয়ানের এলবিনো মোজাম্বিক এবং নাইলোটিকাস এর হাইব্রিড যা ১৯৮৮ সালে থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে আনা হয়। গিফ্ট তেলাপিয়া ১৯৯৪ সালে বিএফআরআই ফিলিপাইন থেকে আমদানী করে। এটি নাইল তেলাপিয়ার উন্নত সংস্করণ।

. wK (Anabas testudineus)

2wgKv

মিঠা পানির মাছচাষে বাংলাদেশের অবস্থান অন্যতম। নদীমাতৃক বাংলাদেশে ২৯৭ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৫০ প্রজাতি হচ্ছে ছোট মাছ। ছোট মাছের মধ্যে কৈ মাছ পুষ্টিগুণ ও স্বাদে অতুলনীয়। বাংলাদেশের মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু এ মাছ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। জীবন্ত অবস্থায় কৈ মাছ বাজারজাত করা যায় বিধায় এ মাছের বাজার মূল্য তুলনামূলক বেশি। যে কোন ধরণের জলাশয়ে এমনকি চৌবাচ্চা ও খাঁচাতেও এ মাছ চাষ করা যায়। মৎস্য বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণার মাধ্যমে প্রনোদিত প্রজনন, পোনা উৎপাদন ও চাষ পদ্ধতি সফলতা লাভ করায় মূল্যবান এ মাছটি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

g¢Si V wk:¨Z

এ মাছের মাথা বড় ও প্রায় ত্রিকোনাকৃতি। দেশী কৈ এর বর্ণ কালচে সবুজ বা বাদামি সবুজ। দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা। দুটো চোয়ালেই দাঁত আছে। পৃষ্ঠ ও বক্ষপাখনা ধারালো কাঁটা যুক্ত। কৈ মাছ কানকো দিয়ে শুকনায় চলাফেরা করতে পারে। কানকোর পিছনে কালো ফোটা বিদ্যমান। অতিরিক্ত শ্বসণ অঙ্গের কারণে এরা বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে শ্বাসকার্য চালায়।

cÖ =*b\ vm=*bZ

বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, প্রভৃতি দেশে কৈ মাছ পাওয়া যায়।

Av vm=*6 cÖ]!K cÖbZ

কৈ মাছ মুক্ত জলাশয় বা প্লাবনভূমির মাছ। বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত, খাল-বিল, ডোবা নালা ইত্যাদি জলাশয়ে কৈ মাছ দেখা যায়। দেশের সব অঞ্চলে কৈ মাছ দেখা যায়। তবে, গোপালগঞ্জ জেলার চান্দার বিল, মাদারীপুর জেলার বাঘিয়ার বিল, পাবনা, নাটোর ও

নওগাঁর চলন বিল কৈ মাছের জন্য বিখ্যাত। অনেক পুরাতন বা মজা পুকুরের ঝোঁপঝাড়, জঙ্গল অথবা কচুরী পানার শিখড়ে ও কাদায় এদের বসবাস। জলাশয়ের নিচের স্তরে এরা বাস করে। বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে নতুন বৃষ্টি হলে এরা স্রোতের উজানে খাল বিল থেকে উঠে ধানক্ষেতের স্বল্প পানিতে ডিম দেয়। ডিম থেকে রেনু পোনা ১৫-২০ দিনে পরিণত পোনায় উপনীত হয়ে আবার খাল-বিল, ডোবা-নালায় বিস্তার লাভ করে।

5v%¨v2vmZ

কৈ মাছ সর্বভূক। জু-প্লাংকটন এর প্রধান খাদ্য। এরা ছোট অবস্থায় অতিক্ষুদ্র জলজ প্রাণী ও কীট পতঙ্গ খায় এবং বড় হলে পতঙ্গ ও তাদের শুককীট, শৈবাল, পোকা মাকড় পঁচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি খায়।

A1Wbw!K Ui;!ZY

কৈ মাছ পুষ্টি গুণে ভরপুর। প্রতি ১০০ গ্রাম মাছে আমিষের পরিমাণ ১৪.৮ গ্রাম। এরা দ্রুত বর্ধনশীল এবং স্বল্প সময়ে জীবন্ত বাজারজাত করা যায় বলে এ মাছের বাজার মূল্য অধিক ও চাহিদা ব্যাপক। রোগীর পথ্য হিসেবেও এ মাছ অধিক পরিচিত।

W%wRK w&LZ কৈ মাছ স্বল্প সময়ে বাজারজাত করা যায়। নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য দিলে ৪-৬ মাসে দেশী কৈ ৫০-৬০ গ্রাম, থাই কৈ ১০০-১২৫ গ্রাম এবং ভিয়েতনামী কৈ ২০০-২৫০ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।

. wks gvS (*Heteropneustes fossilis*)

2wgKv

আমাদের দেশে বিগত কয়েক দশকে রুই জাতীয় মাছসহ বেশ কয়েকটি বিদেশী প্রজাতির মাছ পরিকল্পিতভাবে চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের মধ্যে কৈ, শিং, মাগুর, টেংরা, পাবদা সকলের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় সুস্বাদু মাছ হিসাবে সমাদৃত। প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুস্বাদু ছোট আকারের নানা প্রজাতির মাছ আর আগের মত পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক জলাশয়ে অন্যান্য ছোট প্রজাতির মাছের ন্যায় শিং মাছের প্রাচুর্যতা ক্রমহ্রাসমান। দেশের প্রাণিজ আমিষের তথা পুষ্টির চাহিদা পূরণে এধরনের ছোট মাছের গুরুত্ব অপরিসীম। শিং মাছের পরীক্ষামূলক চাষ প্রাথমিকভাবে পাংগাসের সাথি ফসল হিসাবে শুরু হয়। চাষ লাভজনক হওয়ায় প্রতিনিয়ত এ মাছ চাষের পুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেবল চাষের পুকুরের সংখ্যায় যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নয়, চাষের নিবিড়তাও (Intensification) বাড়ছে। এ মাছের পোনা উৎপাদন পদ্ধতিও বেশ সহজ হওয়ায় বেসরকারী পর্যায়ে স্থানীয় হ্যাচারি মালিকগণ পর্যাপ্ত পোনা মাছ উৎপাদন করে এ মাছ চাষে বিশাল ভূমিকা রাখছে।

wks gv‡Si cÉgvb

শিং মাছের পুষ্টিগুণ অন্যান্য মাছের তুলনায় অনেক বেশি এবং খেতে খুবই সুস্বাদু। রোগ মুক্তির পর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য রোগীর পথ্য হিসেবে এ মাছ সমাদৃত। এ মাছের আমিষ সহজ পাচ্য ও কাটা নরম হওয়ায় সহজেই হজম হয় এবং শরীর গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করে। বিভিন্ন সমীখ্যায় দেখা গেছে ভিটামিন 'এ' এর অভাবে প্রতি বছর ৩০ হাজারের অধিক শিশু রাতকানা রোগে আক্রান্ত হয়। গ্রামীণ মানুষের শতকরা ৫৭ ভাগ প্রয়োজনীয় ভিটামিন 'এ' এর অভাবে, ৮৯ ভাগ 'আয়রন' এর অভাবে, ৮০ ভাগ 'ক্যালশিয়ামের' এর অভাবে এবং ৫৩ ভাগ রক্ত শূন্যতায় ভূগছে। এ মাছে উচ্চ মাত্রায় আমিষ, ভিটামিন, ক্যালশিয়াম ও অন্যান্য মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট থাকে। মাছের মধ্যে শিং মাছেই সর্বোচ্চ পরিমাণে ফসফরাস পাওয়া যায়। শিং মাছে আমিষের পরিমাণ ২২.৮%, ক্যালসিয়াম ০.৬৭% এবং ফসফরাস ০.৬৫%।

wks gv‡Si mv4vi. cwiwPw! 6 R?w %¨v

- শিং মাছের এর বৈজ্ঞানিক নাম *Heteropneustes fossilis* এবং ইংরেজি নাম Stinging Cat fish;
- শিং মাছ এক বছরেই পরিপক্বতা লাভ করে এবং প্রজননক্ষম হয়। স্ত্রী মাছ পুরুষ অপেক্ষা আকারে বড় হয়;
- শিং মাছ বছরে একবার প্রজনন করে। এ মাছের প্রজনন মৌসুম মে থেকে সেপ্টেম্বর তবে জুন-জুলাই মাসে সর্বোচ্চ

মাত্রায় প্রজনন করে থাকে;

- ❖ এরা প্রাকৃতিক পরিবেশে অগভীর ঝোঁপ-ঝাড় জাতীয় উদ্ভিদযুক্ত এলাকা, ধানক্ষেত, পাটক্ষেত ইত্যাদি এলাকায় প্রজনন করে;
- ❖ এ মাছের নিষিক্ত ডিম আঠালো হয় এবং নিমজ্জিত আগাছা, তৃণ, ডাল-পালা ইত্যাদিতে লেগে থাকে;
- ❖ সাধারণতঃ ৪০ থেকে ১০০ গ্রাম ওজনের একটি শিং মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৮০০০-১০০০০টি।

Av vm=Þ

- ❖ শিং মাছের প্রধান আবাসস্থল হচ্ছে খাল-বিল, হাওর-বাওড় ও নিমজ্জিত ধানক্ষেত;
- ❖ এ মাছ কর্দমাক্ত মাটির তলায়, গর্তে, নিমজ্জিত গাছের গুড়ির তলায় বা সুড়ুঙ্গে বসবাস করে থাকে;
- ❖ শিং মাছ আগাছা, দল, কচুরিপানা, পঁচা লতা-পাতা, ডাল-পালা যুক্ত জলাশয়ে স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে;

mv4vi. V wk:¨

- ❖ এ মাছের দেহ লম্বা, সামনের দিক নলাকার, পেছনের দিক চাপা, আঁইশবিহীন এবং মাথার অংশ উপর-নিচে চ্যাপ্টা;
- ❖ দেহের রং ছোট অবস্থায় বাদামী লাল এবং বড় অবস্থায় ধূসর কালচে;
- ❖ মুখে চার জোড়া গোঁফ ও মাথার দুই পাশে বিষাক্ত দুটি কাঁটা থাকে;
- ❖ পৃষ্ঠ পাখনা ছোট ও গোলাকৃতি, পায়ু পাখনা বেশ লম্বা, পুচ্ছ পাখনা গোলাকৃতি বিশিষ্ট;
- ❖ এ মাছের এক জোড়া অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র রয়েছে, যা দ্বারা প্রতিকুল পরিবেশে বাতাস হতে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বসন কাজ চালাতে পারে;
- ❖ এরা সাধারণত: ২০-৩০ সেমি. লম্বা হয় এবং ৩০০ গ্রাম পর্যন্ত ওজনের হয়ে থাকে।

5v%¨ 6 5v%¨v2¨vm

শিং মাছ নিশাচর (Nocturnal) প্রাণী এরা রাত্রে খাবার গ্রহণের জন্য বিচরণ করে। এ মাছ সর্বভূক, প্রাকৃতিক উৎসে সাধারণত জলাশয়ের তলদেশের খাদ্য খায়। এছাড়া শিং মাছ তাদের জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে তৈরী খাবারও খেয়ে থাকে। তবে তাদের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্য গ্রহণে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

- ❖ রেণু পর্যায়ে: ক্ষুদ্র জলজ প্রাণিকণা (জুপ্ল্যাঙ্কটন) ও পোকা-মাকড়, আর্টেমিয়া, টিউবিফেক্স ইত্যাদিও এদের আকর্ষণীয় খাদ্য;
- ❖ কিশোর পর্যায়ে: জুপ্ল্যাঙ্কটন ও ক্ষুদ্র জলজ পোকা-মাকড়, আর্টেমিয়া, টিউবিফেক্স ইত্যাদি;
- ❖ বয়োপাপ্ত অবস্থায়: জলজ পোকা-মাকড়, বেনথোস, ক্ষুদ্র চিংড়ি ও মাছ, পঁচা জৈব দ্রব্যাদি।

wks gvS Pv‡#i mE4v

আমাদের দেশেরে মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মাছের ভূমিকা অপরিসীম। সে কারণে কার্পজাতীয় মাছের পাশাপাশি শিং মাছসহ অন্যান্য মাছের বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষ করার গুরুত্ব অপরিসীম। আরো যে সব কারণে শিং মাছ চাষ গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- ❖ ছোট-বড় সকল জলাশয়ে অধিক ঘনত্বে একক ও মিশ্রচাষ পদ্ধতিতে এ মাছ চাষ করা যায়;
- ❖ অতিরিক্ত শ্বসন অঙ্গ থাকায় এ মাছ বাতাস হতে অক্সিজেন নিয়ে অনেক সময় ধরে বেচে থাকতে পারে;
- ❖ এমাছ অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু হওয়ায় এর বাজার চাহিদা এবং বাজার মূল্য অনেক বেশি;
- ❖ শিং মাছ ৪-৭ মাস চাষে খাবার উপযোগী ও বাজারজাতকরণ করা যায়;
- ❖ জীবন্ত অবস্থায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাজারজাত করা যায় ফলে নিশ্চিতভাবে উত্তম মূল্য পাওয়া যায়;
- ❖ মাছটি রাক্ষুসে নয় বলে অন্য প্রজাতি মাছের সাথে মিশ্র চাষ করা যায়।

. cv ‰v (*Ompok pabda* (Hamilton)

2wgKv

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের মধ্যে পাবদা খুবই সুস্বাদু ও জনপ্রিয় মাছ। উচ্চ বাজারমূল্য বিবেচনায় চাষযোগ্য ও বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক মাছসমূহের মধ্যে পাবদা অন্যতম। দেশের প্রায় সব ধরনের পুকুর-দিঘি ও বদ্ধ জলাশয়ে এ মাছ চাষ করা যায়। লাগসই প্রযুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে চাহিদাসম্পন্ন ও উচ্চমূল্যের এ সুস্বাদু মাছটির উৎপাদন বৃদ্ধি করে বাজারে প্রাচুর্য নিশ্চিত করা যায়।

cv ‰v gv‡Si mv4vi. cwiwPwI

পাবদা মাছ দেশীয় প্রজাতির ছোটমাছ (Small Indigenous Species- SIS) এর অন্তর্ভূক্ত। দেশে ৩ প্রজাতির পাবদা পাওয়া যায়; যথা- বোয়ালি পাবদা *(Ompok bimaculatus)*, মধু পাবদা *(Ompok pabda)* ও কালি পাবদা *(Ompok pabo)*। বর্তমানে বদ্ধ জলাশয়ে মধু পাবদার চাষ প্রচলিত।

Av vm=Þ

পাবদা স্বাদু পানির মাছ । বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশেই পাবদা মাছ বিস্তৃত। বর্তমানে বদ্ধ জলাশয় তথা পুকুর/দিঘিতে চাষিরা মধু পাবদা মাছের চাষ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। উন্মুক্ত জলাশয়ের মধ্যে হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, হাইল হাওর, বাইক্কা বিল, চলন বিল, হালতি বিল, মেঘনা নদী সংলগ্ন প্লাবনভূমি সহ দেশের অন্যান্য হাওর-বাঁওড় ও বিলে পাবদা মাছ পাওয়া যায়। বৃহত্তর ময়মনসিংহ, নরসিংদী, বৃহত্তর যশোর, বগুড়া অঞ্চলে পাবদা মাছ ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে।

mv4vi. V wk:¨

- পাবদা মাছের দেহ আঁইশবিহীন, চকচকে, উজ্জ্বল রূপালী বর্ণের। দেহের উপরিভাগ ধূসর রূপালী ও পেটের দিক রূপালী বর্ণের;
- মুখ তুলনামূলকভাবে বড়, নিচের চোয়াল বড় ও দাঁতযুক্ত;
- পাবদার দুই জোড়া গোঁফ আছে, এটি ক্যাটফিশ শ্রেণিভুক্ত;
- পৃষ্ঠ-পাখনা ছোট, পায়ু পাখনা তুলনামূলকভাবে লম্বা (পায়ুছিদ্র থেকে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত);
- পার্শ্বীয় রেখা বরাবর স্বর্ণালী বর্ণের ডোরা দাগ দেখা যায়। পুরুষ মাছের পার্শ্বীয় রেখার উপরে ও নিচে খাঁজকাটা দাগগুলো খুবই স্পষ্ট এবং স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে এ দাগগুলো অস্পষ্ট;
- এ মাছের দৈর্ঘ্য পরিপক্ব অবস্থায় ১৫-২৫ সে.মি. হয়, স্ত্রী মাছ একই বয়সী পুরুষ মাছের তুলনায় আকারে বড় হয়ে থাকে;
- পাবদা মাছ এক বছরেই পরিপক্বতা লাভ করে, তবে দুই বছর বয়সী ব্রুড মাছের কৃত্রিম প্রজননে বেশি উপযোগী; এবং
- প্রজনন মৌসুম বেশ দীর্ঘ (ফেব্রুয়ারি-সেপ্টেম্বর), তবে এপ্রিল-আগস্ট এই মাছের সর্বোত্তম প্রজনন মৌসুম।

5v‰¨ 6 5v‰¨v2¨vm

- রেণু পোনার খাদ্য: হাঁসের সিদ্ধ ডিমের কুসুম, রটিফেরা গ্রুপের জুও-প্ল্যাংকটন, কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম।
- ধানী থেকে চারা পোনার খাদ্য: কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, রটিফেরা ও সাইক্লপস গ্রুপের জুও-প্ল্যাংকটন, ক্ষুদ্র জলজ পোকা, মাছের রেনু ও ধানী পোনা, কানপোনা ও দারকিনার পোনা, ইত্যাদি।
- চারা পোনা থেকে বিক্রয় উপযোগি পাবদার খাদ্য: কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, কুচো চিংড়ি, কেঁচো, জলজ পোকা-মাকড়, শ্যাওলা ও পাতার নরম অংশ।
- পাবদা সর্বভূক, বটম ফিডার (Bottom Feeder), আর্টিফিসিয়াল ফিড দিয়ে বাণিজ্যিক চাষ করা যায়।

cv %v gvS Pv‡#i mE4v

- ছোট-মাঝারি-বড়, বাৎসরিক/ষান্মাষিক/মৌসুমি ইত্যাদি প্রায় সব ধরণের পুকুরেই চাষ করা যায়;
- একক চাষের পাশাপাশি শিং-গুলশা-টেংরা-কার্পজাতীয় মাছের সাথেও মিশ্রচাষ করা যায়;
- চাহিদা ও বাজারমূল্য বেশি থাকায় এই মাছ চাষে বেশি আয় করা সম্ভব;
- চাষকালীন সময় (Culture Period) সংক্ষিপ্ত। ৪-৬ মাসেই বিক্রয় উপযোগী হয়;
- অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে পরিবহন করে জীবন্ত অবস্থায়ও বাজারজাত করা যায়, ফলে অধিক মুনাফা হয়;
- পোনা ও অন্যান্য চাষ-উপকরণ সহজলভ্য;
- এ দেশের পরিবেশ ও জলবায়ু পাবদা চাষের উপযোগি; এবং
- অবাঞ্ছিত মাছের পোনা খেয়ে পুকুর পরিষ্কার রাখে।

cv %v gvSPv‡#i cE‡ii B‡j_5‡/vM¨ †2a! 6 ivmv$wbK U.v wj

- wcG8PZ পুকুরের পানির পিএইচ ৭.০-৮.৫ এর মধ্যে থাকলে পাবদা মাছ চাষ করা যায়। তবে ৭.৫-৮.০ মাত্রার পিএইচ পাবদা চাষের জন্য উত্তম।
- cwwbi =ŠS!vZ প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতির পরিমাণ ২৫-৩০ সে.মি. স্বচ্ছতার মধ্যে থাকলে ভালো হয়।
- 5i!v (Hardness): ৮০-২০০ মি.গ্রা/লিটার খরতা পাবদা উৎপাদনের জন্য উপযোগী। পানির খরতা ২০-৩০ মি.গ্রা/লিটার থাকলে সহজে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হয় না।
- !vcgvcvZ ২৫-৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পাবদা মাছ চাষের জন্য উত্তম।
- Av$ibZ পানিতে আয়রনের মাত্রা ০-১ পিপিএম এর মধ্যে থাকা প্রয়োজন। পানিতে ১ পিপিএম এর চেয়ে বেশি মাত্রার আয়রন থাকা পাবদা মাছ চাষের জন্য ক্ষতিকর।

. Ujkv (Mystus Cavasius(Hamilton)

2wgKv

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের মধ্যে গুলশা খুবই সুস্বাদু মাছ। এই মাছে কাঁটা কম। এ জন্য ছোট-বড় সকল বয়সের মানুষের কাছে এই মাছ প্রিয়। গুলশার বাজারমূল্য বেশি বলে চাষিরা গুলশা চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বিভিন্ন হ্যাচারিতে এই মাছের পোনা উৎপাদিত হচ্ছে। দেশের প্রায় সকল ধরণের পুকুর, দিঘি ও অন্যান্য বদ্ধ জলাশয়ে এ মাছ চাষ করা যায়। এক সময় দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, প্ল-াবনভূমিতে প্রচুর পরিমাণে গুলশা মাছ পাওয়া যেত। বর্তমানে ধানক্ষেতে কীটনাশকের ব্যবহার, সেচের মাধ্যমে জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ ও অপরিমিত সার ব্যবহারের কারণে প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস হওয়ায় এ মাছের প্রাপ্যতা উল্লে- খযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ মাছটির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা যায়।

Ujkv gv‡Si mv4vi. cwiwPw!

বৈজ্ঞানিক নাম - Mystus Cavasius(Hamilton)
স্থানীয় নাম - গুলশা।
ইংরেজি নাম - Gangetic Mystus

Av vm=j

গুলশা স্বাদু পানির মাছ। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ইন্দো-চায়না, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, সিরিয়া ও পশ্চিম-আফ্রিকায় গুলশা মাছ বিস্তৃত। দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, প্ল-াবনভূমি এবং ধানক্ষেতে এই মাছ পাওয়া যায়। বর্তমানে

বদ্ধ জলাশয় তথা পুকুর ও দিঘিতে গুলশা মাছের চাষ করা হচ্ছে। বিশেষত: বৃহত্তর ময়মনসিংহ, নরসিংদী, বৃহত্তর যশোর, বগুড়া অঞ্চলে গুলশা মাছ ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে।

mv4vi . V wk:¨

- গুলশা মাছের দেহ আঁইশ-বিহীন, চকচকে, উজ্জ্বল রূপালী বর্ণের;
- দেহ মধ্যম আকৃতির চাপানো ও পিঠের অংশ বাঁকানো;
- মুখ তুলনামূলকভাবে ছোট, উপরের চোয়াল সামান্য বড়;
- গুলশা ক্যাটফিশ শ্রেণির মাছ, এর চার জোড়া গোঁফ আছে;
- পৃষ্ঠপাখনা ও বক্ষপাখনা লম্বা কাঁটাযুক্ত;
- পৃষ্ঠপাখনা থেকে লেজ পর্যন্ত নরম মাংসল পৃষ্ঠপাখনা (adipose fin) রয়েছে এবং এর লেজ দুই ভাগে বিভক্ত;
- পরিপক্ক অবস্থায় গুলশার দৈর্ঘ্য ১৫-২৩ সে.মি. । স্ত্রী মাছ একই বয়সী পুরুষ মাছের তুলনায় আকারে বড়;
- গুলশা মাছ সবর্ভূক; এবং
- গুলশা মাছের প্রজনন মৌসুম বেশ দীর্ঘ (মধ্য ফেব্রুয়ারী-সেপ্টেম্বর), তবে এপ্রিল-আগস্ট মাস এই মাছের প্রজননের সর্বোত্তম মৌসুম।

5v%¨ 6 5v%¨v2¨vm

- রেণু পোনার খাদ্য: হাঁসের সিদ্ধ ডিমের কুসুম, রটিফেরা গ্রুপের জুও-প্ল-াংকটন, কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম;
- ধানী থেকে চারা পোনার খাদ্য: কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, রটিফেরা ও সাইক্লপস গ্রুপের জুও- প–্যাংকটন, ক্ষুদ্র জলজ পোকা, কীট-পতঙ্গ, ইত্যাদি;
- চারা পোনা থেকে বিক্রয় উপযোগি গুলশার খাদ্য: কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, কুচোচিংড়ি, কেঁচো, জলজ পোকা-মাকড়, শ্যাওলা ও পাতার নরম অংশ;
- গুলশা সবর্ভূক, বটম ফিডার (Bottom Feeder)। আর্টিফিসিয়াল ফিড দিয়ে বাণিজ্যিক চাষ করা যায় যদিও সম্পূরক খাদ্য হিসেবে এরা সরিষার খৈল, চালের কুড়া, ফিসমিল খায়।

Ujkv gvS Pv‡#i mME4v

- গুলশা মাছ ছোট-মাঝারি-বড় বাৎসরিক/ষান্মাষিক/মৌসুমি ইত্যাদি প্রায় সব ধরনের পুকুরেই চাষ করা যায়;
- একক চাষের পাশাপাশি শিং-পাবদা-টেংরা-কার্পজাতীয় মাছের সাথেও মিশ্রচাষ করা যায়;
- চাহিদা ও বাজারমূল্য বেশি থাকায় এই মাছ চাষে বেশি আয় করা সম্ভব;
- চাষকালীন সময় (Culture Period) ছোট, ৪-৬ মাসেই বিক্রয় উপযোগী হয়; এবং
- অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে পরিবহণ করে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায় ফলে অধিক মুনাফা হয়।

Ujkv gvS Pv‡#i AmME4v

- সময়মত গুণগতমানের সঠিক আকারের পোনা না পাওয়া।
- গুলশা চাষ করতে অধিক মাত্রায় অক্সিজেন (৫-৭ মি.লি. গ্রাম/লিটার হারে) চাষের পুকুরে প্রয়োজন।
- অধিক ঘনত্বে চাষ করার ক্ষেত্রে এ্যারেটর/প্যাডেল হুইলের ব্যবস্থা রাখতে হয়। পুকুর পাড়ে বিদ্যুৎ বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হয়, যা প্রান্তিক চাষিদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য।
- গুলশা মাছকে রাত্রে খাবার প্রয়োগ করতে হয়। পোনা এবং মাছ পর্যবেক্ষণও রাত্রে করতে হয় র জন্য অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক ।

. Mj%v wPswT ***(Macrobrachium rossenbergii)***

wR¨K V wk:¨

গলদা চিংড়ি মেরদন্ডহীন প্রাণী। এদের দেহ শক্ত কাইটিনের আবরণে ঢাকা, একে বহিঃকঙ্কাল বলে। এটি আবার দু'টি স্তরে বিভক্ত। উপরের স্তরটি শক্ত ও গ্যাস চলাচলে সক্ষম, কিন্তু পানি নিরোধক এবং নিচের স্তরটি নরম ও পলি-গ-ুকোসামাইন দ্বারা তৈরি, যা পানি ও গ্যাস নিরোধক নয়।

গলদা চিংড়ি দেহ ১৯ টি অংশে বিভক্ত। এরা মধ্যে ৫ টি অংশ মাথায়, ৯টি বুকে এবং ৬টি নিম্নাঙ্গে অবস্থিত। মাথার উপাঙ্গসমূহ খাদ্য খুঁজতে, বুকের উপাঙ্গসমূহ চলাফেরায় এবং নিম্নাঙ্গের উপাঙ্গসমূহ সাঁতার কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। এদের মাথা ও বুকের খোলস মিশে একটি মাত্র আবরণ তৈরি করেছে- যাকে শিরোবক্ষ বলে এবং শক্ত আবরণটিকে কেরাপেস বলে। উর্ধাঙ্গের উপাঙ্গগুলোকে ভ্রমণপদ এবং নিম্নাঙ্গের উপাঙ্গগুলোকে সন্ড়্রণপদ বলে। শিরোবক্ষের সামনে একটি করাত আছে, যা খাঁজ কাটা। এর মাধ্যমে চিংড়ির জাত বোঝা যায়। মাথার উপাঙ্গগুলোর মধ্যে এন্টিনিউল ও এন্টিনা স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে। এন্টিনার গোড়ায় রেচন যন্ত্রের ছিদ্র আছে, যা দ্বারা মূত্রজাতীয় বর্জ্য ত্যাগ করে। চিংড়ির ফুলকা কেরাপেসের নিচে থাকে। এর সংখ্যা ৮ জোড়া। দেখতে স্বচ্ছ। চিংড়ির রক্ত লাল নয়। রক্তে হিমোগে-াবিন নেই। তবে রক্ত প্লাজমায় দ্রবীভূত হিমোসায়ানিন থাকে, যা শ্বাসকার্যে সহায় অক্সিজেন সমৃদ্ধ অবস্থায় এর রং নীল এবং অক্সিজেনহীন অবস্থায় এর রং স্বচ্ছ। চিংড়ির হৃদযন্ত্র বুকের পৃষ্ঠে অবস্থিত। স্নায়ুতন্ত্র ও জননতন্ত্র কেরাপেসের মধ্যে থাকে। নিম্নঙ্গ ৬টি ভাগে বিভক্ত, যা খোলস দিয়ে ঢাকা। প্রতিটি খোলসকে পুরা বলে। খোলসগুলো আর্থ্রয়ডাল মেমব্রেন দ্বারা যুক্ত। এখানে ৫ জোড়া সন্তরণপদ আছে। শেষ প্রান্ত সরু, যাকে টেলসন বলে। উভয়পার্শ্বের পাখনাকে ইউরোপড বলে। স্ত্রী চিংড়ির চেয়ে পুরুষ চিংড়ির আকার ও ওজন বেশি হয়। পুরুষের দ্বিতীয় পা জোড়া স্ত্রীর দ্বিতীয় পা জোড়া থেকে লম্বা এবং মোটা। পুরুষের জনন অঙ্গ পঞ্চম ভ্রমণ পদের গোড়ায়, আর স্ত্রীর যৌন অঙ্গ তৃতীয় ভ্রমণ পদের গোড়ায় অবস্থিত। পরিপক্ব স্ত্রীর মাথার নিচে ও পার্শ্বে গোলাপী রং/কমলা রঙের আভা দেখা যায়।

Avw% vm=vb

গলদা চিংড়ি ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গ্রীষ্মমন্ডল ও ক্রান্তিয়মন্ডলের কাছাকাছি বেশি পাওয়া যায়। এ সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কাম্প্যুচিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন গুরত্বপূর্ন। এ সমস্ত দেশের নদী, হ্রদ,প-াবন ভূমি, হাওর-বাঁওড়, ইত্যাদি হচ্ছে এদের প্রাকৃতিক বাসস্থান। এরা নদী মোহনা হতে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার উজান পর্যন্ড় পরিভ্রমণে সক্ষম।

Av vm=vj

নদ-নদী,হ্রদ, প-াবনভূমি, হাওর-বাঁওড় ও পুকুরের তলদেশে কাদার উপর বাস করে।

5v%¨v2¨vm

গলদা চিংড়ি পানির তলদেশে বিচরণ করে এবং সেখানকার জীবিত ও মৃত বিভিন্ন প্রাণিজ ও উদ্ভিজ বস্তু এরা ভক্ষণ করে। এ কারণে খাদ্য স্বাভাবে এরা সর্বভুক। প্রাকৃতিক পরিবেশে বিদ্যমান ছোট ছোট অমের"দন্ডী প্রাণী, কুঁচো চিংড়ি, ছোট শামুক, পোকা-মাকড় ও লার্ভা কৃমি, শেওলা উদ্ভিদের টুকরো এদের প্রিয় খাদ্য। এরা খাদ্য সংগ্রহ করে বড় পায়ের দাঁড়ার সাহায্যে এবং খাদের উপস্থিতি অনুভব করে এন্টিনার সাহায্যে। পানিতে স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব থাকলে সবল চিংড়ি দুর্বল চিংড়িকে খেতে পারে। বিশেষ করে খোলস বদলের স্বাজাতিভোজীদা বেশী দেখা যায়।

প্রাকৃতিক খাদ্য ছাড়াও এরা কুড়া, ভুসি, দানাদার শস্য, খৈল, ফলের টুকরো, মাছের গুঁড়া, গবাদিপশুর রক্ত, শামুক-ঝিনুকের মাংস খেতে পছন্দ করে।

W%wRK w&L

গলদার বৃদ্ধি নিরবচ্ছিন্ন নয়। দেহ শক্ত খোলসে ঢাকা থেকে বলে যখন খোলস বদলায় তখনই কেবল কিছু বড় হয়। খোলস পাল্টানোর অবস্থা নির্ভর করে খাদ্য, তাপমাত্রা, পানির গণাগুণ, দেহের অবস্থা এবং হরমোনের কর্মকান্ডের ওপর। খোলস পাল্টনোর এদের দেহ দুর্বল ও নরম থাকে। সে সময়ে এদর নিরাপাদ আশ্রয়স্থল প্রয়োজন হয়। লার্ভা

থেকে পোস্ট-লার্ভায় পোঁছুতে এরা ১১ বার খোলস পরিবর্তন করে। তবে এরা যত বড় হতে থাকে, খোলস পাল্টানোর হাট ততই কমে যেতে থাকে। দৈহিক ওজন ৫০ গ্রামের ওপর হলে এ হার ১৮-২১ দিনে একবার হতে পারে। খোলসের উপর সবুজ শেওলার আবরণ পড়লে চিংড়ির বৃদ্ধি থেমে যায়। স্ত্রী গলদার চেয়ে পুরুষের বৃদ্ধির হার বেশি। পুকুরে চাষকৃত গলদা ৫-৬ মাসে ৫০-১০০ গ্রাম পর্যন্ত বড় হতে পারে।

Mj‰v wPswTi cÖbb 6 R? bPO

জীবনের পর্যায় ঃ গলদার জীবনচক্র ৪টি অবস্থাই প্রধান। যেমন- ডিম, লার্ভা, পোস্ট লার্ভা এবং চিংড়ি।

cÖbb mg$Kvj

গলদা চিংড়ি প্রায় সারা বছর প্রজননে সক্ষম হলেও ডিসেম্বর থেকে জুলাই মাসই গলদার প্রধান প্রজনন কাল। মে-জুন উপকূলের নদীগুলোতে বেশি পোনা পাওয়া যায়।

wgjb 6 wAg cvTv

গলদা চিংড়ি ৫-৬ মাসের মধ্যেই পরিপক্ব হয়। অনুকূল পরিবেশ ও খাদ্যের ওপর পরিপক্ব নির্ভরশীল। স্ত্রী চিংড়ির জননতন্ত্র কেরাপেসের তলায় থাকে ও ডিম পাড়ার ২-৩ দিন আগে দেখতে কমলা রঙের মত হয়। চিংড়ি নিশাচর প্রাণি। অধিকাংশ মূলকর্মকান্ড রাতে ঘটে, যেমন- খাদ্য গ্রহণ, খোলস, পাল্টনো, সঙ্গম এবং ডিম পাড়া। একটি পুরুষ চিংড়ি ৩-৪টি চিংড়ির সাথে সঙ্গমে সক্ষম। লার্ভার জন্য আধা লবণাক্ত পানি প্রয়োজন। তাই প্রজনন কালে এরা উপকূলে চলে আসে। মিঠা পানিতে প্রজনন এবং ডিম ফুটালে ও লার্ভা ৪-৫ দিনের বেশি বাঁচে না।

মিলনের আগে পরিপক্ব স্ত্রী খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়তে সময় লাগে প্রায় ১০-১৫ মিনিট। নতুন খোলস শক্ত হতে সময় লাগে প্রায় ৬ ঘন্টা। স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গম করে খোলস ছাড়ার ৩-৬ ঘন্টার মধ্যে। অর্থাৎ নরম খোলস বিশিষ্ট স্ত্রীর সাথে শক্ত খোলস বিশিষ্ট পুরুষের মিলন ঘটে থাকে। মিলন হয় বুকে বুকে। মিলনকালে পুরুষ চিংড়ি তার সাদা আঠালো শুক্রাধারটি (পঞ্চম ভ্রমণ পদের মাঝে) স্ত্রী চিংড়ির তৃতীয় ভ্রমণে পদের গোড়ার জনন ছিদ্রের কাছে আটকিয়ে দেয়। এ কাজটি শেষ হতে সময় লাগে ১৫-২০ মিনিট। মিলনের ১০-১২ ঘন্টার মধ্যে স্ত্রী চিংড়ি ডিম ছাড়ে। ডিমগুলো বের হওয়ার পথে শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত ডিমগুলো পেটের তলায় সন্তরণ পদের মধ্যে অবস্থান নেয় এবং এক প্রকার আঠালো রসের সাথে আটকে থাকে। এ অবস্থায় এরা সন্তরণ পা নেড়ে ডিমে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

ডিমগুলো এখানে সর্বোচ্চ তিন সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। ৫০-১০০ গ্রাম ওজনের একটি প্রাপ্ত বয়স্ক চিংড়ি ৫০,০০০-১,০০,০০০ ডিম পাড়তে পারে। তবে পরিপক্বতার প্রাথমিক স্ড়রে এ সংখ্যা ৫,০০-২০,০০০ টি।

wAg

ডিমের রং প্রথমে কমলা বর্ণ থাকে এবং পর্যায়ক্রমে ১৮-২১ দিনে কালচে ধূসর রং ধারণ করে। ২৮ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ডিম ফুটতে প্রায় ২০ দিন সময় লাগে। ডিম ফোটার পর স্ত্রী চিংড়ি সন্ড়রণ পা নেড়ে লার্ভাগুলোকে পানিতে সরিয়ে দেয়। ডিম থেকে লার্ভা বের হতে ২ রাত পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

jv2v"

লার্ভা দেখতে পোকার মত। এরা লেজ উপরে এবং মাথা নিচে চিৎ হয়ে ভাসতে থাকে। এ অবস্থায় এরা আধা লবণাক্ত (১২-১৫ পিপিটি) পানিতে অবস্থান করে এবং প্রাণিকণা খেতে শুরু করে। লার্ভা অবস্থায় ৩০-৪৫ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

‡cvd jv2v"

পোস্ট-লার্ভায় পোঁছানোর পর এদের স্বভাব পরিবর্তন। তখন এদেরকে পূর্ণাঙ্গ চিংড়ির মত দেখায় এবং নদী বা খাল-বিলের পাড়ের কাছে তলদেশে হামাগুঁড়ি দিয়ে হাঁটে। এ অবস্থায় এরা অপেক্ষাকৃত বড় খাদ্য টুকরো (উদ্ভিদ ও প্রাণিজ) খেতে পারে।

পোস্ট-লার্ভার লবণাক্ততা সহনশীলতা বিস্তৃত। পোস্ট-লার্ভা অবস্থায় আসার ৭-১৫ দিনের মধ্যে (১.৫ সে.মি.) এরা মিঠা পানির দিকে চলে আসতে শুরু করে। এ অবস্থায় এরা নদী স্রোতের বিপরীতে পাড় বরাবর অগ্রসর হতে থাকে।

প্রায় ৩০ দিনের মধ্যে পোস্ট-লার্ভা কিশোর চিংড়িতে (৩ সে.মি.) পরিণত হয়। ২-৩ মাস বয়সে (৬-৭ সে.মি.) এরা তরুণ এবং ৩-৪ মাস পরে প্রাপ্তবয়স্ক চিংড়িতে পরিণত হয়।

. vM%v wPswT (Penaeus monodon)

vsjv‡%‡ki A1b?w!‡! wPswT m-3‡%i 2wgKv

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠীর প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ, উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ি সম্পদের ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত এবং স্বীকৃত। আমাদের দেশে আশির দশকে ক্ষুদ্র পরিসরে চিংড়ি চাষ শুরু হয়ে বিগত তিন দশকে বাংলাদেশে চিংড়ি চাষ এলাকা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হলেও বাগদা চিংড়ির গড় উৎপাদন ২০০-২৫০ কেজি/ হেক্টর/বছর, যা বিশ্বের অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশের তুলনায় খুবই কম। বাংলাদেশের বাগদা চাষ এখনও সনাতন পদ্ধতিতে রয়ে গেছে। বর্তমান চাহিদার আলোকে চাষ ব্যবস্থাপনার ধরন ও কৌশল পরিবর্তন করতে হবে। জলবায়ুর পরিবর্তন, বাগদা চাষের উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, জনসংখ্যার বৃদ্ধিজনিত চাপ ইত্যাদি কারণে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা ব্যতিত অন্য কোন বিকল্প নেই। চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন ব্যতিত বাগদা খাতে কাংখিত উৎপাদন সম্ভব নয়।

cwiwPw!Z

বাগদা চিংড়ি একটি অমেরুদন্ডী, জোড়া পা ও খোলস বিশিষ্ট জলজ প্রাণী। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চিংড়ি মাছ নয় তবে সাধারণের কাছে তা মাছ হিসেবেই সুপরিচিত। সামুদ্রিক চিংড়ির মধ্যে বাগদা চিংড়ি সবচেয়ে বড় এবং বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন। বাগদা চিংড়ি ৫-২৫ পিপিটি লবণাক্ত পানিতে বড় হয় এবং উপযুক্ত পরিবেশে ৩-৪ মাসে ৩০-৪০ গ্রাম ওজনের হয়। স্ত্রী বাগদা পুরুষ বাগদা থেকে তুলনামূলকভাবে আকারে বড় হয় এবং বেশী দিন বেঁচে থাকে।

5v%¨ 6 5v%¨v2¨vm

বাগদা চিংড়ি মূলতঃ নিশাচর প্রাণী এবং অন্ধকার পছন্দ করে। এরা মাংসাশী এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে ছোট চিংড়ি, ক্ষুদ্র প্রাণী এবং শ্যাওলা খেয়ে থাকে। চিংড়ি পানির তলায় বিচরণশীল মন্থর গতিসম্পন্ন প্রাণী শিকার করে। এরা খুব ধীরে ধীরে খাদ্য গ্রহণ করে এবং খাদ্য হজম হতে ৪-৫ ঘন্টা সময় লাগে। বয়স, ঋতু এবং স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত হয়।

wPswT Pv‡#i Rb¨ =wb wb 'PbZ

বাগদা চিংড়ি খামারের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরী:

() %#-.gE Gj vKvZ শহর বা শিল্প এলাকা, যেখানকার বর্জ্য পদার্থ পার্শ্ববর্তী নদী/খালে পড়ে সেসব এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন করা ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক, সার ইত্যাদি এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন ঝুঁকিপূর্ণ। অতএব এসব এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন না করাই উত্তম।

2) cwwbi B,mZ বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য লবন পানির প্রয়োজন। চিংড়ি খামার এমন স্থানে স্থাপন করতে হবে যেখানে নদী/খাল থেকে সহজেই পানি খামারে ঢুকানো ও বের করা যায় এবং পানি দূষণমুক্ত হয়।

+) gwwUi U.vU.Z মাটির গুণাগুণ চিংড়ি চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ যা সহজেই খামারের পানিকে প্রভাবিত করে। খামার স্থাপনের জন্য মাটিতে:

- কাদার পরিমান বেশী থাকতে হবে এবং পিএইচ ৫ এর উপরে থাকতে হবে।
- জৈব পদার্থের পরিমান কমপক্ষে ১০% থাকতে হবে।
- এসিড সালফেট ও আয়রনের মাত্রা যথাক্রমে ০.০৩ পিপিএম এবং ০.০১ পিপিএম এর কম থাকতে হবে।

wPswT Pv‡#i Rb¨ cwwbi wb-Q.'! V wk:¨ 1vKv c$wRbZ

ক) লবনাক্ততা - ১০ থেকে ২৫ পিপিটি

খ) তাপমাত্রা	-	২৫⁰-৩০⁰ সেঃ
গ) পিএইচ	-	৭.৫- ৮.৫
ঘ) এ্যালকালিনিটি	-	৮০ পিপিএম এর বেশী।
ঙ) দ্রবীভূত অক্সিজেন	-	৪-৮ পিপিএম (মি.গ্রা./লিটার)।
চ) হাইড্রোজেন সালফাইড	-	০.০৩ পিপিএম (মি.গ্রা./লিটার) এর কম।
ছ) আনআয়োনোইজড অ্যামোনিয়া	-	০.১ পিপিএম (মি.গ্রা./লিটার)এর কম।
জ) কীটনাশক দ্রব্যের উপস্থিতি	-	থাকা উচিৎ নয়।

F) 2-€Kǖ]!Z খামারের ভূ-প্রকৃতি অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের উপরিতল সম্পর্কে ধারনা থাকতে হবে যেন খামারে পানি ওঠানো-নামানোসহ অন্যান্য অবকাঠামো স্থাপনের হিসাব সহজে করা যায়।

G) A Kv‹v‡gvM! mvE4vZ চিংড়ি খামার স্থাপনের জন্য এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেখানে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সড়ক যোগাযোগ, পানি নিয়ন্ত্রণের সুইসগেট ও বাজারজাতকরণের সুবিধা আছে।

J) w %Ę mi ivRZ উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে খামার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকা অত্যন্ত জরুরী তা না হলে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। নিরাপত্তা এবং বসবাসের জন্যও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন।

e) %7 RbkwQZ চিংড়ি খামার লাভজনক করতে হলে দক্ষ জনশক্তি আবশ্যক। সুষ্ঠু খামার পরিচালনার জন্য যেসব এলাকায় দক্ষ জনশক্তি পাওয়া যায় সেখানে খামার স্থাপন করা উচিত।

(K) B,cv%b mvgMÖ mRRj2¨!vZ যেসব এলাকায় উৎপাদন সামগ্রী যেমন- পোনা, চুন, সার, যন্ত্রপাতি, জ্বালানী ইত্যাদি সহজে পাওয়া যায় সেখানে চিংড়ি খামার স্থাপন করা উচিত।

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে চিংড়ির খামার স্থাপন করা উচিত। এছাড়া নিরাপত্তা এবং সামাজিক পরিবেশও বিবেচনায় আনতে হবে। শুধুমাত্র মাটি ও পানির গুণাগুণ দেখে এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ বিবেচনা না করে চিংড়ি খামার স্থাপনের ফলে অনেকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং রোগ ও মড়কসহ নানাবিধ সমস্যায় পতিত হয়েছে। আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে জলাশয় নির্বাচন করা উচিত।

w w2bØi‡bi gvSPv# cNw! 6 cÈ'ii †kÖ b¨vm

ক. বিভিন্ন ধরনের মাছচাষ পদ্ধতি

পরিবেশ বিজ্ঞানী বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী মাছচাষ হলো-পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের বিভিন্ন কলাকৌশলের ধারাবাহিক প্রয়োগ। সাধারণভাবে বলা যায়, কোন একক জলায়তনে স্বাভাবিক উৎপাদনের চেয়ে বেশি উৎপাদন পাওয়ার জন্য ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রয়োগই হচ্ছে মাছচাষ। অর্থাৎ জলাশয়ের পরিবেশ মাছের সুস্থ ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির উপযোগী করে তোলার জন্য যে সকল অত্যাবশ্যকীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সম্মিলিতভাবে এদেরকে মাছচাষ বলে। মূলত তিনটি প্রধান পর্বে মাছচাষের এ পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

gRÈc~" ¨ =¤ebv @ এ পর্বে তলার অতিরিক্ত কাদা অপসারণ, আগাছা দমন এবং রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ ও চুন এবং সার প্রয়োগ করে জলাশয়ের পরিবেশ মাছচাষের উপযোগী করে তোলা হয়।

gRÈKvj?b ¨ =¤ebv @ জলাশয়ে মজুদের জন্য মাছের উপযুক্ত জাত নির্বাচন, ভাল পোনা শনাক্তকরণ,সঠিক নিয়মে পোনা পরিবহন ও মজুদ করা হয়ে থাকে।

gRÈci !?" ¨ =¤ebv @ এ পর্যায়ে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের ভারসাম্যতা বজায় রাখা, প্রয়োজনে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ, পানির গুণাগুণ সংরক্ষণ ও মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

জলাশয় থেকে অধিক উৎপাদন পেতে হলে উপরোক্ত তিন পর্যায়ের কাজই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এদের কোন একটি যথাযথভাবে সম্পাদনে ঘাটতি হলে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া যাবে না।

gvSPv‡#i 4iন

আমাদের দেশের জলাশয়গুলোতে প্রধানত একক ও মিশ্রচাষ পদ্ধতিতে মাছের চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। এ দু'ধরনের চাষ পদ্ধতি চাড়াও বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ কিছু চাষ পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- খাঁচায় মাছ চাষ, পেনে মাছচাষ ও সমন্বিত মাছচাষ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এ সব বিশেষ পদ্ধতির মাছচাষ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করলে ও আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত এগুলোর সম্প্রসারণ খুবই সীমিত।

mbv!b Pv# ¨ =¤ebv

এ ধরনের চাষ ব্যবস্থাপনায় প্রায় বিনা খরচে বা অল্প খরচে মাছচাষ করা হয়। শুধুমাত্র পুকুরে কিছু মাছের পোনা ছাড়া হয়। পুকুরে কোন সার বা সম্পূরক খাবার দেয়া হয় না, সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক খাবারের ওপর নির্ভর করা হয়। তা ছাড়াও এ ধরনের মাছচাষে অন্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ বা মাছচাষের কারিগরি বিষয় বিবেচনা করা হয় না। এর ফলে পুকুরে প্রতি শতাংশে বছরে ১-২ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাছচাষের ধারাবাহিক পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ না করেই পুকুরে হিসেব ছাড়া মাছের পোনা ছেড়ে অনিয়মিতভাবে আহরণ করা।

BbÒmbv!b Pv# ¨ =¤ebv

সামান্য উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা যেখানে পুকুরের আগাছা ও অবঞ্ছিত মাছ দূর করে তুলনামূলক ঘনত্বে পোনা মজুদ করা হয়। অনিয়মিত সার ও খাদ্য প্রয়োগ ছাড়াও পরিকল্পিতভাবে মাছচাষের অন্য কাজগুলো অনিয়মিতভাবে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে আমাদের দেশে এ ধরনের চাষ ব্যবস্থাপনাই অধিক প্রচলিত এবং এর ফলে প্রতি শতাংশে বাৎসরিক উৎপাদন ৫-১২ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

Av4v wbw T cNw!

জলাশয়ের প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, মধ্যম মজুদ ঘনত্ব, নিয়মিত সার ও হাতে তৈরি খাদ্য প্রয়োগ, পোনা মজুদের ৩-৪ মাস পর থেকে আংশিক মাছ ধরা ও পুনঃ মজুদ এবং প্রয়োজনে পানি বদল

ও দ্রবীভূত অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ মাছচাষের কিছু আধুনিক কলাকৌশল মেনে চলা হয়। এ ব্যবস্থাপনায় মাছের বাষিক উৎপাদন প্রতি শতাংশে ১৫-৩০ কেজি বা তার ও অধিক হতে পারে।

wbw T cNw!

ব্যয়বহুল অবকাঠামোগত সংস্কারের পর অতি উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মাছ চাষই হলো নিবিড় পদ্ধতি। ব্যবহার্য উপাদানসমূহ ব্যয়বহুল হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে অধিক বিনিয়োগ ও শ্রমের প্রয়োজন। অধিক মুনাফা তবে ঝুঁকি বেশ এবং পরিবেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে থাকে।

নিবিড় পদ্ধতিতে মাছচাষে অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ করে সম্পূর্ণরূপে গুণগত মানসম্পন্ন সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করে মাছ চাষ করা হয়। এ ক্ষেত্রে পান বদল ও বায়ু সঞ্চালনও করা হয়। নিবিড় মাছচাষের বেলায় সাধারণত একক কোন প্রজাতির মাছচাষ করা হয়।

উপরে উল্লেখিত চার ধরনের মাছচাষ পদ্ধতির খাদ্য ব্যবহার সম্পর্কিত আরও একটি তুলনামূলক বিবরণী নিচে দেয়া হলো-

চাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা%	সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা%
সনাতন পদ্ধতি	১০০	০
উন্নত সনাতন পদ্ধতি	৭০	৩০
আধা নিবিড় পদ্ধতি	৫০	৫০
নিবিড় পদ্ধতি	০	১০০

খ)c⊠'ii cÖi‡2% 6 Av%k"c⊠'ii V wk:¨

পুকুর হচ্ছে মাচের ঘর। মানুষের বসবাসের জন্য যাদের ঘরের গুণগতমান যত ভাল, তাদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা তত ভাল। ঘর যেমন নানান ধরনের হয়ে থাকে, তেমনি পুকুরও কতগুলো বৈশিষ্ট্যর ওপর ভিত্তি করে হরেক রকমের হয়। পানির ধারণ ক্ষমতা, পুকুরে মাছচাষের ধরন এবং পুকুরের আয়তন অনুসারে পুকুরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

মাটির প্রকৃতি বা গড়ন ও পুকুরের গভীরতার কারণে পানির প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে পুকুর মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(K) v,mwiK c⊠^ (5) †gamg⊠ c⊠^

(K) v,mwiK c⊠^@ যে সমস্ত পুকুরে সারা বছর পানি থাকে, তাকেই বাৎসরিক পুকুর বলে। এ সমস্ত পুকুরে

- পানির গভীরতা ৪-৯ ফুট বা তারও বেশি হতে পারে।
- দেশীয় রুই-কাতলাজাতীয় মাছের সাথে চীনা কার্প মাছের মিশ্র চাষাবাদ করা যায়।
- চাষযোগ্য মাছের নার্সারি এবং লালন পুকুর হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

মাছচাষের ধরন অনুযায়ী আবার পুকুরগুলোকেও ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. আতুর পুকুর(নার্সারি) ঃ যে সমস্ত ছোট, মাঝারি ও অগভীর পুকুরে ৪-৬ দিন বয়সের নেণু পোনা ছেড়ে ১৫-২০ দিন লালন-পালন করা হয় তাকেই আতুর পুকুর বলে। এ সমস্ত পুকুরে-

- পানির গভীরতা ৩-৫ ফুট থাকতে পারে
- আয়তন ১০-৩০ শতাংশ হতে পারে
- মাটি সাধারণভাবে দো-আঁশ অথবা এঁটের দো-আঁশ হতে পারে
- আয়তাকার অথবা বর্গাকারও হতে পারে।

২. লালন পুকুর ঃ আতুর পুকুরের মতো অথবা কিছু বড় একই ধরনের পুকুরকে লালন পুকুর বলা হয়। এ ধরনের পুকুরে ১"মাপের ১৫-২০ দিন বয়সের পোনা মজুদ করে ৩"-৪"বড় করে বিক্রয় করা হয়। এ সমস্ত পুকুরে-

- পানির গভীরতা ৪-৬ ফুট হতে পারে
- আয়তন ২০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ হতে পারে
- পুকুরটি আয়তাকার/চৌকোনাকার হতে পারে।
- শতাংশ প্রতি ৮০০-১০০০ টি ১ ইঞ্চি মাপের পোনা লালন করে ২ মাসে ৩-৪ ইঞ্চি মাপের পোনা উৎপাদন করা যেতে পারে।

০৩. মজুদ পুকুর ঃ লালন পুকুরের মতো অথবা বড় বাৎসরিক পুকুরকে মজুদ পুকুর হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এ ধরনের পুকুরে ৩-৪ ইঞ্চি মাপের পোনা ছেড়ে ১-২ বছরের মধ্যে বড় মাছ উৎপন্ন করা হয়। এ সমস্ত পুকুরে -

- পানির গভীরতা ৪-৮ ফুট হতে পারে
- আয়তন ২০ শতাংশ থেকে বড় যে কোন মাপের হতে পারে
- শতাংশ প্রতি ৩০-৩৫ টি বড় পোনা মজুদ করা যেতে পারে
- চিংড়ি কার্প চাষ করা যেতে পারে।

(5) ‡gamgx cK^ @ যে সমস্ত পুকুরে বছরে সারা বছর পানি থাকে না তাকেই মৌসুমী পুকুর বলে। এ সমস্ত পুকুরে

- পানির গভীরতা ২-৭ ফুট পর্যন্ত হতে পারে
- নাইলোটিকা, সরপুঁটি এবং শিং-মাগুরের চাষ করা যায়
- রুই-কাতলা জাতীয় মাছের পোনা ও চাষ করা যায়
- প্রাকৃতিক ও বন্যায় প□াবিত মাছ আটকিয়েও লালন-পালন করা যায়
- চিংড়ি চাষ করা যায়।

B%vRi. ঃ বাড়ির পাশের ডোবা,খাদ ছোট পুকুর এবং বালি মাটির ছোট, মাঝারি ও বড় পুকুর।

cK^i AvKvi

পুকুরের আয়তন অনুযায়ী পুকুরকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(ক) ছোট পুকুর বা মিনি পুকুর
(খ) মাঝারি পুকুর
(গ) বড় মজুদ পুকুর

(ক) ছোট (মিনি) পুকুর

- আয়তন ১-৫ শতাংশ
- ছোট ধরনের মাছ,যেমন-নাইলোটিকা, শিং-মাগুর,সরপুঁটি ইত্যাদি চাষের জন্য ভাল।
- পারিবারিক চাহিদা (৩-৪ জনের) মিটাতে পারে
- মাছের যত্ন ও মাছ ধরা সহজযোগ্য
- উৎপাদনশীল বেশি
- পানি নষ্ট হয়ে গেলে বদলানো সহজ
- অক্সিজেন কম লাগে ফলে মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা হতে পারে।
- পরিবারের উচ্ছিষ্ট সামগ্রী, যেমন- তরকারির খোসা, হাঁস-মুরগির নাড়িভুরি ও বিষ্ঠা ব্যবহারেই আশাজনক উৎপাদন পাওয়া যায়।

(খ) মাঝারি পুকুর

- আয়তন ১০-৩০ শতাংশের মধ্যে
- রুই, কাতলা জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন পুকুর হিসেবে ব্যবহার করা যায়
- রুই, কাতলা জাতীয় ও চীনা কার্পের মিশ্রচাষে এবং কার্প মিশ্রচাষে ব্যবহার করা যায়
- মূলতঃ পারিবারিক প্রয়োজন মিটায় তবে কিছু ব্যবসায়িক প্রয়োজন ও মিটাতে পারে
- ব্যবস্থাপনা সহজ তবে মিনি পুকুরের চেয়ে একটু কঠিন।

(গ) বড় মজুদ পুকুর

- আয়তন ৩০ শতাংশ থেকে এর বেশি যে কোন মাপের
- রুই, কাতলা ও চীনা কার্পের যৌথ চাষাবাদ ব্যবহার করা লাভজনক
- গভীরতা কমপক্ষে ৪ ফুট এবং সর্বোচ্চ ৮-৯ ফুট (পানির)
- বাতাসে সহজেই ঢেউ ওঠে বলে মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য সহায়ক
- পারিবারিক এবং ব্যবসায়িক চাহিদা মিটাতে সক্ষম
- ব্যবস্থাপনা তুলনামূলকভাবে কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য।

Av%k'cE'i i V wk:¨

- পুকুরের পাড় আগাছা ও ঝোপঝাড় মুক্ত হবে
- পুকুরে তলা সমান থাকবে
- ডালপালা যুক্ত বড় গাছ পুকুর পাড়ে থাকবে না
- দিনের ৬-৮ ঘন্টা যাতে সূর্যের আলো পুকুরে পড়তে পারে সে ব্যবস্থা থাকবে
- পুকুরে বকচড় থাকবে
- মাটির প্রকারভেদ পুকুরের ঢাল ১ঃ১ বা ১ঃ২ হবে
- সারা বছর পানি ৬-৭ ফুট থাকবে
- পুকুর পাড় মজবুত ও বন্যামুক্ত উচ্চতায় হতে হবে এবং পাড়ের পাড় ৫ ফুট হওয়া উচিত
- পুকুরের মাটি দো-আঁশ ধরনের হওয়াই সর্বোত্তম।
- বসতবাড়ির কাছাকাছি হতে হবে।
- পুকুরের তলায় জৈব পদার্থের পরিমাণ ১-২% জৈব কার্বন থাকবে
- পুকুর আয়তাকার হবে
- কাদার পরিমাণ ৪-৬ ইঞ্চি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

gvSPv‡# gwU 6 cwbi U.vU.

প্রতিটি প্রাণীর সুন্দরভাবে বসবাসের জন্য তাদের উপযোগী স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের প্রয়োজন। মাছের বাসস্থান হচ্ছে জলাশয় এবং জীবন ধারণের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে পানি। লাভজনকভাবে মাছচাষের জন্য সেই বাসস্থান ও হাওয়া চাই স্বাস্থ্যসম্মত। মাছের খাদ্যগ্রহণ, বেঁচে থাকা, দৈহিক বৃদ্ধি, প্রজনন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক ও গুণাবলির একটি অনুকূল মাত্রা রয়েছে। জলজ পরিবেশে এসব গুণাবলির অনুকূল মাত্রা মাছচাষে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনে সহায়ক ভুমিকা পালন করে থাকে। জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে মাটির বিভিন্ন গুণাগুণের ওপর নির্ভর করে। উর্বর মাটিতে খনন করা পুকুরের পানি সাধারণত উর্বর হয়। উর্বর মাটি ও পানি মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দেয়। সুতরাং সফলভাবে মাছচাষে মাটি ও পানির গুণাগুণের গুরুত্ব অপরিসীম।

পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুণ যথাযথ মাত্রায় না হলে ঃ

- মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন হবে না
- মাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হবে না
- বাহির থেকে দেয়া খাদ্যের অপচয় হবে
- মাছের উৎপাদন কম হবে
- মাছ রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে

gwUi U.vU.

gwUi Bcv‰bZমাটি হলো ভূপৃষ্ঠর উপরিতলের নরম খনিজ এবং জৈব উপাদানের মিশ্রণ, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। মাটি প্রধানত ৪টি প্রধান উপাদান সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো নিম্নে উল্লিখিত হলো-

১) খনিজ পদার্থ - ৪৫% ২) জৈব পদার্থ - ৫%

৩) বায়ু - ২৫% ৪) পানি - ২৫%

সুতরাং মাটি কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় - এই তিন ধরনের পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। নিম্নে মাটির বিভিন্ন উপাদানের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

() 5wbR c‰v1"ভূ-ত্বক প্রথমে শিলা দ্বারা গঠিত ছিল। পরে তা শিলা ক্ষয় প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে ছোট খন্ডে বা এককে রূপান্তরিত হয়। মাটির এই অংশ বালি ও কর্দম কণা দ্বারা গঠিত। শিলা ক্ষয় প্রক্রিয়ার ফলে উপরোক্ত কণা ও অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যোপাদান যেমন- নাইট্রোজেন ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান মাটিতে যুক্ত হয়। মাটিতে খনিজের পরিমাণ হলো ৪৫%।

2) vR c‰v1"Z মাটিতে ১-২% জৈব পদার্থ থাকে তবে হিম অঞ্চলের মাটি ২-৫% জৈব পদার্থ ধারণ করে। এই সব জৈব পদার্থ উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবশিষ্টাংশ এবং মলমূত্র হতে মাটিতে আসে। জৈব পদার্থ মাটির আবদ্ধকরণ পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ খুম কম হলেও এটি ব্যাপকভাবে মাটির গুণাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। জৈব পদার্থ নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে-

১. সমস্ত পুষ্টি উপাদানের মজুদ হিসেবে কাজ করে;
২. মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব গুণাবলী উন্নত করে;
৩. ভূমি ক্ষয় রোধ করে;

৪. জলাশয়ের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে;

৫. অণুজীবের প্রধান শক্তি হলো এই জৈব পদাথ এবং

৬. মাটিতে নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস এ জৈব পদার্থ।

+) \$-6 cwb

প্রবল বর্ষার সময় বা সেচ দিলে মাটির অধিকাংশ রন্ধ্রই পানি দ্বারা পূর্ণ হয় কিন্তু শুকনা বা খরার সময় ঐ রন্ধ্রগুলো বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে। বায়ূমন্ডলের বায়ূ অপেক্ষা মাটির বায়ূতে বেশি পরিমাণ কার্বন-ডাই অক্সাইড ও জলীয়বাষ্প থাকে কিন্তু অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। বায়ূর প্রধান কাজ হলো উদ্ভিদের মূলের শ্বসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা। মৃত্তিকা পানির গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো:

১. মাটির ভৌত রাসায়নিক ও জৈবিক কার্য নিয়ন্ত্রণ করা;

২. শলা ক্ষয় প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা;

৩. সালোক সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে অংশগ্রহন করা;

৪. দ্রাবক ও পুষ্টি উপাদানের বাহক হিসেবে কাজ করে।

gwUi ivmv\$wbK W wk:¨

মাছচাষের জন্য বদ্ধ জলাশয়ের পানির উপযোগিতা মাটির পি এইচ, ফসফরাস, নাইট্রোজেন, জৈব পদার্থ ইত্যাদি উপাদানের মাত্রার ওপর নির্ভর করে। নিচে এসব উপাদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

() wc G8P

মাটির পিএইচ ৬.৫ -৯.০ এর মধ্যে হলে তা মাছচাষের জন্য উত্তম। অনুকূল পিএইচ মাত্রায় ফসফরাসের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায়। পিএইচ ৬.০ এর নিচে হলে মাটি অধিক অম্লীয় হয় এবং পানিতে ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি দেখা যায়। আবার পিএইচ-এর মাত্রা ৯.০ এর বেশি হলে ফসফরাসের সরবরাহ হ্রাস পায়।

2) dmdivm

মাটিতে পরিমিত জৈব পদার্থের উপস্থিতিই সহজ প্রাপ্য ফসফরাসের সরবরাহ অব্যাহত রাখে। মাছের জন্য প্রতি ১০০ গ্রাম মাটিতে ১০-১৫ মিলিগ্রাম হারে সহজপ্রাপ্য ফসফেট থাকা প্রয়োজন।

+) bv8‡U‡Rb

রায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেনই মাটির নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস। ১০০ গ্রাম মাটিতে ৮-১০ মিলিগ্রাম হারে সহজপ্রাপ্য নাইট্রোজেন থাকা দরকার।

C) wR c‰1"

জৈব পদার্থ পুকুরের তলার মাটিকে সজীব ও সক্রিয় রাখে এবং পানি চোয়ানো বন্ধ করে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এটা ফসফরাস এবং নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস জলজ পরিবেশে জৈব পদার্থ বায়ুমন্ডল থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন ধারণ করে। অতিরিক্ত মাত্রায় জৈব পদার্থ পানির পিএইচ কমিয়ে দিয়ে পানি দূষিত করে। ভাসমান কণার কারণে পানি ঘোলা হলে জৈব পদার্থ প্রয়োগে তা দূর করা যায়। পুকুর বা জলাশয়ের মাটিতে সাধারণত ১.০-২.০ ভাগ জৈব কার্বন থাকলে পানির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

gwUi ckÖi‡2%

বালি, পলি ও কাদা - এই তিনটি স্বতন্ত্র মাটি কণার তুলনামূলক অনুপাতের উপর ভিত্তি করে মাটির বুনটসমূহের নামকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মাটি বিভিন্ন অনুপাতে বালু, পলি ও কাদা কণা ধারণ করে থাকে। কোন মাটিতে বালু কণার পমিাণ বেশি, আবার কোনটাতে কাদা কণার পরিমান বেশি। এই পরিবর্তনকে নির্দিষ্ট সীমারেখায় রেখে মাটিকে ১২টি গ্রুপ বা দলে বিভক্ত করা হয়, এই দলগুলোই বুনটভিত্তিক শ্রেণী বলে পরিচিত। এই শ্রেণীগুলোর একটি হতে অন্যটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক ধর্মে যথেষ্ট পার্থক্য

পরিলক্ষিত হয়। যে মাটিতে অধিক পরিমাণ কাদা কণা (%) ধারণ করে তাকে কাদা মাটি, যে মাটিতে অধিক পরিমাণ পলি কণা (%) ধারণ করে তাকে পলি মাটি, আর যে মাটিতে বালু কণার পরিমান বেশি (%) থাকে তাকে বেলে মাটি বলে। যদি কোন মাটি এই তিন তিনটি শ্রেণীর একটিরও প্রভাব বিস্তারকারী ভৌতিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন না করে (যেমন -৪০ বালু কণা, ২০% কাদা কণা ও ৪০% পলি কণা যুক্ত মাটি) তবে তাকে দো–আঁশ মাটি বলে। দো-আঁশ বালু, পলি ও কাদা কণার শতকরা সমান থাকে না। কিন্তু এটা বালু, পলি ও কাদা কণাসমূহের কাছাকাছি প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম প্রদর্শন করে।

পুকুরের তলানী থেকে পুষ্টিকারক পদার্থসমূহের অবমুক্তি কিংবা ধারণ ক্ষমতা নির্ভর করে পানির বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ধর্ম এবং তলদেশের কাদা ও পুকুরে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার কর্মকান্ড এর ওপর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভৌত রাসায়নিক প্রভাবকসমূহ যা তলদেশীয় মাটি ও পানির সঙ্গে আন্তঃক্রিয়া করে থাকে মূলত নির্ভর করে তলদেশীয় মাটির ধরন, তাপমাত্রা, গভীরতা পানির ঘনত্ব, দ্রবীভূত অক্সিজেন পিএইচ এবং মোট ক্ষারত্বের ওপর। তা ছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক আছে, সেগুলো হলো- আবহাওয়া, ঋতু, ওয়াটার শেড, পানি চোয়ানো ইত্যাদি।

cwbi U.vU. 6 ¨ =Þeb

জলাশয়ের পানির গুণাগুণকে দুই ভাগে ভাগ কর হয় -

১) ভৌত গুণাগুণ, ও
২) রাসায়নিক গুণাগুণ

ভৌত গুণাগুণ

আলো, তাপমাত্রা, ঘোলাত্ব, স্বচ্ছতা, ইত্যাদি ভৌত গুণাবলি।

রাসায়নিক গুণাগুণ

পানিতে বিভিন্ন গ্যাস দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে; যথা-অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, অম্ল□ত্ব, ক্ষারত্ব, পি-এইচ, ইত্যাদি পানির রাসায়নিক গুণাবলি।

নিচে পানির ভৌত এবং রাসায়নিক গুণাবলি এবং মাছচাষে এগুলোর প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

A‡jv

পুকুরের প্রকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের আলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। সবুজ উদ্ভিদকণা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সালোক সংশে- ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে প–ুকোজ, ফাইটোপ–াঙ্কটনের(মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য) খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং উৎপাদিত অক্সিজেন পানিতে দ্রবীভূত হয়ে জলজ জীবকুলের শ্বাসকার্যে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও অনেক জলজপ্রাণী শারীরকবৃত্তিক কার্যাবলী , বয়স, জীবন ইতিহাসের স্তর, ঋতু এবং অন্যান্য অবস্থার জন্য আলোর প্রতি সংবেদনশীল।

!vcgvc

মাছ হচ্ছে শীতল রক্ত বিশিষ্ট জলজপ্রাণী। সুতরাং এদের বৃদ্ধি , প্রজনন এবং অন্যান্য জৈবিক কার্যক্রম তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পানির তাপমাত্রার সাথে পুকুরের পুকুরের প্রথামিক উৎপাদন এবং মাছের দৈহিক বৃদ্ধি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে জলজপ্রাণীদের বিপাকক্রিয়া বেড়ে যায়। বিপাকক্রিয়া বাড়লে প্রানিকুলের ক্ষুধাও বেড়ে যায়। এ অবস্থায় পানির পরিবেশ ভাল থাকলে মাছ বা চিংড়ি বেশি খায় এবং বাড়েও বেশি। পানির তাপমাত্রা **১** সেঃ বৃদ্ধি পেলে মাছের বিপাকীয় হার ১০% বৃদ্ধি পায়।

তাপমাত্রা **১১** সেঃ নিচে হলে মাছ খুব কম খায় এবং ৯ সেঃ নিচে হলে মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেয়। রুই জাতীয় মাছচাষের জন্য ২৮-৩০ সেঃ তাপমাত্রা উত্তম।

ঘোলাত্ব

পানিতে ভাসমান অতি সূক্ষ্ম জৈবিক ও অজৈবিক দ্রব্যাদির পরিমাপকে ঘোলাত্ব বলে। মাছচাষের ক্ষেত্রে ঘোলত্বের খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সকল জলাশয়ে পানি কিছু না কিছু ঘোলা থাকে। তবে যখন খালি চোখে ঘোলাত্ব বোঝা যায়, তখনই আমরা তাকে ঘোলা পানি বলে থাকি। ঘোলা পানি সূর্যলোকে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি

করে, পানির প্রাথমিক উৎপাদন কমায়। অতিরিক্ত ঘোলা পানিতে মাছের শ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, এমনকি মাছ মারাও যেতে পারে। ঘোলা পানিতে মাছের দৃষ্টি হ্রাস পায় ফলে স্বাভাবিক চলাফেরায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

মাটির গঠন পরিবর্তন করে কাদা মাটির দ্বারা সৃষ্টি ঘোলাত্ব নিয়ন্ত্রন করা যায়। তা ছাড়া পুকুরের বাইরে পানি প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে,পাড়ে ঘাসের আবরণ সৃষ্টি করে এবং গোবর জাতীয় জৈব পদার্থ ব্যবহার করে ঘোলাত্ব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এ ছাড়া ও চুন,জীপসাম, রাসায়নিক সার ইত্যাদি ব্যবহার করেও ঘোলাত্ব দূর করা সম্ভব।

দ্রবীভূত অক্সিজেন

জলাশয়ে দ্রবীভূত গ্যাসসমূহের মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন মাছচাষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মাছের শ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্য গ্রহণ, পরিপাকসহ শরীরবৃত্তিক সকল কার্যক্রমে অক্সিজেনের প্রভাব অভাবনীয়। মাছ ও চিংড়ির জন্য অনুকূল দ্রবীভূত অক্সিজেন মাত্রা কমপক্ষে ৫ পিপিএম। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উৎস মূলত বায়ুমন্ডল এবং পানির ভিতরে সংঘটিত সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত অক্সিজেন তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, বায়ুচাপ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতার সঙ্গে পানিতে অক্সিজেন দ্রবণীয় সম্পর্ক রয়েছে। তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততা বেড়ে গেলে পানিতে অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা কমে যায়।

দ্রবীভূত অক্সিজেন হ্রাসের কারণসমূহ

১. জলজ জীব কর্তৃক শ্বসন
২. মৃত জৈব পশুর পচন
৩. মেঘলা আবহাওয়া
৪. ভূ- গর্ভস্থ পানির মিশ্রণ
৫. তাপমাত্রা বৃদ্ধি
৬. ঘোলাত্ব

অক্সিজেন স্বল্পতার লক্ষণ

১. মাছ পানির উপরে ভেসে আসে এবং খাবি খেতে থাকে
২. মাছ দ্রুত গতিতে সাঁতার কাটতে থাকে
৩. মৃত মাছের মুখ "হা" করা থাকে
৪. পুকুরের উপর বুদ বুদ জমা হয়
৫. পুকুরে হাঁটতে থাকলে তলা থেকে বুদ বুদ আকারে গ্যাস বের হতে থাকে।

প্রতিকার

১. পানিতে ঢেউ সৃষ্টি করে
২. প্রখর রৌদ্রজ্জ্বল সময়ে হররা টেনে তলদেশের বিষাক্ত গ্যাস বের করে
৩. এরেটর বা অন্য উপায়ে পানিতে প্রচুর ঢেউ সৃষ্টি করে বাতাস - পানির সংস্পর্শ বৃদ্ধি করে
৪. নতুন পানি যোগ করে।

কার্বনডাই অক্সাইড

মুক্ত কার্বনঅক্সাইড ব্যতীত উদ্ভিদ কর্তৃক সালোক- সংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদন সম্ভব নয়। কার্বনডাই অক্সাইড মুক্ত, অর্ধমুক্ত এবং বদ্ধ অবস্থায় পানিতে থাকে। জীবের শ্বসন পানিতে মুক্ত কার্বনডাই অক্সাইডের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তা ছাড়াও মৃত জৈব বস্তুর ব্যাক্টেরিয়ার পচন মুক্ত কার্বনডাই অক্সাইড সরবরাহ করে। পুকুরে যদি ব্যাক্টেরিয়ার পচনের দ্বারা প্রচুর পরিমাণ মুক্ত কার্বনডাই অক্সাইড তৈরি হয় তাহলে মাছের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মুক্ত কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস পায়। ২০ মি.গ্রা/লিটার (২০ পিপি এম) এর নিচে মুক্ত কার্বনডাই অক্সাইড মাছ ও চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর নয়। মাত্রাতিরিক্ত ফাইটোপ- প্লাঙ্কটনের ব–ুম এবং অত্যধিক জৈব বস্তুর পচনের ফলে মুক্ত কার্বনডাই অক্সাইডের বৃদ্ধি ঘটে। পুকুরে চুন প্রয়োগ করে অথবা মজুদ ঘনত্ব কমিয়ে মুক্ত কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস করা যায়।

এ্যামোনিয়া

মাছ ও চিংড়ির বর্জ্য, অভুক্ত খাদ্য, বিভিন্ন নাইট্রোজেনজাত পদার্থের উপর চিংড়ির পচন এবং হঠাৎ করে ফাইটোপ-াঙ্কটন মারা গিয়ে পচনের ফলে পুকুরে এ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হয়। পুকুরে এ্যামোনিয়া আয়োনাইজড (ঘঐ$_৪$) এবং আনআয়োনাইজ্ড(ঘঐ$_৩$) এই দুই রূপে থাকে। আনআয়োনাইজ্ড(ঘঐ$_৩$) এ্যামোনিয়া মাছ ও চিংড়ির জন্য খাব বিষাক্ত। আয়োনাইজ্ড (ঘঐ^১) এ্যামোনিয়া মাছ ও চিংড়ির জন্য কম ক্ষতিকর। তাপমাত্রা ওপিএইচ বেড়ে গেলে আনআয়োনাইজ্ড(ঘঐ$_৩$) এ্যামোনিয়া বেড়ে যায়। পুকুরে আনআয়োনাইজ্ড (ঘঐ$_৩$)এ্যামোনিয়ার মাত্রা০.০২৫মি.গ্রা/ লিটার এর বেশি হওয়া উচিত নয়। পুকুরে এ্যামোনিয়ার মাত্রা বেড়ে গেলে পানির রং তামাটে অথবা কালচে হয় এবং মাছ পাগলের মত ছোটাছুটি করে এবং চক্রাকারে দ্রুত সাঁতার কাটতে থাকে। পুকুরে ভাল পানি সরবরাহ করে এবং মজুদ ঘনত্ব , সার ও খাদ্য প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে এ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

পিএইচ

পানির পিএইচ বলতে পানির অম্ল– বা ক্ষার বা নিরপেক্ষ অবস্থা বোঝায়। যা ১ হতে ১৪ পর্যন্ত বিস্তৃত। পিএইচ ৭ দ্বারা নিরপেক্ষমাণ বোঝায় এবং ৭ এর নিচে এবং উপরে যথাক্রমে অম্লীয় এবং ক্ষারীয় অবস্থা নির্দেশ করে। মাছ চাষে পিএইচ এর মান জানা খুবই গুরূত্বপূর্ণ।

মাছ চাষের ক্ষেত্রে সাধারণত পানির পিএইচ ৬.৫-৮.৫ এর মধ্যে থাকা সবচেয়ে ভাল পিএইচ - এর মান ৪ এর নিচেএবং ১১ এর উপরে হলে অধিকাংশ মাছের তা মারাত্মক। পিএইচ-এর মান ১১ এর উপর হলে মাছের বৃদ্ধি এবং শারীরবৃত্তিক কর্মকান্ড হ্রাস পায়। পানির পিএইচ বেড়ে গেলে মাছের ফুলকা নষ্ট হয়, চোখের কর্নিয়া এবং লেন্স নষ্ট হয়, অসমোরেগুলেশন ক্ষমতা হ্রাস পায়, মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়। সাধারণত চুন প্রয়োগ করে পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

খরতা

পানিতে বিদ্যমান ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের মোট ঘনত্ব হচ্ছে খরতা, যা প্রকাশ করা হয় (ঈধঈঙ$_৩$) এর পরিমাণ দিয়ে। মোট খরতার পরিমাণ মোট ক্ষারত্বের সাথে সম্পর্কিত।

খর পানির শ্রেণীবিন্যাস

খরতার ক্ষারত্বের অনুযায়ী পানিকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

পানির ধরন	খরতার মাত্রা (পিপিএম)
মৃদু পানি	*০-৭৫*
হালকা খর পানি	*৭৫-১৫০*
খর পানি	*১৫০-৩০০*
অতি খর পানি	*<৩০০*

খরতার পরিমাণ নির্ভর করে এলাকাগত ভূ-তাত্ত্বিক গঠন ও বৈশিষ্ট্যের উপর। মাটির গুণাগুণ অনুযায়ী তা কম বেশি হয়। যেমনঃ

১. বেশিমাত্রায় খরতা ও ক্ষারত্ব অঞ্চল ঃ রাজশাহী বিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল (নাটোর, বগুড়া, নওগাঁ), খুলনা বিভাগের

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা) এবং ঢাকা বিভাগের অংশ বিশেষ (টঙ্গী, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ)।

১. মৃদু খর পানির অঞ্চল ঃ ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, পটুয়াখালী, অঞ্চলের কিছু কিছু অংশ।

মাছচাষে খরতার প্রভাব

মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য হালকা খর পানি সবচেয়ে ভাল। খরতার মান ২০ পিপিএম- এর কম অথবা বেশি হলে -

- পানির বাফারিং ক্ষমতা কমে যায়, ফলে পিএইচ দ্রুত ওঠানামা করে।
- পুকুরে সার দিলে তা কার্যকর হয় না

- ক্ষারত্ব বেড়ে গেলে (>৩০০ মি.গ্রাম/লিটার) পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন হ্রাস পায়। কারণ তখন সালোক সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘাটতি হয়।
- মাছ সহজেই অম্লতা ও অন্যান্য ধাতুর বিষক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়।

7vi!Y6 5i!v wb$Hf

- পুকুরে নিয়মিত চুন প্রয়োগ অথবা
- জিপসাম প্রয়োগ
- যদি সম্ভব হয় তবে নতুন পানি সরবরাহকরণ।

cE'ii B,cv%bk?j!v$!jvi Kv%vi cÖ

পুকুরের উৎপাদনশীলতা অধিকাংশ নির্ভর করে তলদেশের মাটির ওপর। যদি অনুর্বর কৃষি জমিতে পুকুর খনন করা ক্ষেত্রেই হয় এবং বাহির থেকে কোন প্রকার পুষ্টিকারক উপাদন সরবরাহ করা না হয় তবে সেই পুকুর হবে অনুৎপাদনশীল এবং খননকৃত পুকুরটির মাটি যদি উর্বর হয় তবে সেই পুকুর হবে উৎপাদনশীল। সর্বোত্তম পুকুরের তলদেশের মাটি হচ্ছে সেই মাটি যে মাটিতে জৈব পদার্থসমূহের পচন তাড়াতাড়ি হয়ে এবং মাটি ও পানির আন্তঃক্রিয়া সার্বক্ষণিক ভাবে চলে এবং তলদেশের মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকারক পদার্থসমূহ সহজেই পানিতে মুক্ত হয়। দো-আঁশ মাটিতে সার প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি কার্যকর। কাদা মাটি মাছ চাষের জন্য কম উপযোগী। কাদা মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি। তলদেশে কাদাযুক্ত পুকুর খুব বেশি উৎপাদনশীল। সার প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুরে অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টিকারক পদার্থসমূহের সরবরাহের মাধ্যমে পুকুরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এবং এতে করে মাছের অধিক উৎপাদনও নিশ্চিত হবে।

পুকুরের তলদেশীয় মাটির রাসায়নিক গুণাবলি অনেকংশে পার্শ্ববর্তী জমির মাটির সাথে পারস্পরিকভাবে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং পার্শ্ববর্তী জমি থেকে আসা পুষ্টি উপাদানের কারণে ঐ পুকুরের তলদেশের মাটিতে পুষ্টিকারক পদার্থের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

bvmŴi ¨ =>ebv

মাছের রেণু/ধানী-কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে যত্ন সহকারে লালন-পালন করে মজুদ পুকুরে ছাড়ার উপযোগী চারা পোনা উৎপন্ন করার পদ্ধতিকে নার্সারি ব্যবস্থাপনা বলা হয়।

bvmŴi ¨ =>ebvi Ui;!Y

সময়ের সাথে সাথে গ্রামে-গঞ্জে মাছ চাষের ব্যাপক সাড়া পড়েছে। এ ক্ষেত্রে মৎস্য চাষি/নার্সারি অপারেটরগণ উন্নততর পদ্ধতিতে আশানুরূপ ফল লাভের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যথাসময়ে সঠিক আকার ও কাঙ্ক্ষিত প্রজাতির সুস্থ, সবল উন্নত মানের পোনার দুস্প্রাপ্যতা মাছ চাষে ভালো ফল লাভের অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মানসম্পন্ন পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয়ভাবে নার্সারি স্থাপন অপরিহার্য।

আমাদের দেশে বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী হ্যাচারিতে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে রেণু উৎপাদিত হয়। এ ছাড়া নদ-নদী থেকেও প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত রেণু সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু যে পরিমাণ রেণু উৎপাদন বা সংগ্রহ করা হয় তা শতকরা ৩০ ভাগও বাঁচানো সম্ভব হয় না। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে রেণু পোনার লালন পালন সম্পর্কে চাষিদের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব। রেণু পোনা সরাসরি মজুদ পুকুরে ছাড়লে ব্যাপকভাবে এদের মৃত্যু ঘটে। কারণ তখন এরা অত্যন্ত ছোট ও দুর্বল থাকে। রেণুর চলাফেরার গতি কম থাকায় সহজেই রাক্ষুসে মাছ ও জলজ প্রাণীর শিকারে পরিণত হয়। এ ছাড়াও মজুদ পুকুরের অধিক গভীরতায় খাদ্য খুঁজে বের করতে পারে না পক্ষান্তরে গভীরতাজনিত পানির চাপে মারা যায়। তাই নার্সারি পুকুরে চারা পোনা তৈরি করে মজুদ পুকুরে ছাড়লে রেণু পোনার এই নাজুক পর্যায়কে সযত্নে পরিহার করা সম্ভব হয়। এ ছাড়াও নার্সারি পুকুর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছচাষে আরও কিছু বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন-

- সময়মত সঠিক আকারের পোনা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা
- চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রজাতির সুস্থ সবল পোনা প্রাপ্তি
- চাষের পুকুরে মজুদ ঘনত্বের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায়
- আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদের সুযোগ সৃষ্টি
- মজুদ পুকুর থেকে অধিক উৎপাদনের নিশ্চয়তা

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও নার্সারি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত লাভজনক। এ ক্ষেত্রে অল্প মূলধন বিনিয়োগ করে কম সময়ে তুলনামূলকভাবে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।

bvmŴi ¨ =>ebv cNw!

নার্সারি পুকুরে রেণু পোনা ছাড়ার পর দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির মাধ্যমে এরা সুস্থ সবল ধানী পোনায় পরিণত হতে পারে। কার্প জাতীয় মাছের চারা পোনা উৎপাদনে এক ধাপ ও দুই ধাপ উভয় পদ্ধতিই প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

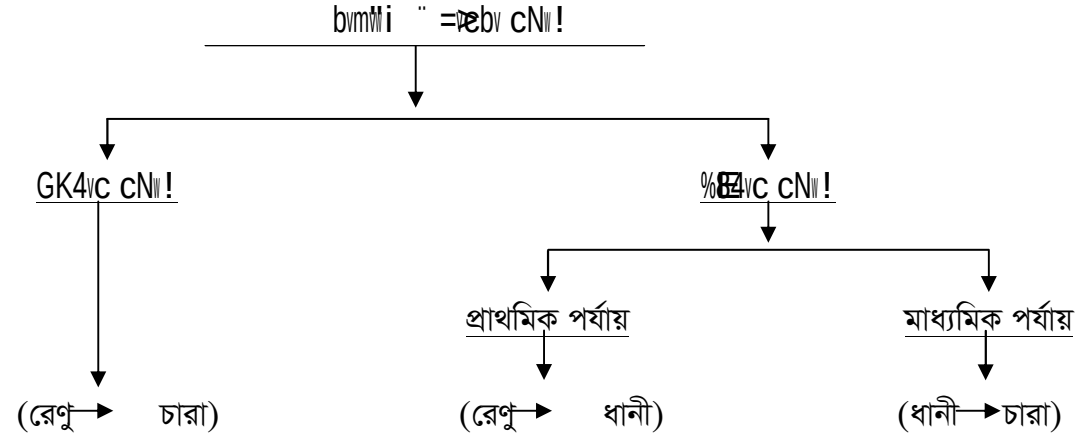

একধাপ পদ্ধতি

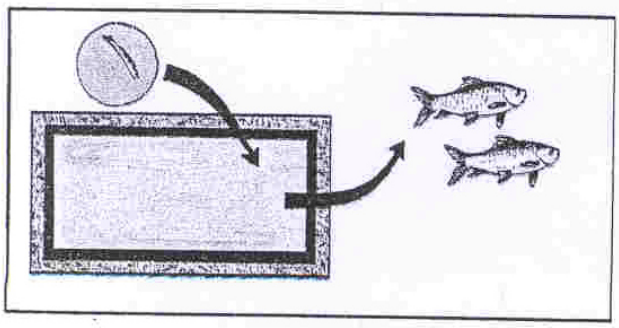

একই পুকুরে যখন রেণু পোনা লালন পালন করে ঐ পুকুরেই চাহিদামাফিক আকারের চারা পোনা তৈরি করা হয় তখন তাকে একধাপ পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতিতে রেণুর মজুদ ঘনত্ব কম থাকে বলে তুলনামূলক লাভও কম।

%8B4vc cNw!

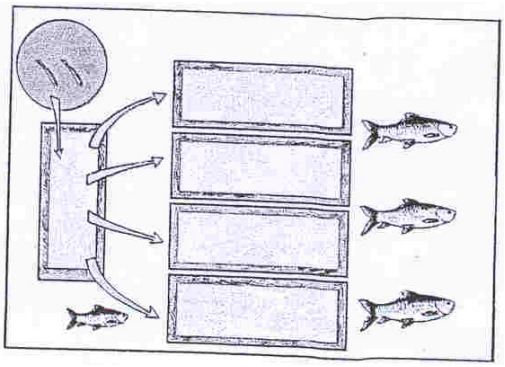

একটি পুকুরে বেশি পোনা মজুদ করে প্রথমে ধানী পর্যন্ত বড় করা হয়। তার পর ধানী পোনা অন্য পুকুরে স্থানান্তর করে চাহিদা মাফিক আকারের চারা পোনা তৈরি করা হয়। এ ধরনের নার্সারি ব্যবস্থাপনায় দু ধরনের পুকুর ব্যবহৃত হয়। আঁতুর পুকুর ও লালন পুকুর। আঁতুর পুকুরে প্রাথমিকভাবে রেণু মজুদ করে ১০-১৫ দিন লালন পালন করে অন্যপুকুরে স্থানান্তর করে সেখানেই ৩-৪ ইঞ্চি আকারের পোনা উৎপাদন করা হয়। যে সব চাষির একাধিক পুকুর আছে তারা এ পদ্ধতিতে সফলভাবে নার্সারি করে অধিক লাভবান হতে পারেন। নার্সারি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সাধারণত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে-

১. চাষির পোনা চাষের অভিজ্ঞতা
২. চাষির মালিকানাধীন পুকুরের সংখ্যা
৩. চাষির আর্থিক সামর্থ্য
৪. চাষকৃত পোনার চাহিদা

cÖgKvj?b mvi cÖ$M

পুকুরের পরিবেশে বিদ্যমান খাদ্য চক্রের প্রধান উপাদানগুলো হচেছ- ফাইটোপ, প্লাঙ্কটন ব্যাকটেরিয়া, জলজ উদ্ভিদ, প্রাণী-, প্লাঙ্কটন লদেশের ছোট পোকা-মাকড়, মাছ ইত্যাদি। এরা সকলেই উৎপাদন ও গ্রহণে সম্পৃক্ত তাই এদেরকে উৎপাদক ও গ্রাহক বলা হয়। এই উৎপাদক ও গ্রাহকসমূহ খাদ্য শিকলের তিনটি স্তরে অবস্থান করে । যেমন-

- প্রথম স্তর - প্রাথমিক উৎপাদক (উদ্ভিদ- প্লাঙ্কটন, ব্যাকটেরিয়া)
- দ্বিতীয় স্তর - প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রাহক (প্রাণী-প্লাঙ্কটন, তৃণভোজী মাছ)
- তৃতীয় স্তর- দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রাহক (প্রাণী-প্লাঙ্কটন ভোজী মাছ ও চিংড়ি, নি মাংসাশী প্রাণী)

খাদ্য শিকলের প্রথম স্তর শুরু হয় প্রাথমিক উৎপাদক; ফাইটো-প্লাঙ্কটন দিয়ে। এরা সূর্যশক্তিকে (ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে) অজৈব কার্বনের সাথে (পানির মুক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড বা বাই কার্বনেট বা কার্বনেট) সংযুক্ত করে প্রটোপ্লাজম, শ্বেতসার ও অক্সিজেন তৈরি করে।

খাদ্য শিকলের পরের স্তরে অবস্থানকারী প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রাহক মূলতঃ প্রাণী- প্লাঙ্কটন । প্রাণী- প্লাঙ্কটন খাদ্যের জন্য প্রাথমিক স্তরে উৎপাদিত উদ্ভিদ– প্লাঙ্কটন ও ব্যাকটোরিয়ার ওপর নির্ভরশীল। কিছু তৃণভোজী মাছও এ স্তরে অবস্থান করে উদ্ভিদ– খেয়ে থাকে। প্লাঙ্কটন একইভাবে তৃতীয় স্তরে অবস্থানকারী মাছ খাদ্যের জন্য উদ্ভিদ– প্লাঙ্কটন ও প্রাণী-প্লাঙ্কটন এর ওপর নির্ভরশীল থাকে যারা আবার চুড়ান্তভাবে বড় রাক্ষুসে মাছের শিকারে পরিণত হয়। অন্যদিকে পুকুরে বসবাসকারী প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ এবং মৃত্যুর পর উদ্ভিদ ও প্রাণী তলদেশে জমা হয়। তখন বিশেষ ধরনের কিছু ব্যাকটেরিয়া (হেটোরোট্রফিক) এবং ফাংগাস সমস্ত বস্তুর পচন ঘটিয়ে অজৈব পুষ্টি মুক্ত করে যা পুনরায় উদ্ভিদ– প্লাঙ্কটন উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। পচনকারী প্রাণীদের খায় প্রটোজোয়া, একজাতীয় কেঁচো এবং কায়রোনমিড মাছি। উলে-খিত উদ্ভিদ– প্লাঙ্কটন, প্রাণী-প্লাঙ্কটন, উদ্ভিদ, প্রটোজোয়া, কেঁচো এদের সকলকে একসাথে বলে পুকুরের জৈব উৎপাদন।

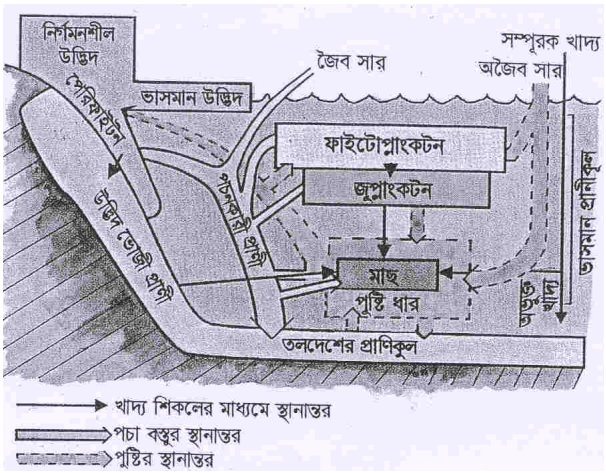

পুকুরের প্রতিবেশে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক উপাদানের

উপরোক্ত কার্যাবলী প্রাকৃতিকভাবেই পানিতে বসবাসকারী প্রাণিকুলের খাদ্যের ভারসাম্যতা বজায় রেখে স্বাভাবিক নিয়মে চলে। কিন্তু পুকুরে যখন পরিকল্পিতভাবে মাছ ও চিংড়ির পোনা চাষ করা হয় তখন অধিক পরিমাণে তৃতীয় স্ড়রের গ্রাহক নিচু স্তরের উৎপাদক ও গ্রাহককে ভক্ষণ করে। ফলে নিচু স্তরের উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের ঘাটতি দেখা দেয়। খাদ্য শিকলের নিচু স্তরের ভারসাম্যতা বজায় রাখার জন্য অর্থাৎ উদ্ভিদ– প্লাঙ্কটন উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করার জন্য পোনা মজুদের পর পুকুরে বাহির হতে নিয়মিত পুষ্টি সরবরাহের প্রয়োজন হয়।

mvi

সারের প্রকারভেদ

জৈব ও অজৈব দু ধরনের সারই পুকুরের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

জৈব সার

সরাসরি প্রাণি- প্লাঙ্কটন এবং ব্যকটেরিয়ার খাদ্য হিসাবে কাজ করে। পানিতে অজৈব পুষ্টি মুক্ত কওে উদ্ভিদ- প্লাঙ্কটন উৎপাদনে সাহায্য করে। পুকুওে জৈব সার হিসাবে কম্পোষ্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

অজৈব সার

প্রাথমিকভাবে উদ্ভিদ- প্লাঙ্কটন বিভিন্ন ধরনের অজৈব সার টিএসপি ব্রবহার করা হয়।

নিচের সারণীতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ- প্লাঙ্কটন ও প্রাণি- প্লাঙ্কটন উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সারে বিদ্যমান নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো-

cÉ	8Bwi$v h	wUGmwc h
নাইট্রোজেন	৪৩-৪৬	-
ফসফরাস	-	২০
পটাশিয়াম	-	-

mvi cÖ‡Mi gvcv

নার্সারি পুকুরে সার প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মজুদকৃত মাছ ও চিংড়ির পোনার জন্য প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদন। পর্যাপ্ত প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য একটি পুকুরে কী পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে তা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন-

১. মাটির অবস্থা
২. পানিতে শেওলার পুষ্টি চাহিদা
৩. পরিবেশের অবস্থা (তাপমাত্রা, মেঘ-বৃষ্টি)
৪. সারের গুণাগুণ
৫. সারের প্রাপ্যতা

এ ছাড়াও পুকুরের উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে চাষির অভিজ্ঞতাও সারের প্রয়োগ মাত্রা নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে একটি নার্সারি পুকুরে প্রস্তুতকালীন সারের সুপারিশকৃত মাত্রা নিম্নরূপ-

mvi	cÖ‡qvMgvcv \ k!vsk
K‡-3v: A1 v	J-(K †KwR
অজৈব সার ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম
টি এস পি	৫০-৭৫ গ্রাম

* টি এস পি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহার করলে ইউরিয়ার প্রয়োগ মাত্রা অর্ধেক হবে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নার্সারি পুকুর প্রস্তুতকালে উপরের টেবিলে সুপারিশকৃত সারের যে কোন একটি মাত্রা প্রয়োগ করতে হবে।

mvi cÖ‡qvM cNw!

MKbv cÖ^@ প্রয়োজনীয় সার সমানভাবে তলায় ছড়িয়ে দেয়ার পর চাষ দিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে শুকানোর পর তলায় একটি গর্ত খুড়লে যদি দেখা যায় মাটি হতে অতিরিক্ত লাল কষ বের হয় তবে চাষ না দেয়াই ভাল। পানি ভরাটের পর টিএসপি সার ১২-২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে ছিটানোর পূর্বে ইউরিয়ার সাথে একত্রে পানিতে গুলে সমস্ত পুকরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

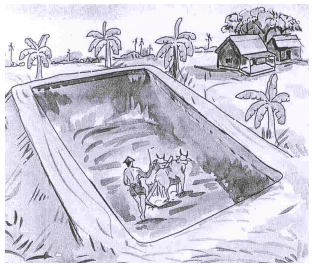

শুকনা পুকুরে সার

cwb 2w!"cÖ^@ টিএসপি একটি বালতি বা ড্রামের মধ্যে তিনগুণ পানিতে ১২-২ হবে। প্রয়োগের পূর্বে ঐসবের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে সমানভাবে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

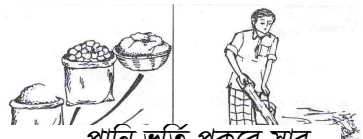

পানি ভর্তি পুকুরে সার

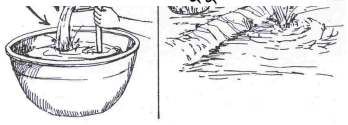

mvi cÖ‡qv‡Mi mg$

চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর এবং রেণু বা পিএল মজুদের ৮-১০ দিন আগে নার্সারি পুকুরে প্রস্তুতকালীন সার প্রয়োগ করতে হয়। দিনের যে কোন সময় সার

প্রয়োগ করা যায়। তবে, সাধারণত সূর্যালোক পড়ার পর সার প্রয়োগ করাই উত্তম। এ সময়টি সকাল থেকে দুপুরের মধ্যেই নির্ধারণ করা উচিত।

cÖvK…wZK 5v%¨ ci?7v

নার্সারি পুকুরে রেণু মজুদের পূর্বে তাদের উপযোগী খাদ্য তৈরি করে নিতে হবে। তাই মজুদের পূর্বে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা নার্সারি ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য অংশ। রেণু মজুদের আগেই নার্সারি পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করতে হয়। পুকুরের পানির রং বাদামি সবুজ বা হালকা বাদামি হলে বুঝতে হবে পুকুরের পানি রেণু ছাড়ার উপযোগী; কারণ এ সমস্ত রং এর পানিতে মাছ ও চিংড়ির পোনার প্রাকৃতিক খাদ্য প্রাণি- প্লাঙ্কটন প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকবে। আবার ঘন সবুজ তামাটে লাল বা স্বচ্ছ পানি পোনা চাষের জন্য ভাল নয়।

cÖvK…wZK 5v%¨ ci?7vi cNw!

নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাপ করা যেতে পারে।

() †mwKwA=i cNw!
2) MvgSv Mvm cNw!
+) Rv! cNw!

RjR †cvKv-gvKT %gb

পুকুরে সার প্রয়োগের পর পানিতে প্রাকৃতিক খাবার বৃদ্ধির সাথে সাথে রেণু পোনার ক্ষতি করে এমন অনেক ধরনের জলজ পোকা-মাকড় সৃষ্টি হয়। যেমনঃ হাঁস পোকা (ইধপশ ংরিসসবৎ), ড্রাগনফ্লাই, ওয়াটার ষ্ট্রোক, আংগুলি পোকা (ঈধঃবৎ ঢ়রষষবৎ), গোবর পোকা (ডধঃবৎ-নঁম), বড় আকৃতির প্রাণি-প্লাঙ্কটন যেমন- ক্লাডোসিরা, কপিপোডা (ঈুপষড়ঢ়ং, উধঢ়যহরধ, উরধঢ়ঃড়সধং) ইত্যাদি। নার্সারি পুকুরে এ সমস্ত পোকা-মাকড় থাকলে এরা-

- রেণুর খাদ্য উপযোগী কীট (প্রাণি-প্লাঙ্কটন) নষ্ট করে
- রেণু পোনা ধরে খায় বা পেট কেটে মেরে ফেলে।

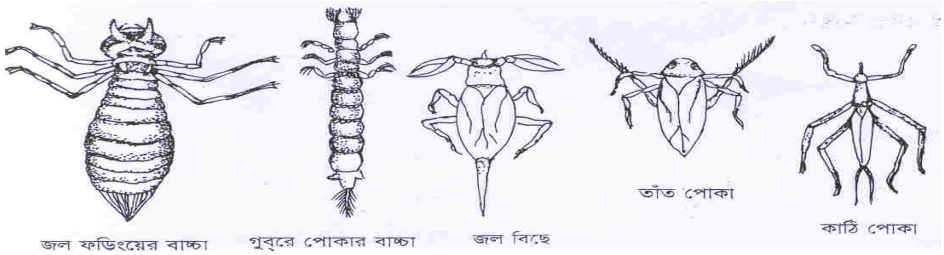

রেণু ছাড়ার পূর্বে নার্সারি পুকুর হতে এ সমস্ত জলজ পোকা-মাকড় ভালভাবে দমন করতে হয়।

RjR †cvKv-gvKT %gb cNw!

বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক বা ডিজেল/কেরোসিন প্রয়োগ করে নার্সারি পুকুরের জলজ পোকা-মাকড় ভালভাবে দমন করা যায়। নিচে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

ডিপট্যারেক্স ঃ ৬-১২ গ্রাম/শতাংশে/ফুট পানির গভীরতা
সুমিথিয়ন ঃ ২-৩ গ্রাম/শতাংশে/ফুট পানির গভীরতা
নোভান/নগস ঃ ২-৩ গ্রাম/শতাংশে/ফুট পানির গভীরতা
K?UbvkK ¨ Rvi w w4

প্রয়োজনীয় কীটনাশক একটি পাত্রের মধ্যে ১০ লি. পরিমাণ পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ডিপট্যারেক্স প্রয়োগের পর জলজ পোকা-মাকড় মারা যাওয়া শুরু করলে সমস্ত পোকা-মাকড় চটজাল দ্বারা তুলে

ফেলতে হবে। দুপুর রোদে ব্যবহার করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। কম তাপমাত্রা, মেঘ কিংবা বৃষ্টির সময় কীটনাশক ব্যবহার না করাই উচিত।

K?UbvkK ¨ Rv‡ii m!K!v

- কীটনাশক ব্যবহারের সময় ব্যবহারকারীকে নাক,মুখ,শরীর কাপড়ে ঢেকে নিয়ে চশমা পরে নিতে হবে।
- বাতাসের অনুকুলে স্প্রে করতে হবে।
- ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে ভাল করে গোসল করে নিতে হবে।
- সকল প্রকার কীটনাশক শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।
- কীটনাশকের প্যাকেট/বোতলের গায়ে লেখা সর্তকতা অনুসরণ করতে হবে।

wA‡Rj v †K‡iwmb

প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ১২৫ মিলি বা প্রতি ১০ শতাংশ জলাশয়ে ১ লি. প্রয়োগ করতে হবে। (গড়ে পানির গভীরতা ৩ ফুট)

- পুকুরের পানি যখন ঢেউহীন অবস্থায় থাকবে তখন ব্যবহার করতে হবে।
- বাতাস থাকায় যদি পুকুরের পানিতে ঢেউ থাকে তাহলে চটজাল টেনে জালের মধ্যে দিতে হবে। এ প্রক্রিয়া ২/৩ বার করলে ভাল হয়।
- সমস্ত মরা পোকা-মাকড় তুলে ফেলতে হবে।

Rvj †U‡b

ঘন নাইলনের জাল (ঘন পলিষ্টার নেট) বার বার টেনেও ক্ষতিকারক পোকামাকড় সহনশীল মাত্রায় কমিয়ে আনা যায়।

RjR †cvKv-gvKT %g‡bi mg$

উপরের উলি- খিত যে কোন একটি পদ্ধতি রেণু ছাড়ার ২৪ ঘণ্টা পূর্বে অনুসরণ করতে হবে।

Mj%v wPswTi bvmwi ¨ =v>ebv

চিংংড়ির পোনা (পি এল) কে যত্ন সহকারে নার্সারি পুকুরে ১ থেকে দেড় মাস লালন করে জুভিনাইল পর্যন্ড় তৈরি করাকে গলদা চিংড়ির নার্সারি ব্যবস্থাপনা বলা হয়। দূর দূরান্ড় থেকে চিংড়ির রেণু পোনা এনে সরাসরি খামারে মজুদ করলে পোনা তাপমাত্রা, পরিবহনজনিত পীড়নের ফলে মৃত্যুর হার বেশি হয়। পোনাকে নার্সারিতে প্রতিপালন করে কিশোর চিংড়িতে পরিণত করে বিক্রি করলে বেশি লাভবান হওয়া যায়।

bvmwi cK‡ii c$Rb?$!v

আধুনিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে নার্সারি পুকুরের গুরুত্ব অপরিসীম। মজুদ পুকুরে চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিত করতে নার্সারি পুকুর অত্যন্ড় সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

wPswT Bcv%‡b bvmwi cK‡ii Ui;!Y

- রাক্ষুসে/অবাঞ্ছিত প্রাণীর হাত থেকে চিংড়ির পেনাকে রক্ষা করা
- অধিক হারে পোনা মজুদ করা যায় এবং পোনার মৃত্যুহার কমানো যায়
- সুস্থ-সবল পোনা উৎপাদন করা যায়
- নার্সারি পুকুর আয়তনে ছোট হওয়ায় এর ব্যবস্থাপনা খরচ তুলনামূলকভাবে কম

- নার্সারি ব্যবস্থাপনা ভাল হলে চিংড়ির রোগ-বালাইয়ের সম্ভাবনা কম থাকে
- নার্সারি পুকুরে লালনকৃত পোনা খামারের মজুদ পুকুরে মজুদ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়

bvm©wi cÖKvii 4in

- কংক্রিটের তৈরি ট্যাংক
- পরিকল্পিত মাটির পুকুর
- মূল খামারের একাংশ ঘিরে আলাদা করা
- পেন ও খাঁচা দিয়ে ঘেরা পদ্ধতি এবং
- হাপা পদ্ধতি

cKz^wb ©Pb

- তুলনামূলকভাবে অগভীর (৩-৪ ফুট) পুকুর তলদেশ সমান ও কাদাবিহীন
- বাহির থেকে পানি প্রবেশের সুযোগ নেই এমন পুকুর (বন্যামুক্ত)
- দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি
- প্রয়োজনে বাহির থেকে পানি দেয়ার ব্যবস্থা থাকা উত্তম

cKz^ cÖËg

পুকুর প্রস্তুতির পর্যায়ক্রমিক ধাপ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

- ক্ষতিকারক আগাছা পরিষ্কার করতে হবে
- রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করতে হবে
- পুরাতন পানি নিষ্কাশন করে ৬-৭ দিন রোদে শুকিয়ে নিতে হবে
- কালো কাদা অপসারণ করতে হবে
- পুকুরের পাড় ভালো করে মেরামত করতে হবে
- যে কোন গর্ত বন্ধ করতে হবে
- পুকুরের তলদেশে হালকা চাষ দিতে হবে
- শতাংশ প্রতি ১.০ কেজি চুন দিতে হবে
- শতাংশ প্রতি ৫-৭ কেজি /সরিষার খৈল দিতে হবে
- ১ ফুট পর্যন্ত পানি ছেঁকে ঢুকাতে হবে
- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম/শতক, টি এস পি ৫০-৭৫ গ্রাম/শতক ৩ গুণ পানিতে গুলিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে
- শতাংশ প্রতি ২-৩টি নারকেলের পাতা/তালের পাতা আশ্রয়স্থল হিসেবে দিতে হবে। বাঁশের কঞ্চি ও পিভিসি পাইপও ব্যবহার করা যেতে পারে
- পোনা মজুদের আগে পানির গভীরতা ২.৫ থেকে ৩.০ ফুটে নিয়ে যেতে হবে

‡cvbv gRE

পরিবেশের তাপমাত্রা ও অক্সিজেনের তারতম্যের কারণে মজুদের পর পি.এল. ব্যাপক হারে মারা যেতে পারে। পুকুরে ছাড়ার আগে এদেরকে নতুন পরিবেশের সাথে সহনশীল করে নিলে এ মৃত্যু হার অনেকাংশে রোধ করা যায়। পরিবহন পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রায় সমতা আনয়নই হচ্ছে পরিবেশ সহনশীলকরণ। নতুন পরিবেশের সাথে সহনশীল করে নার্সারি পুকুরে রেণু ছাড়ার ধারাবাহিক কাজগুলো নিম্নরূপ-

- যে পাত্রেই পরিবহন করা হোক না কেন তা ১৫-২০ মিনিট পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে

- মুখ খোলার পর হাত দ্বারা পরিবহন পাত্র এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রার ব্যবধান পরীক্ষা করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দুই অবস্থায় পানির তাপমাত্রার ব্যবধান ১-২° সে এর বেশি না হয়।
- পরিবহন পাত্র ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান না হওয়া পর্যন্ত আস্তে আস্তে পাত্র ও পুকুরের পানি অদল বদল করে পানির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা সমতায় আনতে হবে।
- উভয় পানির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা সমান হলে পাত্রের মুখ কাত করে ধরে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে স্রোতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ অবস্থায় সুস্থ্য, সবল পি.এল. স্রোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে বাইরে চলে যাবে।

লক্ষ্যণীয় যে, পাড়ের কাছাকাছি অল্প গভীরতায় পি.এল. ছাড়তে হবে, ঘের বা পুকুরের মাঝখানে নয়।

†i.ÊvTvi mg$

নার্সারি পুকুরে রাত ৮-১০টার মধ্যে পি.এল. মজুদ করা সবচেয়ে উত্তম। এ সময় পি.এল. মজুদ সম্ভব না হলে সকাল অথবা বিকেলে মজুদ করতে হবে। এ ছাড়াও ঠান্ডা আবহাওয়ায় দিনের যে কোন সময়ে নার্সারি পুকরে পি.এল. ছাড়া যেতে পারে। তবে দুপুরের রোদ, মেঘলা দিন বা ভ্যাপসা আবহাওয়ায় (বিশেষত নিম্নচাপের দিনে) পুকুরে মাছের পি.এল. ছাড়া উচিত নয়।

bvm©vi cKÊ'i ïPsvTi wcGj i gRÊjb!Y

ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে শতাংশ প্রতি মজুদ ঘনত্ব ১০০০-১৫০০ টি এবং আংশিক পানি বদলসহ প্রাকৃতিক ও সুষম সম্পূরক খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা সংবলিত পুকুরে মজুদ ঘনত্ব শতাংশে ৪০০০-৬০০০ টি পর্যন্ত হতে পারে।

bvm©vi‡! m-3i-K 5v%¨ cÖ$vM

নার্সারি পুকুরে ভালো ফলন পেতে হলে পিলেট ফিড ব্যবহার করতে হবে।
প্রতি ১০০০ পি.এল. এর জন্য নিম্নবর্ণিত পরিমাণ খাবার প্রয়োজন হবে ঃ

সপ্তাহ	খাদ্যের পরিমাণ/প্রতিদিন
০-১	৬৩ গ্রাম
১-২	৮৮ গ্রাম
২-৩	১১২ গ্রাম
৩-৪	১৩৮ গ্রাম
৪-৫	১৬২ গ্রাম
৫-৬	১৮৮ গ্রাম
৬-৭	২১২ গ্রাম
৭-৮	৩২৭ গ্রাম

১ম দু সপ্তাহে স্টার্টার-১ এবং পরবর্তী সপ্তাহসমূহে স্টার্টার-২ ব্যবহার করতে হবে। প্রতি ২৪ ঘন্টায় ৬ ঘন্টা পরপর ৪ বার খাবার দিতে হবে। খাবার খাদ্যদানীতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ বিঘা আয়তনের একটি নার্সারি পুকুরে ২ থেকে ৩ টি খাদ্যদানী বা ট্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। খাদ্য প্রয়োগের পূর্বে প্রতিবার খাদ্যদানী পানির ওপরে তুলে তাতে অবশিষ্ট খাদ্য আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। উপরোক্ত নিয়মে নার্সারি ব্যবস্থাপনা করলে সর্বোচ্চ ৭০% জুভেনাইল পাওয়া যেতে পারে।

প্রদর্শনী, পুকুর রেকর্ড বই ব্যবহার

নিম্মে মাছচাষের লাভ-ক্ষতি নিরুপণের জন্য ব্যবহারযোগ্য একটি রেকর্ড বই এর নমুনা দেওয়া হলো :

b¨vkbvj GwMÖKvjPvivj †UK‡bvjwR ‡cÖv‡R± †dR 66 cÖKí (GbGwUwc-2)

g,m¨Pv# cÖkb? Kv/Ô‡gi Av6!v$ cÖkb? Pvw#i cÖ`k^ †iKA" 8

cÖ`Ei bvg@--

Pvw#i bvg@---

MÖvg@---

8Bwb$b@--------------------------------------- ---------------------

Bc‡Rjv@--

‡Rjv@---

(১)

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

mP?cc

OwgK bs	w #$	c& bs
১.	রেকর্ড বই পূরণ ও ব্যবহারের নিয়মাবলি	২
২.	প্রদর্শনী পরিচিতি	৩
৩.	ক) মজুদ-পূর্ব ব্যবস্থাপনা	৪
	খ) মজুদ ব্যবস্থাপনা	৫
	গ) মজুদ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা	৬
৪.	উৎপাদন আয়	১০
৫.	বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব	১১-১২
৬.	প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি লিখে রাখার জন্য খালি পাতা	১৩
৭.	পরিদর্শন ও মন্তব্য	১৪-১৫

‡iKA" 8 c‡. 6 ¨ Rv‡ii wb$gv wj

১. মৎস্য চাষের পুরোসময় এই বই মৎস্যচাষির নিকট থাকবে। তিনি সঠিক তথ্যাদি লিখে রাখবেন এবং বইটি সযত্নে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করবেন।

২. সঠিক উপায়ে তথ্যাদি লিখে রাখার ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং লিফ চাষিকে বুঝিয়ে দেবেন।

৩. বছর শেষে চাষি এই বই সংশ্লিষ্ট উপজেলা কার্যালয়ে কিছুদিনের জন্য জমা দেবেন। কার্যালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিখে রাখার পর বইটি চাষির কাছে ফেরত যাবে।

(২)
প্রদর্শনী পরিচিতি

- প্রযুক্তির নামঃ----------

- মালিকানা ঃ একক☐ , যৌথ☐ , লীজ☐

- আয়তন ঃ পাড়সহ ---------- শতক; (দৈর্ঘ ---------- ফুট X প্রস্থ ---------- ফুট)

  পাড়ছাড়া---------- শতক; (দৈর্ঘ ---------- ফুট X প্রস্থ ---------- ফুট)

  (৪৩৬ বর্গফুট= ১ শতক)

- পুকুরে কমপক্ষে ৩ ফুট পানি থাকে ঃ ---------- মাস

- পুকুর নির্বাচনের তারিখ ঃ----------

- কারিগরী প্রশিক্ষণের তারিখ ঃ----------

- পুকুর প্রস্তুতিমূলক কাজ আরম্ভের তারিখ ঃ----------

- পোনা মজুদ আরম্ভের তারিখ ঃ----------

- প্রথম আংশিক মৎস্য আহরণের তারিখ ঃ----------

- চূড়ান্ড় মৎস্য আহরণের তারিখ ঃ----------

(৩)
ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

ক. মজুদ-পূর্ব ব্যবস্থাপনা

ক্রমিক নং	***বিষয়***	***তারিখ***	***পরিমাণ (কেজি)***	***মোট খরচ (টাকা)***
১.	আগাছা দূরীকরণ			
২.	পানি নিস্কাশণ			
৩.	পাড় ও তলা মেরামত			
৪.	রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ			
	জাল টানা			
	রোটেনন প্রয়োগ			
	অন্যান্য			
৫.	চুন প্রয়োগ			
৬.	সার প্রয়োগ			
	ক) গোবর/কম্পোষ্ট			
	খ) টিএসপি			
	গ) ইউরিয়া			
	ঘ) পটাশ			
	‡gvU UvKv			

(C)

5) gRËE ¨ =þebv

‡cvbv O$k@

‡cvbvi cÖRw!	!wi5	ms5¨v	cÖwUi gj¨ (UvKv)	cwi R. ¨$kk (UvKv)	cwi R.mR †gvU 5iP (UvKv)
‡gvU					

*পুনঃমজুদের তথ্য এখানেই সন্নিবেশিত হবে।

** একই তারিখে একাধিক প্রজাতির পোনা ক্রয় করা হয়ে থাকলে পরিবহণ ব্যয় শুধু একটি পোনা প্রজাতির পাশে লিখতে হবে।

( )

গ. মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

১. খাদ্য ঃ

BcKi‡.i bvg	O‡$i !wi5	cwigv. (‡KwR)	cwi R.mR †gvU O$gj¨ (UvKv)

‡gvU			

* একই তারিখে একইবারে একাধিক খাদ্য উপকরণ ক্রয় করা হয়ে থাকলে পরিবহণ ব্যয় শুধু একটি খাদ্য উপকরণের পাশে লিখতে হবে। (F)

2) mvi (cE¶i cÖ †Mv ‡ii cwigv., wbR=lR‡j6 wj5‡! R‡)@

O‡$i !wi5	BcKi‡.i bvg	cwigv. (†KwR)	cwi R.mR †gvU O$gj¨ (UvKv)

‡gvU			

* একই তারিখে বিভিন্ন প্রকারের সার (গোবর, ইউরিয়া, টিএসপি, ইত্যাদি) ক্রয় করা হয়ে থাকলে পরিবহণ ব্যয় শুধু একটির পাশে লিখতে হবে।

(চাষের মেয়াদ শেষে)

মোট গোবর ঃ------------------------------- কেজি।

মোট ইউরিয়া ঃ------------------------------- কেজি।

মোট টি এস পিঃ------------------------------- কেজি।

(G)

+) Pb^@

O‡$i !wi5	cwigv. (†KwR)	cwi R.mR †gvU O$gj¨ (UvKv)
‡gvU		

C) w w 4 (Rvj Uvbv, kĝ, cwb wb=ivkb\c‡Ök, vRviRv!Ki. 5iP, 8!¨w%) @

!wi5	5i‡Pi w #$ (w i.mR)	¨$ (UvKv)
‡gvU		

(৮)

৫. নমুনায়ন ঃ

তারিখ	জালের প্রকার	প্রজাতি	নমুনাধীন মাছের সংখ্যা	নমুনাধীন মাছের ওজন (কেজি)	গড় ওজন (ক)	মজুদ সংখ্যা (খ)	মোট ওজন (ক)× (খ)

মজুদ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনার মোট খরচ ঃ

১. খাদ্য ---------- টাকা (৬ নং পৃষ্ঠার মোট)
২. সার ---------- টাকা (৭ নং পৃষ্ঠার মোট)
৩. চুন ---------- টাকা (৮ নং পৃষ্ঠার মোট)
৪. বিবিধ ---------- টাকা (৮ নং পৃষ্ঠার মোট)

মোট ঃ ----------টাকা।

(e)

ঘ. উৎপাদন আয়

তারিখ	আহরিত মাছ			বিক্রয়/ভোগ* 'ক' (কেজি)	বাজার দর টাকা/কেজি 'খ'	মোট মূল্য (টাকা) 'ক' × 'খ'
	প্রজাতি	সংখ্যা	মোট ওজন (কেজি)			
সর্বমোট						

* বিক্রয় বা ভোগ, যে কোন একটি বা উভয়ই এই কলামে লিখতে হবে। ভোগ বলতে নিজ পরিবারের খাওয়া অথবা বিনামূল্যে বিতরণ - উভয়ই বুঝাবে।

((K)

৬. আয় (বছর শেষের হিসাব)

৬.১ আহরিত মাছ (পৃষ্ঠা ১০ - এ দ্রষ্টব্য)

প্রজাতি	সংখ্যা	ওজন (কেজি)	মোট আয় (টাকা)
		সর্বমোট (টাকা)	

৬.২ পুকুরে অবশিষ্ট মাছ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

প্রজাতি	সংখ্যা	মোট ওজন (কেজি) 'ক'	সম্ভাব্য দর/কেজি (টাকা)	মোট আয় (টাকা) 'ক' × 'খ'
			সর্বমোট (টাকা)	

মোট টাকা (৬.১ + ৬.২) = ---------- টাকা + ----------

টাকা = ---------- টাকা। (১১)

P) ¨$

১. মজুদ-পূর্ব ব্যবস্থাপনা মোট ---------- টাকা।
(৪র্থ পৃষ্ঠা হতে)

২. মজুদ ব্যবস্থাপনা মোট ---------- টাকা।
(৫ম পৃষ্ঠা হতে)

৩. মজুদ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা মোট ---------- টাকা।
(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা হতে)

সর্বমোট ঃ ---------- টাকা।

S) jv2 (m -P)

ঙ = ---------- টাকা

চ = ---------- টাকা

লাভ = ---------- টাকা

cÖnK Ui;!Y~"!1¨w% wj‡5 iv5vi Rb¨ 5wj c&

((+)

পরিদর্শন ও মন্তব্য

পরিদর্শকের নাম ঃ ....

জীবিকা / পদবী ঃ .... সংস্থা ঃ ....

মন্তব্য ঃ ....

....

....

পরিদর্শকের নাম ঃ ....

জীবিকা / পদবী ঃ .... সংস্থা ঃ ....

মন্তব্য ঃ ....

....

....

পরিদর্শকের নাম ঃ ....

জীবিকা / পদবী ঃ .... সংস্থা ঃ ....

মন্ড়ব্য ঃ ....

....

....

পরিদর্শকের নাম ঃ ....

জীবিকা / পদবী ঃ .... সংস্থা ঃ ....

মন্তব্য ঃ ....

....

....

পরিদর্শকের নাম ঃ ....

জীবিকা / পদবী ঃ .... সংস্থা ঃ ....

মন্তব্য ঃ ....

....

....(১৪)..

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ

দুর্যোগ কৃষি, হলো প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট যে কোন ক্ষতিকর ঘটনা, যার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা আক্রান্ত এলাকার গবাদি পশু, পাখি ও মৎস্যসহ জনগোষ্ঠির জীবন, জীবিকা, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, সম্পদ, সম্পত্তি ও পরিবেশের এরুপ ক্ষতিসাধন করে অথবা এরুপ মাত্রায় ভোগান্তি সৃষ্টি করে, যা মোকাবেলায় ঐ জনগোষ্ঠির নিজস্ব সম্পদ, সামর্থ্য ও সক্ষমতা যথেষ্ট নয় এবং যা মোকাবেলার জন্য ত্রাণ ও বাহিরের যে কোন প্রকারের সহায়তা প্রয়োজন হয়।
ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী, টর্নেডো, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা, মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা, পাহাড়ি ঢল, বিস্ফোরণ, অগ্নিকান্ড, ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে দুর্যোগ সংঘটিত হতে পারে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অর্থ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী সাড়াদানের নিমিত্ত পদ্ধতিগত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যক্রম যার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ঃ

১. দুর্যোগের বিপদাপন্নতা, পরিধি, মাত্রা ও সময় নির্ধারণ
২. ব্যবস্থাপনাসহ সকল প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ, সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়ন
৩. আগাম সতর্কতা, হুসিয়ারি, বিপদ বা মহাবিপদ সংকেত প্রদান ও প্রচারের ব্যবস্থা এবং জানমাল নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর
৪. দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ও চাহিদা নিরুপণ, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন এবং অত্যাবশ্যকীয় উন্নয়ন কাযক্রম গ্রহণ
৫. আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা

দুর্যোগ সংঘটিত হলে স্বাভাবিক দায়িত্ব ছাড়াও মৎস্য অধিদপ্তরের বিভাগ, জেলা ও থানা এবং প্রকল্পসমূহের মাঠ পর্যায়ের অফিসারগণ নিম্নলিখিত কর্মসমূহ সম্পাদন করবেন:

স্বাভাবিক সময়ে

(ক) প্রতিবৎসর ঘূর্ণিঝড়/বন্যা মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকার মাছ ধরার নৌকাসমূহ, ট্রলার, ফিসিং, গিয়ার, মাছ ধরার কারিগরি যন্ত্রপাতি, মৎস্য পোনা ও মৎস্য পালন স্টক এবং মৎস্য আবাদসমূহের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসারগণ কৃষক এবং মৎস্য চাষিদের সজাগ করবেন।

(খ) অধীন অফিসসমূহ, মৎস্যচাষি এবং মৎস্যজীবী প্রতিনিধি প্রভৃতির সহিত অধিদপ্তরের গৃহীত নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করবেন।

(গ) দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে মাছ ধরার নৌকাসমূহ, ট্রলারসমূহ এবং ফিসিং গিয়ারসমূহ, অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার সাথে রাখার জন্য স্থায়ীভাবে নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করবেন।

(ঘ) ফিশিং লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে প্রতিটি ট্রলারের ওয়্যারলেস ও রেডিও সেট থাকার বিষয় নিশ্চিত করবেন।

(ঙ) উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য শিকাররত নৌকাসমূহ/ট্রলারসমূহে রেডিও রিসিভিং সেট ও ট্রলার/ নৌকায় উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য লাইফ জ্যাকেট রাখা নিশ্চিত করবেন।

(চ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসমূহের সরকারী ও বেসরকারী মৎস্য বিষয়ক সম্পদসমূহের নবায়নকৃত তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করবেন।

(ছ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসমূহের মৎস্যজীবী জনসংখ্যা, মৎস্যচাষি ও মৎস্য চাষ ক্ষেত্রসমূহের জরীপ ও উপাত্ত সংরক্ষণ করবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর পর তাহা হাল- নাগাদ করবেন।

(জ) সংশ্লিষ্ট এলাকার মাছ ধরার নৌকাসমূহ, ট্রলারসমূহ এবং সমুদ্রগামী জাহাজসমূহের মালিক/ চালকের ঠিকানাসহ তালিকা সংরক্ষণ করবেন।

(ঝ) সামুদ্রিক জলোচ্ছাসজনিত আঘাতের কারণে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করবার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার বাঁধ ও স্লুইসগেটসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(ঞ) স্লুইসগেটসমূহের যথাযথ পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।

(ট) প্রয়োজনের সময় সিপিপি -এর সহিত সমন্বয়ের মাধ্যমে পুকুরসমূহ হইতে লবণাক্ত পানি বাহির করে দেয়ার কাজে শক্তিচালিত নলকূপের প্রাপ্যতা সম্পর্কে স্থানীয় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন -এর কর্মকর্তাগণের সহিত সমন্বয় করবেন।

(ঠ) ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা প্রস্তুতি ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং পুনর্বাসন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

দুর্যোগ পর্যায়

(ক) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ এবং উদ্ধার অভিযানের জন্য সমুদ্রগামী জাহাজ রিকুইজিশন করার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করবেন (ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগকালীন সময়)।

(খ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করবেন এবং স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যোগযোগ কর্মকর্তা প্রেরণ করবেন।

পুনর্বাসন পর্যায়ে

(ক) সরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন মৎস্যসম্পদ খাতে ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য অবিলম্বে জরিপকার্যের ব্যবস্থা এবং এই খাতের জন্য অবিলম্বে দীর্ঘ মেয়াদী ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন ও তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করবেন।

(খ) স্থানীয় প্রশাসন এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সহিত সমন্বয়পূর্বক, সম্ভব হলে সরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শক্তিচালিত পাম্প আমদানি করবেন।

(গ) মৎস্য উন্নয়ন খাতে অবিলম্বে দীর্ঘ মেয়াদী ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন এবং কাজের অগ্রগতির বিষয়ে উচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করবেন।

(ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত পুকুর মৎস্য চাষিদের পুনর্বাসনের জন্য অনুপ্রাণিত এবং সহায়তা করবেন।

(ঙ) স্থানীয় প্রশাসনকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তা প্রদান করবেন।

(চ) মৎস্যজীবী/ মৎস্যচাষিদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করবেন।

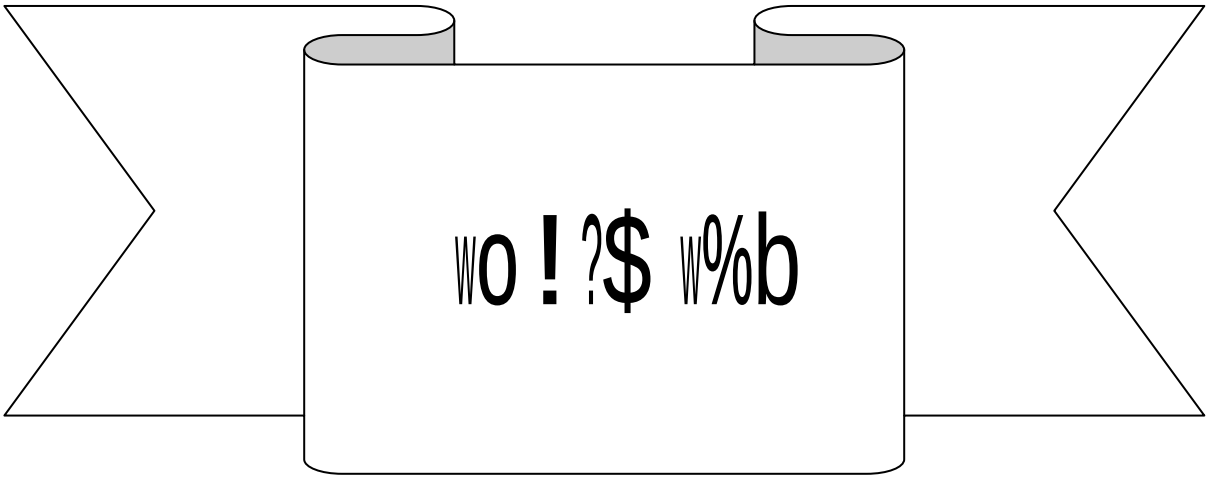

wo!?$ w%b

- ✧ মাছচাষে মজুদ-পূর্ব ব্যবস্থাপনা
- ✧ মাছচাষে মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা
- ✧ মাছচাষে মজুদ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা
- ✧ প্রকল্প কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
- ✧ বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ পরিচিতি ও তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, ও রুই- জাতীয় মাছের বাণিজ্যিক চাষ
- ✧ জেন্ডার সচেতনতা ও মাছচাষে নারী

gvSPv‡# gR¤E-c~" ¨ =¨ebv

cE^ ms=ivi

পুকুরের সার্বিক প্রস্তুতির জন্য মাছচাষের ক্ষেত্রে জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি নিম্নোক্ত কাজগুলোও করতে হবে-

!jv tgivg! 6 cvT cwipivi

- পুকুর/ঘেরের পাড় ভাঙ্গা থাকলে রাক্ষুসে ও বাজে মাছ প্রবেশ করে।
- তলা অসমান থাকলে জাল টানতে অসুবিধা হয়, চিংড়ি আহরণ করা যায় না, মাছ আহরণে বিশেষ অসুবিধা হয়।

পুকুর/ঘেরের তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ (কাঁদা/পেরী) থাকলে-

বিষাক্ত গ্যাস (বিশেষ করে চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ মাসে পুকুরে যখন পানি কম এবং সূর্যের তাপ বেশি থাকে তখন মাছ ও চিংড়ির ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়।

পুকুর/ঘেরের উপর বড় বড় গাছের ডালপালা ও পাড়ে জঙ্গল থাকলে-

- সূর্য্যের আলো কম পড়ে ফলে পুকুরের প্রাকৃতিক উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়, পাতা পচে গিয়ে পানিতে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে, রাক্ষুসে প্রাণী দ্বারা মাছ ও চিংড়ি আক্রান্ত হয়।

cNw! @

পুকুর/ঘের শুকানোর পর ভাঙ্গা পাড় ও অসমান তলা কায়িক শ্রমের মাধ্যমে মেরামত করতে হবে। পাড়ের জঙ্গল ও গাছের ডালপালা কেটে ফেলতে হবে এবং অতিরিক্ত কাদা প্রয়োজনমত অবশ্যই তুলে ফেলতে হবে।

SvKwb =vebv\tgivg!

পুকুর/ঘেরে পানি ঢুকানো ও বের করার ব্যবস্থা থাকলে উভয় পথে ছাঁকনির ব্যবস্থা করতে হবে। পানি ঢুকানোর পথের ছাঁকনিটি দু'স্তর বিশিষ্ট হতে হবে। এর প্রথমটির জালে ফাঁস হবে ১.৫ মি.মি. এবং দ্বিতীয়টির ফাঁস হবে ০.৫ মি.মি.। পানি বের হবার পথে একটি ছাঁকনি থাকলেই চলে। এর জালের ফাঁস হবে ১.৫ মিমি। ছাঁকনির বাইরে একটি নিরাপত্তা বানার ব্যবস্থা থাকলে মূল ছাঁকনির কার্যক্ষমতা বাড়বে।

পুরাতন ছাঁকনি পুকুর/ঘের প্রস্তুতিকালেই মেরামত করে নেয়া উচিত। রাসায়নিক বর্জ্যমুক্ত খালের কাছের পুকুরে/ ঘেরে ছাঁকনির ব্যবস্থা রাখা ভাল। প্রয়োজন অনুযায়ী পানি বদল করার সুবিধা কাজে লাগানো যায়।

b!b^ cE^5bb

‡Kvb =vb cE^5b‡bi c‡~'K? K?w #$w ‡ Pbv Ki‡ b

- পুকুর খনন অঞ্চল মাটির ধরন কেমন? বেলে মাটি, দো-আঁশ মাটি, বেলে দো-আঁশ মাটি নাকি লাল মাটি। এ বিষয়ে সঠিক বিবেচনা না করলে পুকুর খননের পর পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা, দ্রুত পাড় ভাঙ্গা, ইত্যাদি বিষয়ে সমস্যা হতে পারে।
- এলাকাটির বন্যা পরিস্থিতি কেমন
- পুকুরটির বর্তমান ও ভবিষ্যত মালিকানা বিষয়ক রূপরেখা কেমন
- কোন মাসে পুকুর খননের পরিকল্পনা করা হয়েছে
- পুকুর খননের এলাকাটি কি খুব নিচু/উঁচু/ঢালু অঞ্চল।

Ab¨vb¨ w #$

cvT

সাধারণভাবে একটি মাঝারি বা বড় পুকুরের পাড়ের উচ্চতা ২ মিটার ধরা হয়। এটি সংশ্লিষ্ট এলাকায় বন্যায় পানি বা অতিবৃষ্টিজনিত পানির লেভেল থেকে উপরে হবে।

KPi v vg"(Berm)

পুকুরের উপরিতলের ধার ও পাড়ের মধ্যবর্তী কিছু স্থান ফাঁকা রাখা হয়। ঐ জায়গাটুকুকে বকচর বলে। একটি বড় থেকে মাঝারি পুকুরে পাড় থেকে ভেতরের দিকে সাধারণভাবে ১.৫ মিটার জায়গা চারপাশে ছেড়ে দিয়ে পুকুর কাটা শুরু হয়।

qvj (Slope)

পুকুরের পাড় থেকে তলদেশের বরাবর নিচের দিকে যে কৌণিক রেখা থাকে তাকে ঢাল বলে। ধরা যাক, একটি পুকুরের ঢাল ২ঃ১, এটির অর্থ ভূমি হতে একটি পুকুরের জন্য ১ ফুট লম্বাভাবে মাটি কাটলে উক্ত ঢালের জন্য ২ ফুট পুকুরের ভেতরের দিকে সরে যেতে হবে। যা হবে পুকুরের মূল খাদের তলের নকশা। এমনিভাবে ৮ ফুট গভীর একটি পুকুরের জন্য পাড়ের পরিখা (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ) থেকে পুকুরের ভেতরের দিকে ১৬ ফুট দূরে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য থেকে ১৬ ফুট, প্রস্থ থেকে ১৬ ফুট দূরে আর ও একটি

পরিখা টেনে সেখান থেকে গভীরতা বরাবর মাটি কাটা শুরু করতে হবে। পরবর্তীতে পাড়-এর পরিখা রেখা থেকে মূল খাদ বরাবর আস্তে আস্তে যে ঢাল তৈরি হবে তা দাঁড়াবে ২ঃ১।
(২ঃ১ মানে লম্বাভাবে ১ হলে আনুভূমিকমান ২ হবে)।

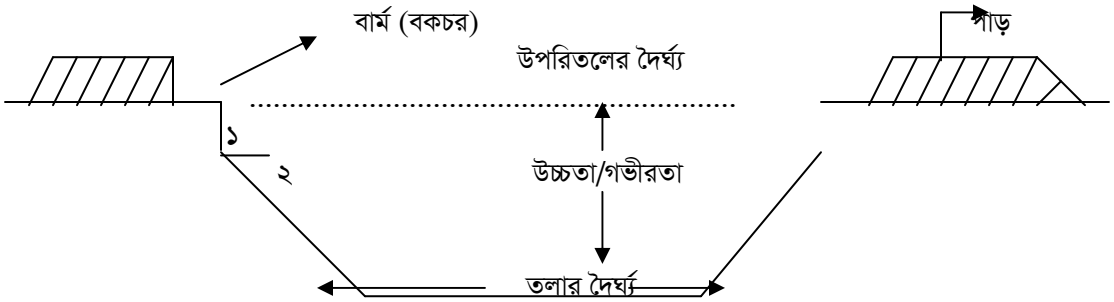

GKwU cÖ‡Kí¨i gvwU KvUvi wRmv
mgm¨v @ ২০০ ফুট দৈর্ঘ্য ১০৯ ফুট প্রস্থ এবং ৬ ফুট গভীর একটি পুকুরের ঢাল যদি ১ঃ১, বকচর ২ ফুট, পাড়ের চূড়া ৫ ফুট এবং পাড়ের উচ্চতা ৪ ফুট হয়, তবে পুকুরটি কাটতে কি পরিমাণ মাটি খনন করতে হবে, তার আনুমানিক খরচ কত হবে।

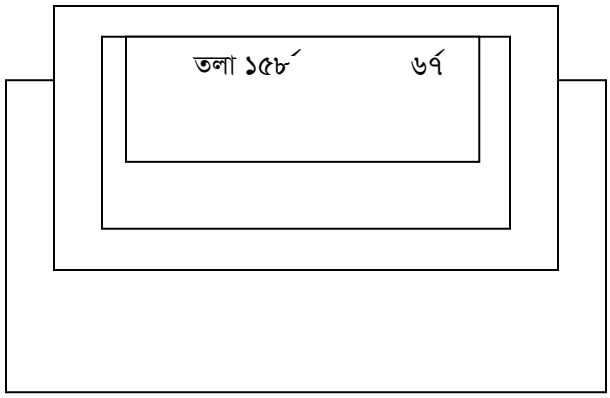

wRmv

জমির দৈর্ঘ্য	ঃ ২০০
জমির প্রস্থ	ঃ ১০৯
পুকুরের গভীরতা হবে	ঃ ৬ ফুট
বকচর হবে	ঃ ২ ফুট
ঢাল হবে	ঃ ১ঃ১
পাড়ের চূড়া	ঃ ৫ ফুট
পাড়ের উচ্চতা	ঃ ৪ ফুট

পাড় ও বকচর বাদে জমির দৈর্ঘ্য= ২০০´-(১৫´^২)=১৭০ ফুট
পাড় ও বকচর বাদে জমির প্রস্থ = ১০৯-(১৫´^ ২)=৭৯ফুট

তলার দৈর্ঘ্য= $\frac{১৭০' + ১৫৮'}{২}$ = ১৬৪ ফুট

গড় প্রস্থ= $\frac{৭৯' + ৬৭'}{২}$ = ৭৩ ফুট

মোট মাটির পরিমাণ =১৬৪ী৭৩ী৬ ঘনফুট
=৭১৮৩২ ঘনফুট
=৭১.৮৩২ হাজার ঘনফুট

(সাধারণত: ১০০০ ঘনফুট মাটিকে ১ হাজার মাটি বলা হয়)

প্রতি হাজার মাটি কাটতে খরচ = ৭০০ টাকা হলে
মাটি কাটতে মোট খরচ = ৭১.৮৩২ী৭০০
= ৫০,২৮২.৪০ টাকা

mvr¨Kvj?b KvR
(দলীয় অনুশীলনী)
পুকুর খননের হিসাব

এই অনুশীলনীর উদ্দেশ্য হচ্ছে অংশগ্রহণকারীগণ পুকুর খননে মাটির হিসাব, ব্যয় ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা পাবেন।

KvRi 4viv

অংশগ্রহণকারীদের তিনটি ছোট দলে বিভক্ত করতে হবে। ছোট দল আলোচনা করে পুকুর খনন সংক্রান্ড় প্রশ্নের উত্তর লিখবে। পরদিন বড় দলের উপস্থাপনা করার জন্য ফ্লিপচার্ট কাগজে লিখে উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

১। দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার ও প্রস্থ ৩০মিটার এবং ৫ মিটার গভীরতায় একটি পুকুর খনন করলে মাটির পরিমাণ কত হবে?
২। দৈর্ঘ্য ৬০ মিটার ও প্রস্থ ৪০মিটার এবং ৫ মিটার গভীরতায় একটি পুকুর খনন করলে মাটির পরিমাণ কত হবে?
৩। দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার ও প্রস্থ ৫০মিটার এবং ৫ মিটার গভীরতায় একটি পুকুর খনন করলে মাটির পরিমাণ কত হবে?

RjR AvMvSv wb$Hf

RjR AvMvSv

পুকুরের পানিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ, যেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছ/চিংড়ির উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদেরকে জলজ আগাছা বলে।

RjR AvMvSvi cÖKvi

পুকুরে সাধারণত: ৪ ধরনের জলজ আগাছা দেখা যায়ঃ

ক. ভাসমান

যে সমস্ত আগাছা পানির উপর ভেসে থাকে সেই সমস্ড় আগাছাকে ভাসমান জলজ আগাছা বলে। এগুলো দুই ধরনের হতে পারে ঃ

১. মূল মাটিতে এবং পাতা উপরে- এরা মাটি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে। যেমন- শাপলা, পানিফল, শুস্নি শাক ইত্যাদি।
২. মুক্তভাবে পানিতে ভাসমান -এরা পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে। যেমন- কচুরিপানা, টোপা পানা, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি।

<u>মুক্তভাবে ভাসমান আগাছা আবার চার ধরনের ঃ</u>

খ. লতানো

এই জাতীয় উদ্ভিদের শিকড় পুকুরের ঢালু পাড়ে পানির নিচে আটকানো থাকে এবং কান্ড ও পাতা পানিতে ছড়িয়ে থাকে। যেমন ঃ কলমিলতা, হেলেঞ্চা, কেশরদাম ইত্যাদি। এরা মাটি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে।

গ. নিমজ্জিত

এই ধরনের জলজ আগাছা পানির তলদেশে থাকে। এদের শিকড় মাটিতে থাকে এবং পাতা বা ডাল কখনই পানির উপরে আসে না। যেমন ঃ ঝাঁঝি, কাঁটা শেওলা, ইত্যাদি।

ঘ. নির্গমনশীল

এই ধরনের জলজ আগাছার কিছু অংশ পানির নিচে এবং কিছু অংশ পানির উপরে থাকে। যেমন ঃ বিষকাটালী, আড়াইল, ইত্যাদি।

RjR AvMvSv wb$Hf

জলজ উদ্ভিদকে আগাছা ও ক্ষতিকারক হিসাবে চিহ্নিত করলেও সব জলজ উদ্ভিদ ক্ষতিকারক নয়। কখনও কখনও এরা মাছচাষের জন্য উপকারেও আসে। আবার কুটিপানা, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি গ্রাসকার্প ও সরপুঁটির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কচুরিপানা ও অন্যান্য জলজ আগাছা কম্পোস্ট তৈরির কাজেও ব্যবহার করা যায়।

RjR AvMvSvi 7w!KviK w%K

সকল ধরণের জলজ আগাছা পানি ও মাটি থেকে পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ করে যা প্লাংক্টন বৃদ্ধি ও বংশ বিস্তারের জন্য প্রয়োজন। পুষ্টিকর পদার্থের অভাবে প্লাংক্টন এবং সেই সঙ্গে মাছের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। জলজ আগাছা পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা বৃষ্টি করে, ফলে সালোক সংশেষণ বাধাগ্রস্ত হয়।

RjR AvMvSv wb$Hf cNw!

১. কায়িক শ্রম পদ্ধতি

পুকুরের যাবতীয় আগাছাকে দা, কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে, হাত দিয়ে তুলে ফেলা যায়। কখনো কখনো পুকুরে দড়ি টেনে আগাছার শিকড় আলাদা করে পরে টেনে তোলা যায়।

২. জৈবিক পদ্ধতি

অনেক মাছ আছে, যারা জলজ আগাছা খেয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যেমন ঃ গ্রাস কার্প। তা ছাড়া মিরর কার্প ও কার্পিও মাছ ডুবন্ত উদ্ভিদের শিকড় তুলে ফেলে। ফলে তা হাত দিয়ে তুলে ফেলা যায়।

জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণে গ্রাস কার্পের ভূমিকা নিম্নরূপ ঃ

AvMvSv wb$Hf. MÖvmKv‡cŸ©i cÖ

আগাছা	আগাছার পরিমাণ (কেজি/ শতাংশ)	গ্রাসকার্পের সংখ্যা	মাছের ওজন গ্রাম	সময়কাল (দিন)
হাইড্রিলা	২৭৫	২.৬	১১৩	৪২
স্পাইরোডেলা	২৪	৫	৪৭৪	২০
লেমনা (ক্ষুদিপানা)	৮	৪	১১	১১

+) mvi cÖ$wM cNw!

পুকুরে ডুবন্ত উদ্ভিদ থাকলে বেশি পরিমাণে অজৈব সার প্রয়োগ করে তা দমন করা যায়। যদি পুকুরে ডুবন্ত উদ্ভিদ যেমন-নাজাজ থাকে তাহলে প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ২-৩ দিনের মধ্যে পুকুরে সবুজ স্তরের সৃষ্টি হয়। সূর্যালোক এতে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে নাজাজ নিয়ন্ত্রিত হয়।

C) ivmv$wbK cNw!

জলজ আগাছা দমনের জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়, সেগুলো হচ্ছে-

- সিমাজিন ৩ মি.গ্রাঃ/লিটার, চাড়া জাতীয় উদ্ভিদ ধ্বংসের জন্য।
- এনডোথল ১-৩ মি.গ্রাঃ/লিটার, কেশারীয় উদ্ভিদ ধ্বংসের জন্য।

sRjR AvMvSv wb$Hf. VRw K cNw!8 m ‡c7v 2vj G s ivmv$wbK cNw! m ‡c7v AbvKwt7!s
iv7 6 A wu! gvS %i?Ki.
v#‡4i cwigv. wb4'i.

একক অনুশীলনী

এ অনুশীলনীর উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণার্থীরা একটি পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধের পরিমাণ ও খরচের হিসেব করতে পারবেন।

একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট, প্রস্থ ৫০ ফুট এবং গড় গভীরতা ৩ ফুট। প্রতি শতাংশে ১ ফুট গভীরতার জন্য ৯.১০% শক্তি সম্পন্ন ১৮ গ্রাম হারে রোটেনন প্রয়োগ করলে উক্ত পুকুরে জন্য কী পরিমাণ রোটেনন লাগবে এবং খরচের পরিমাণ কত হবে?

কাজের ধারা

১. সরবরাহকৃত নোট খাতার রোটেননের ও খরচের হিসাব লিপিবদ্ধ করবেন।
২. অতঃপর তা বড় দলের সামনে উপস্থাপন করবেন/ প্রশিক্ষকের কাছে জমা দেবেন।

],,

iv7Ë 6 A wu! gvS %i÷Ki.

পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ লাভজনকভাবে মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। পুকুরে এসব মাছের উপস্থিতি নানাভাবে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদনকে ব্যাহত করে। ফলে ভাল ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও সন্তোষজনক উৎপাদন পাওয়া যায় না। তাই মাছ ও চিংড়ির পোনা মজুদের পূর্বে পুকুর হতে অবশ্যই সমস্ত রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা উচিত।

iv7Ë gvS

যে সমস্ত মাছ অন্য মাছ অথবা প্রাণীকে ধরে খায় তাদেরকে রাক্ষুসে মাছ বলে। এরা মাছ ও চিংড়ির পোনা খেয়ে ফেলে, ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন- শোল, বোয়াল, চিতল, ফলি, কাকিলা, বাইল্যা, টাকি/লাটি, চ্যাং, মাগুর, ইত্যাদি।

A wu! gvS

যে সমস্ত মাছ সরাসরি অন্য মাছকে খায় না কিন্তু মাছ ও চিংড়ির পোনার সাথে খাদ্য, বাসস্থান এবং অক্সিজেন নিয়ে প্রতিযোগিতা করে তাদেরকে অবাঞ্ছিত মাছ বলে। পুকুরে এ ধরনের মাছ থাকলে খাদ্যের অপচয় হয় এবং সার্বিক উৎপাদন অনেক কমে যায়।

iv7Ë 6 A wu! gvS %gb cNw!

মাছ ও চিংড়ির পোনা মজুদের পূর্বে পুকুর থেকে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ সরিয়ে ফেলতে হয়। কারণ-

- রাক্ষুসে মাছ সরাসরি পোনা খেয়ে ফেলে। যেমন- রাক্ষুসে মাছ ১ কেজি বড় হতে প্রায় ১০-১২ কেজি অন্য মাছ খায়।
- অবাঞ্ছিত মাছ পোনার খাদ্য নষ্ট করে যেমন- ১ কেজি অবাঞ্ছিত মাছ ১-১২ কেজি বড় মাছের খাদ্য ও অক্সিজেনের ভাগ বসায়।
- উভয় ধরনের মাছ পুকুরে রোগ-জীবাণুর বিস্তার ঘটায়।
- পোনা মাছ ও চিংড়ির পোনার সাথে বাসস্থান ও অক্সিজেন নিয়ে প্রতিযোগিতা করে।

iv7‡m 6 A wu! gvS %gb cNw!

পুকুর হতে দুইভাবে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যেতে পারে। যেমন-

১। পুকুর শুকিয়ে
২। ঔষধ প্রয়োগ করে

নিচে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করার বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো-

() cK^MKv‡bv

অবাঞ্ছিত পোকা -মাকড়, রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ মারার জন্য শুকানো সবচেয়ে ভাল। শ্যালো পাম্প ব্যবহার করে এ কাজটি করা যায়। শুকানোর পর কড়া রোদে পুকুর বেশ ক'দিন ফেলে রাখতে হবে যেন তলা দিয়ে হেঁটে গেলে পায়ের দাগ পড়ে কিন্তু পা দেবে না যায়। এ কাজটি ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে করলে খরচ ও সময় দুই-ই কম লাগে।

2) v#4 c$M

যে কোন কারণে পুকুর শুকনো সম্ভব না হলে ঔষধ প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যায়। পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণের জন্য রোটেনন, চা বীজের খৈল বা তামাকের গুঁড়া ব্যবহার করা যেতে পারে। এ বিষয়গুলোর বিশেষ কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। যেমন -

- রোটেনন, চা বীজের খৈল তামাকের গুঁড়া জৈব উৎস হতে উৎপন্ন
- এগুলোর দ্বারা মৃত মাছ খাওয়া যায়

- বিষয়গুলো জৈব সার হিসেবে কাজ করে
- এগুলো প্রয়োগে মাছ মারা যায়, চিংড়ি ও জলজ কীট মরে না
- এসব পদার্থ মাছের ফুলকায় আক্রমণ করে ফিলামেন্ট বন্ধ করে দেয়, ফলে দম বন্ধ হয়ে মাছ মারা যায়।

¨ w! v#4mg‡Ri w i., cÖ‡qvMgvcv 6 cNw!

‡iv‡Ubb cvBAvi

রোটেনন হচ্ছে ডেরিস গাছের মূল থেকে তৈরি এক ধরনের পাউডার, যা দেখতে হালকা বাদামী রঙের। রটেনন পাউডার প্রয়োগে মাছ মারা যায়, চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ কীট মারা যায় না।

¨ Rvi gvcv

বাজারে দু'ধরনের ক্ষমতা সম্পন্ন রোটেনন পাওয়া যায়। যেমন : ৯.১% এবং ৭% শক্তিসম্পন্ন রোটেনন। রোটেননের মাত্রা নির্ভর করে তার শক্তির ওপর। কড়া রোদের মধ্যে তুলনামূলক গরম পানিতে (<৩০সে.) রোটেননের মাত্রা কিছুটা কম লাগে। আবার তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা পানিতে (<২৫% সে.) রোটেননের মাত্রা বেশি লাগে।

বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন রোটেননের প্রতি শতাংশে প্রয়োগ মাত্রা

শক্তি (%)	গভীরতা=৩০ সে.মি. পানি
৯.১	২৫-৩০ গ্রাম
৭	৩০-৩৫ গ্রাম

¨ Rvi cNw!

প্রয়োজনীয় পরিমাণ পাউডার বালতিতে নিয়ে আস্তে আস্তে পানি মিশিয়ে প্রথমে 'কাঁই' তৈরি করতে হবে। প্রস্তুতকৃত কাঁই তিনভাগে ভাগ করে, এক ভাগ দ্বারা ছোট ছোট বল বানাতে হবে এবং বাকি দু'ভাগে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি মিশিয়ে তরলীকৃত করতে হবে। প্রথমে ছোট ছোট বলগুলো সমস্ত পুকুরের পানিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং পাশাপাশি তরলীকৃত অংশও পুকুরের পানিতে ছাড়াতে হবে। ২০-২৫ মিনিট পর আক্রান্ত সাথে সাথে জাল টেনে মাছ ধরতে হবে। পানি ওলট-পালট করে দিলে বিষের কার্যকারিতা বেড়ে যাবে।

!vgv‡Ki UXw

তামাকের গুঁড়া প্রয়োগে মাছ ও শামুক মারা যায় কিন্তু চিংড়ি মরে না। এটি প্রথমে বিষ,পরে সার হিসেবে কাজ করে। কাদার নিচে লুকানো প্রাণী এবং শামুকও মারা যায়।

মাত্রা ঃ শতাংশ প্রতি ০.৮-১.৬ কিলো/৩০ সে. মি.পানি।

¨ Rvi cNw!

একরাত পাত্রের মধ্যে পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর সূর্যালোকিত সময়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এটি অম্ল পানিতে কম গভীরতায় (২০-৩০ সে.মি) বেশি কার্যকর। বিষাক্ততার মেয়াদকাল ঃ প্রায় ৭-১০ দিন।

Pv ?‡Ri V5j

এটি চায়ের উপজাত, যার মধ্যে ১০-১৫% সেপোনিন থাকে। সেপোনিন মাছ মারার জন্য কার্যকর যা রক্তের লোহিত কণিকাকে জমাট করে ফেলে। চা বীজের খৈল প্রথমে বিষ, পরে সার হিসেবে কাজ করে। মধ্যম লবণাক্ততা (১৫ পিপিটি), উচ্চ তাপমাত্রা এবং অম্ল পানিতে এটি অধিকতর কার্যকর। চা বীজের খৈল চিংড়ির খোলস পাল্টাতে সহায়ক। চিংড়ি থাকা অবস্থায় অবাঞ্ছিত মাছ দূর করার জন্য এটি দিতে হলে চিংড়ির ওজন ২ গ্রামের বেশি হওয়া উচিত। উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষে এটি অধিকতর ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত।

cÖ‡qvM gvcv @ ১২ পিপিটি লবণাক্ততায় ১৪৫-১৫০ গ্রাম/৩০ সে.মি. পানি/শতাংশ

¨ Rvi cNw! @ প্রয়োজনীয় খৈল বালতির মধ্যে ৩-৪ গুণ পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে সূর্যালোকিত দিনে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। মাছ যখন মরতে শরু করে (উপরের দিকে ভেসে ওঠে), তখন বেড় জাল টেনে সমস্ত মাছ তুলে ফেলতে হবে।

বিষাক্ততার মেয়াদকাল ঃ ৩ দিন

cNw! wb vP‡b m!K"!v

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করার পদ্ধতি নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর নজর রাখা প্রয়োজন-

- পুকুরে বিষ ব্যবহার করা হলে ঔষধ প্রাপ্যতা, মূল্য, বিষাক্ততার মেয়াদকাল, পুকুরের সামাজিক ব্যবহার, জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রতিক্রিয়া -এ ৫ টি বিষয় খুব ভালভাবে বিচার করতে হবে।
- পুকুর শুকানোর পরামর্শ দেয়া হলে পানির বিকল্প উৎস (গভীর/অগভীর নলকূপ) বিবেচনায় রাখা উচিত।
- এমন কোন পরামর্শ দেয়া উচিত নয় যা চাষীকে আর্থিক, সামাজিক অথবা উৎপাদন সময়ের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

v#4 c$M m!K'!v

- ব্যবহারের পূর্বেই শুধু পাত্রের মুখ খুলতে হবে।
- বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।
- ব্যবহারের পূর্বে নাক-মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে নিতে হবে।
- যে কোন ধরনের ঔষধ বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে।
- প্রয়োগের পূর্বে খুব ভালভাবে পানির আয়তন ও বিষের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

,,

Pb c$#Mi Ui;!Y

‡SvU %j?$ AbkÉjb?

এ অনুশীলনীর উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণার্থীগণ উৎপাদন পুকুরে চুন প্রয়োগের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

কাজের ধারা

১. প্রশিক্ষণার্থীদের চারটি ছোট দলে ভাগ করা হবে।
২. দলের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করে পুকুরে চুন প্রয়োগের গুরুত্ব কি চিহ্নিত করবেন।
৩. চিহ্নিত বিষয়গুলো সরবরাহকৃত নিউজপ্রিন্টে লিপিবদ্ধ করবেন।
    দলের পক্ষ থেকে যে কোন একজন বড় দলের সামনে উপস্থাপন

সময় ১৫ মিনিট

,,,

Pb c$M

চুন হচ্ছে এমন একটি ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ অজৈব যৌগ যা এসিড মাধ্যমকে ক্ষারীয় বা নিরপেক্ষ করে।

Pb c$#Mi c$vRb?$!v

পুকুরে সাধারণত নিম্নোক্ত কারণে চুন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে-

- মাটি ও পানি (চঐ) মাছচাষের উপযোগী রাখা
- পানিতে ক্ষারত্বের পরিমাণ ২০ মি.গ্রাম/লি.- এর বেশি রাখতে সহায়তা করে।
- সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।
- পুকুর প্রস্তুতকালীন সময় বিশেষতঃ চুন প্রয়োগের মাধ্যমে পরজীবী ও রোগজীবাণু দূর করে।
- পুকুরের তলায় অবস্থিত জৈব পদার্থের পচন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পদার্থের পর্যাপ্ততা সৃষ্টিতে সহায়তা করে।
- চুনের ক্যালসিয়াম নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান।
- কাদায় আবদ্ধ ফসফরাস মুক্ত করে।

wcG8P

পিএইচ হচ্ছে কোন বস্তুর অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের মাত্রার পরিমাপক। পানির পিএইচ বলতে পানির অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের অবস্থা বোঝায় যা ১ হতে ১৪ পর্যন্ত বিস্তৃত। ৭ দ্বারা নিরপেক্ষ মান নির্দেশিত হয়। পিএইচ মান ৭ -এর কম হলে অম্লত্ব এবং ৭-এর

বেশি হলে ক্ষারত্ব নির্দেশ করে। মাছচাষে পিএইচ -এর মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাছচাষের ক্ষেত্রে পানির পিএইচ ৭-৮.৫ এর মধ্যে থাকা সবচেয়ে ভাল।

A-_?$ cwbi cÖ

- পিএইচ-এর মান ৫ এর নিচে থাকলে অভিস্রবণের মাধ্যমে মাছের দেহের রক্ত থেকে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড বেরিয়ে যায়। ফলে দুর্বল হয়ে মাছ মারা যায়। পানিতে ক্যালসিয়াম কম থাকলে এ ক্ষতি আরও মারাত্মক আকার ধরণ করে।
- শরীর থেকে প্রচুর বিজল (Mucous) বের হয় এবং ফুলকা আক্রান্ত হয়।
- মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, খাবার রুচি কমে যায়, আঘাতপ্রাপ্ত হলে ঘা সহজে সারে না।
- বড় মাছের চেয়ে রেণু ও পোনা দ্রুত আক্রান্ত হয়।

7vi?$ cwbi A2v

পিএইচ মান ১১-এর উপরে চলে গেলে মাছ দ্রুত মারা যায়। পিএইচ বেড়ে গেলে-

- ফুলকা নষ্ট হয়ে যায়
- চোখের লেন্স এবং কর্ণিয়া নষ্ট হয়ে যায়
- পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়
- অসমোরেগুলেশন ক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলে মাছ দুর্বল হয়ে মারা যায়।
- মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও খাবারের রুচি কমে যায়।
- প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

Pb cÖ‡qv‡Mi BcKwi!v

ক. হাইড্রোজেন ও হাইড্রোক্সিল আয়নের ভারসাম্য বজায় রাখতে অর্থাৎ পিএইচ নিরপেক্ষ রাখতে সহায়তা করে, যার ফলে প্লাংক্টন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সংরক্ষিত থাকে।

খ. প্লাংক্টন বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম ও গুরুত্বপূর্ণ আনয়নসমূহ প্রদান করে থাকে। ক্যালসিয়াম ও সিলিকা জীবের দৈহিক কাঠামো গঠনে সহায়তা করে থাকে।

গ. সালোকসংশ্লেষণের জন্য কার্বনের সরবরাহ বাড়ায়।

ঘ. প্লাংক্টন বৃদ্ধির জন্য কাদায় আবদ্ধ ফসফরাসকে মুক্ত করে দেয়।

ঙ. জৈব পদার্থের পচন ক্রিয়া ত্বরান্বিত করে, ফলে পানিতে পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

চ. পরজীবী ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে।

ছ. পানির ঘোলত্ব হ্রাস করে।

ছ. সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

P‡bi cÖKi‡2%

বাজারে বিভিন্ন ধরনের চুন পাওয়া যায়। নিম্নের সারণিতে তাদের প্রাপ্যতা ও রাসায়নিক গঠন উল্লেখ করা হলো-

P‡bi bvg	ivmvq\$wbK M<b	cÖvc!v
পোড়া চুন	CaO	বাজারে পাওয়া যায়
ডলোমাইট	$CaMg (CO_3)^2$	কোন কোন বাজারে পাওয়া যায়

K? cwigv. Pb cÖ‡qvM Ki‡! R‡ !v K?2v‡ †vxv /v‡ -

চুন প্রয়োগের জন্য প্রথমেই জানতে হবে পানিতে পিএইচ এবং ক্ষারত্বের পরিমাণ। গ্রামীণ পুকুর ব্যবস্থাপনায় পুকুরের উৎপাদনশীলতা অনেকাংশে নির্ভর করে পানির অম্লত্ব/ক্ষারত্বের ওপর।

cwbi 7vi!Ÿ wcG8P ci?7v cNw!

ক. হ্যাক কীট

খ. রাসায়নিক পদ্ধতি (টাইট্রেশন পদ্ধতি)

গ. পিএইচ পেপার

ঘ. সাবান দ্বারা -ক্ষারত্ব ৪০ মি.গ্রা./লি.-এর বেশি হলে পানি খর হয়। খর পানিতে সহজে সাবানের ফেনা হয় না। আবার পানির ক্ষারত্ব ৪০ মি.গ্রা./লি.-এর কম হলে সে পানিকে মিঠা পানি বলে। এ পানিতে সহজে প্রচুর পরিমাণে সাবানের ফেনা উঠে থাকে।

১৯৯৩ সালে মৎস্য অধিদপ্তর ও গ্রামীণ ব্যাংকের মৎস্য খামারসমূহে বাফরু পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় এক মাত্র উত্তর-পশ্চিম এলাকা ছাড়া সারা দেশের (খামারসমূহ) পুকুরের পানির ক্ষারত্ব ২০মি.গ্রা/লি.-এর উপরে। শুধু তাই নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটা ছিল ৭০ মি.গ্রা./লি. এর উপরে এবং পিএইচ-এর গড় মান ৭-৭.৫। যদিও চাষিদের পুকুরে এ জাতীয় কোন জরিপ পরিচালিত হয়নি, তবুও এসব তথ্যাদি থেকে একটি সাধারণ চিত্র পাওয়া যায়।

ciwgk"

১. এলাকায় অম্লত্বের সমস্যা না থাকলে পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে সুপারিশকৃত মাত্রার চেয়ে কম চুন প্রয়োগ করতে হবে। তবে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগের পরেও যদি পানিতে পর্যাপ্ত শেওলা তৈরি না হয় তাহলে অতিরিক্ত চুন প্রয়োগের পরামর্শ দিতে হবে।
২. যদি অম্লত্বমাটির সমস্যা থাকে তাহলে উত্তম পরামর্শ হলো মাটির পিএইচ পরীক্ষা করতে বলা তা যদি সম্ভব না হয় তবে সুপারিশ মাত্রার সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রয়োগ করতে বলা। এ ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ বিবেচনায় রাখতে হবে।
৩. কসযুক্ত কালচে মাটি বা এসিড সালফেট যুক্ত মাটির ক্ষেত্রে চুনের স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে ২-৩ গুণ বেশি চুন প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পাথুরে চুন বেশি কার্যকর।

Aw2L!v †1‡K 4vi.v †b$v

একজন অভিজ্ঞ চাষি জমিতে পা দিয়েই বলতে পারেন তার জমির জন্য কি প্রয়োজন। চাষির এ অভিজ্ঞতা তার দীর্ঘদিনের কাজের ফসল। একইভাবে কোন এলাকার পুকুরগুলোতে চুনের মাত্রা জানার জন্য প্রথমে একটি পুকুরের ইতিহাস জেনে তাতে চুন প্রয়োগ করার পর বেশ কিছু দিন পুকুরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পর্যবেক্ষণকৃত অবস্থার ওপর নির্ভর করেই সে এলাকার পুকুরগুলোর জন্য চুনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। আবার কোন এলাকার মাটির পিএইচ পরীক্ষা করে চুনের মাত্রা নির্ধারণ করা যায়। এ মাত্রা সে এলাকার ৫ কিলোমিটারের মাঝে মোটামুটি একই রকম হবে।

PEcÖ‡Mi gvcv

মাটির পিএইচ ও চুনের ধরনের ওপর নির্ভর করেই কেবল চুনের মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। যখন শুধুমাত্র পিএইচকে বিবেচনা করে চুনের মাত্রা নির্ধারণ করা হয় সে ক্ষেত্রে পোড়া চুন পাথুরে চুনের চেয়ে দ্বিগুণ ও কলি চুন থেকে দেড়গুণ শক্তিশালী ধরে মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। নিম্নের সারণিতে শতাংশ প্রতি চুনের মাত্রার একটি নিদের্শনা দেয়া হলো-

wcG8P	†cvTv Pb^
৩-৫	৬ কেজি
৫-৬ (এঁটেল মাটি)	৪ কেজি
৬-৭ (দো-আঁশ মাটি)	১-২ কেজি

মাটির ধরন অনুযায়ী পোড়া চুনের প্রতি শতাংশ প্রয়োগ মাত্রা (চাষিদের জন্য) উল্লেখ করা হলো-

gwUi 4ib	b!b^ cÖ^	cÖ!b cÖ^
দো-আঁশ	১ কেজি	২ কেজি
এঁটেল	৪ কেজি	৬ কেজি

cÖM cNw!

শুকনা ও ভেজা মাটির পুকুরে প্রস্তুতকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় চুন গুঁড়া করে ঢালসহ সমস্ত জায়গায় সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। পানি ভর্তি পুকুরে প্রয়োজনীয় চুন মাটির চাড়ি, টিনের বালতি বা ড্রামে গুলিয়ে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

Pb^ cÖ‡Mi mg$

- শুকনা পুকুরে চাষ দেয়ার দিন
- পুকুরে পানি সেচের পর পরই ভেজা মাটিতে
- পানি ভর্তি পুকুরে সার প্রয়োগের ৬-৭ দিন আগে।

Pb^ cÖ‡M m!K'!v

১. চুন গুলানো ও ছিটানোর সময় নাক-মুখ গামছা দিয়ে বাঁধতে হবে
২. কোন অবস্থাতেই প্লাস্টিকের পাত্রে চুন গোলানো যাবে না
৩. চুনের পাত্রে পানি ঢালার আগে পাত্রের মুখ অবশ্যই চট/বস্তা দিয়ে ঢাকতে হবে।

৪. পাত্রে চুন রেখে তার পর পানি ঢালতে হবে
৫. বাতাসের অনুকূলে চুন ছিটাতে হবে।
৬. চোখে চুন লাগলে সাথে সাথে তা পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

,,

cÖyKvj?b mvi cÖ$vM
WR 6 AWR mv‡ii mE4v- AmE4v

‡SvU %j?$ AbE‡jb?

এ অনুশীলনীর উদ্দেশ্য হলো অংশগ্রহণকারীগণ পুকুরে জৈব ও অজৈব সার ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধাসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

Kv‡Ri 4viv

() অংশগ্রহণকারীদের চারটি ছোট দলে ভাগ করা হবে।
2) দলীয় সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পুকুরে জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগের সুবিধা-অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করবেন।
+) চিহ্নিত বিষয়গুলো সরবরাহকৃত নিউজপ্রিন্টে সুবিধাসমূহ লিখে দলের পক্ষ থেকে একজন এবং অসুবিধাসমূহ লিখে দলের পক্ষ থেকে অন্য একজন বড় দলের সামনে উপস্থাপন করবেন।

১৫ মিনিট

,,

mvi cÖ$vM

জলজ পরিবেশে বিদ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ খাদ্যের জন্য পারস্পরিকভাবে একে অন্যের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। যার ফলে পুকুরে সব সময়ই অজৈব পুষ্টি (নাইট্রোজেন, ফরফরাস, পটাশিয়াম, ইত্যাদি) পদার্থের একটি গতিশীল চক্রায়ন ঘটতে থাকে। পুষ্টি পদার্থের এই গতিশীল চক্রায়নই খাদ্য শিকল নামে অভিহিত। যেহেতু এই চক্রের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হচ্ছে মৃত প্রাণী বা অজৈব পদার্থের পচনের মাধ্যমে অজৈব পুষ্টি মুক্তকরণ তাই অনেকে এ চক্রকে স্যাপরোফাইটিক খাদ্য শিকলও বলে থাকেন।

পুকুরের পরিবেশে বিদ্যমান খাদ্য চক্রের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে উদ্ভিদকণা, ব্যাক্টেরিয়া, জলজ উদ্ভিদ, প্রাণিকণা, তলদেশের ছোট পোকা-মাকড়, মাছ ইত্যাদি। এরা সকলেই উৎপাদন ও গ্রহণে সম্পৃক্ত তাই এদেরকে উৎপাদক ও গ্রাহক বলা হয়। এই উৎপাদক ও গ্রাহকসমূহ খাদ্য শিকলের চারটি স্তরে অবস্থান করে। যেমন-

প্রথম -স্তরে প্রাথমিক উৎপাদক (উদ্ভিদকণা, ব্যাক্টেরিয়া)
দ্বিতীয় স্তরে - প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রাহক (প্রাণিকণা, তৃণভোজী মাছ)
তৃতীয়স্তরে - দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রাহক (প্রাণিকণা ভোজী মাছ ও চিংড়ি, ক্ষুদ্র মাংসাশী প্রাণী)
চতুর্থ স্তরে - বড় মাংসাশী প্রাণী।

খাদ্য শিকলের প্রথম স্তর শুরু হয় প্রাথমিক উৎপাদন উদ্ভিদকণা দিয়ে। এরা সূর্যশক্তির উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের দ্বারা অজৈব কার্বনের সাথে পানির মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড বা বাই-কার্বনেট সংযুক্ত করে প্রটোপ্লাজম, শ্বেতসার ও অক্সিজেন তৈরি করে। খাদ্য শিকলের পরের স্তর অবস্থানকারী প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রাহক মূলত প্রাণিকণা। প্রাণিকণা তাদের খাদ্যের জন্য প্রাথমিক স্তরে উৎপাদিত উদ্ভিদ প্লাংক্টন ও ব্যাক্টেরিয়ার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু তৃণভোজী মাছ ও এ স্তরে অবস্থান করে। উদ্ভিদকণা খেয়ে থাকে। একইভাবে তৃতীয় স্তরে অবস্থানকারী মাছ তাহাদের খাদ্যের জন্য উদ্ভিদকণা ও প্রাণিকণার ওপর নির্ভরশীল তাকে, যারা

আবার চূড়ান্ত ভাবে বড় রাক্ষুসে মাছ দ্বারা ভক্ষিত হয়। অন্যদিকে পুকুরে বসবাসকারী প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ এবং মৃত্যুর পর উদ্ভিদ ও প্রাণী তলদেশে জমা হয়। তখন বিশেষ ধরনের কিছু ব্যাক্টেরিয়া (হেটারোট্রফিক) এবং ফাঙ্গাস সমস্ত বস্তুর পচন ঘটিয়ে অজৈব পুষ্টি মুক্ত করে যা পুনরায় উদ্ভিদকণা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত উদ্ভিদকণা, প্রাণিকণা, উদ্ভিদ, প্রটোজোয়া ও কেঁচো এদের সকলকে একসাথে পুকুরের জৈব উৎপাদন বলে ।

উপর্যুক্ত কার্যাবলী প্রাকৃতিকভাবেই পানিতে বসবাসকারী প্রাণিকুলের খাদ্যের ভারসাম্যতা রেখে স্বাভাবিক নিয়মে চলে। কিন্তু পুকুরে যখন পরিকল্পিতভাবে মাছচাষ করা হয় তখন অধিক পরিমাণে তৃতীয় স্তরেরগ্রাহক নিচু (প্রথম ও দ্বিতীয়) স্তরের উৎপাদক ও গ্রাহককে ভক্ষণ করে। ফলে নিচু স্তরের উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের ঘাটতি দেখা দেয়। খাদ্য শিকলের নিচু স্তরের ভারসাম্যতা বজায় রাখার জন্য অর্থাৎ উদ্ভিদকণার উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করার জন্য পোনা মজুদের পর পুকুরে বাহির হতে নিয়মিত পুষ্টি সরবরাহের প্রয়োজন হয়।

mvi cÖ‡qv‡Mi B‡yk¨@

মাছের প্রাকৃতিক খাবার হলো প্রধানত উদ্ভিদকণা ও প্রাণিকণা। প্রাণিকণার উৎপাদন নির্ভর করে উদ্ভিদকণার প্রাচুর্যতার ওপর। আর উদ্ভিদকণা তাদের বাঁচার জন্য পানিতে দ্রবীভূত পুষ্টির ওপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ ও প্রাণিকণা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও কার্বন। এরা প্রোটোপ্লাজমের মূল উপাদান। প্রোটিন এবং নিউক্লিয়াস এসিড সংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাণ সৃষ্টিতে এদের প্রয়োজন। প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন উৎস হতে এই পুষ্টি উপাদানসমূহ পানিতে দ্রবীভূত হয়। তবে এদের মধ্যে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস প্রাকৃতিকভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানিতে দ্রবীভূত হয় না ফলে যখন পুকুরে মাছের পোনা মজুদ হয় তখন অধিক পরিমাণে উদ্ভিদকণা ও প্রাণীকণা উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। সে সময় পানিতে দ্রবীভূত নাইট্রোজেন ও ফরফরাসের ঘাটতি দেখা দেয়। পুষ্টি পদার্থের এই ঘাটতি পূরণের জন্য পুকুরে বিশেষভাবে নাইট্রোজেনের উৎস হিসেবে ইউরিয়া এবং ফরফরাসের উৎস হিসেবে টিএসপি সার প্রয়োগ করা হয়। এক কথায় বলা যায় মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পুকুরের পানিতে সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আর প্রাকৃতিক খাদ্য অর্থাৎ উদ্ভিদকণার প্রাচুর্যতার ওপরই পানিতে মাছের শ্বাসকার্যের জন্য অতি প্রয়োজনীয় দ্রবীভূত অক্সিজেন এর প্রাপ্যতা নির্ভরশীল।

mv‡ii cÖKvi‡2%

সার দু'রকমের হয়ে থাকে- জৈব ও অজৈব।

() WR mvi

সরাসরি প্রাণিকণা এবং ব্যাক্টেরিয়ার খাদ্য হিসেবে জৈব সার কাজ করে এবং পানিতে অজৈব পুষ্টি মুক্ত করে উদ্ভিদকণা উৎপাদনে সাহায্য করে। পুকুরে জৈব সার হিসেবে গোবর অথবা কম্পোস্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

2) AWR mvi

এটি প্রাথমিকভাবে উদ্ভিদকণা উৎপাদনে সহায়ক বা প্রাণিকণা বিস্তারকে ত্বরান্বিত করে। অজৈব সার হিসাবে প্রধানত ইউরিয়া ও টিএসপি ব্যবহার করা হয়।

নিচের সারণিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদকণা ও প্রাণিকণা উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সারে বিদ্যমান নাইট্রোজেন, ফরফরাস ও পটাশিয়ামের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো-

পুষ্টি		ইউরিয়া %	টিএসপি %	কম্পোস্ট %
নাইট্রোজেন		৪৩-৪৬	-	২-৩
ফসফরাস		-	৪০-৪৫	১-২
পটাশিয়াম		-	-	৩-৪

WR 6 AWR mvi ¨ Rv‡ii mwE4v-AmwE4v

জৈব সারের সুবিধা

- সরাসরি প্রাণিকণা ও ব্যাক্টেরিয়ার খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়
- বেলে ও দো-আঁশ মাটির পুকুরে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে

- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, তলদেশে মাছের খাদ্য (বিভিন্ন পোকা-মাকড়, লার্ভা ইত্যাদি) জন্মে
- স্থানীয়ভাবে কম খরচে/বিনা খরচে প্রাপ্য
- পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম
- প্রাণিকণার বৃদ্ধির জন্য কম-বেশি সব ধরনের পুষ্টি বিদ্যমান
- সারের আঁশ ব্যাক্টেরিয়ার আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।

WR m¢ii AmE4v

- পরজীবী ও রোগের বাহকের জন্য দায়ী থাকে
- যৌগ পদার্থ হওয়ার কারণে দেরিতে ফলাফল পাওয়া যায়
- তলায় জমা হয়ে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করতে পারে
- অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয় বলে প্রয়োগ পদ্ধতি কিছুটা জটিল
- ক্ষেত্র বিশেষে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।

AWR m¢ii mE4v

- দ্রুত কার্যকর
- বাজারে সহজ প্রাপ্য
- নির্দিষ্ট মাত্রার পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ
- প্রয়োগ পদ্ধতি সহজ।

AWR m¢ii AmE4v

- কার্যকারিতা ক্ষণস্থায়ী
- মাটির গঠন শক্ত হয়ে যায়
- মাটির অণুজীবের কার্যকারিতা কমে যায়
- বহু দিন ধরে ব্যবহার করলে আস্তে আস্তে পুকুরের উৎপাদনশীলতা কমে যায়
- অপরিমিত ব্যবহারে রোগের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

mvi c$¢Mi gvcv

পুকুরে সার প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মজুদকৃত মাছের জন্য প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদন। পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাথমিক উৎপাদনের জন্য একটি পুকুরে কি পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে তা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন-

- মাটির অবস্থা,
- পানির মধ্যকার শেওলার পুষ্টি চাহিদা,
- পরিবেশের অবস্থা (তাপমাত্রা, মেঘ-বৃষ্টি),
- সারের গুণাগুণ,
- সারের প্রাপ্যতা।

এছাড়া পুকুরের উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে চাষির অভিজ্ঞতা ও সারের প্রয়োগ মাত্রা নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সাধারণভাবে একটি পুকুরে পোনা মাছ মজুদপূর্বক বা মজুদের জন্য প্রস্তুতকালীন সারের সুপারিশকৃত মাত্রা নিম্নরূপ ঃ

সার	প্রয়োগমাত্রা/শতাংশ	
অজৈব সার	সাধারণ পরিমাপক	স্থানীয় পরিমাপক
ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম	৩-৫ মুঠ
টিএসপি-*	৫০-৭৫ গ্রাম	১-২ মুঠ

*টিএসপি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহার করলে ইউরিয়ার প্রয়োগমাত্রা অর্ধেক হবে।

mvi c$M cNv!

MKbv cÖ¯‘wZ ঃ নতুন খননকৃত বা তলদেশ, ঢাল, পাড়, ইত্যাদি সংস্কারের জন্য পানি সেচ দেয়া পুকুরে পানি প্রবেশ করানোর সুবিধা থাকলে অথবা যদি না থাকে তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিকে ভারি বর্ষণ হলে, এ সম্ভাবনায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ জৈব সার সমানভাবে তলায় ছড়িয়ে দেয়ার পর চাষ দিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে শুকনোর পার তলায় একটি গর্ত খুঁড়লে যদি দেখা যায় মাটি হতে অতিরিক্ত লাল কষ বের হয় তবে চাষ না দেয়াই ভাল। প্রয়োজনে উপযুক্ত মাত্রার জৈব সারের সাথে কিছু সরিষার খৈল (০.৫ কেজি/শতাংশ) মিশিয়ে দেয়া যায়। পানি ভরাটের পর টিএসপি সার ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পানি মিশ্রিত সার ছিটানোর পূর্বে ইউরিয়ার সাথে একত্রে পানিতে গুলে সমস্ড় সারের মিশ্রণ পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

cwb 2w!"cÖ¯‘wZ @ টিএসপি একটি বালতি বা ড্রামের মধ্যে তিনগুন পানিতে ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং ভালভাবে মিশ্রণের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োগের পূর্বে এগুলোর সাথে ইউরিয়া ভালভাবে মিশিয়ে সারা পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

mvi cÖ‡qv‡Mi mg$

চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর এবং পোনা মজুদের ৮-১০ দিন আগে পুকুরে প্রস্ততকালীন সার প্রয়োগ করতে হবে। দিনের যে কোন সময় সার প্রয়োগ করা গেলেও সাধারণত পুকুরের পানিতে সূর্যালোক পড়ার পর সার প্রয়োগ করাই উত্তম। এই সময়টি সকাল থেকে দুপুরের মধ্যেই নির্ধারণ করা উচিত।

Aw4‡ kb cwiKíbv

w%b @ K2	mg$ @ Ke)C*-(K)C*	†g$v%Kvj @ FK wgwbU

wk‡ivbvg ঃ gvS Pv‡# gR¤ÿKvj?b ¨ =ÿebv

A2?: %j ঃ mRKvi? g,m¨ KgK!©\ †DcmRKvi?

j7¨ ঃ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিচিতি, প্রকার ও পর্যাপ্ততা নিরীক্ষণ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা সঠিকভাবে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করতে পারেন এবং নিজ নিজ কর্ম এলাকায় চাষীদের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা পদ্ধতি প্রদর্শন করতে পারেন।
Gছাড়া সঠিকভাবে মাছ ও চিংড়ির পোনার পরিবহন, পরিবেশের সাথে অভ্যস্থকরণ এবং পুকুরে ছাড়ার কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা যাতে তারা অর্জিত জ্ঞান চাষীদের নিকট যথাযথভাবে হস্তান্তর করে মাছচাষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে।

B‡yk¨ ঃ G Aw4‡ kb †k‡# AskMÖnYKvi?M.-

- উপকারী ও অপকারী প্লাংকটনসমূহের পরিচিতি বলতে পারবেন।
- প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মাছচাষের উপযোগী পানির রঙ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি (সেকি ডিস্ক, গামছা গ্লাস ও হাত পদ্ধতি) প্রদর্শন করতে পারবেন।
- ভাল পোনার প্রাপ্যতা ও প্রজাতি নির্বাচন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মাছ ও চিংড়ির মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করতে পারবেন।
- ভাল ও খারাপ পোনা শনাক্ত করতে পারবেন।
- পোনা পরিবহন পদ্ধতি ও বিবেচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পরিবেশের সাথে পোনা অভ্যস্থকরণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

- সঠিকভাবে পোনা ছাড়তে পারবেন।

॥ #$m॥P	A॥‡j॥P¨ ॥ #$	cÖ7. cN॥!	mg$
2॥gK॥	• স্বাগত ও কুশল বিনিময় • পূর্ববর্তী অধিবেশনের আলোকপাত (চুন ও সার প্রয়োগ) • বর্তমান অধিবেশনের সাথে সংযোগ	আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	০৪ মিনিট
॥ #$ =g	• প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিচিতি ও চাষ উপযোগী পানির রং • প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা • প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাপ পদ্ধতি ও সতর্কতা • সেকিডিস্ক পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাপ • গামছা গ্লাস পদ্ধতি ও সতর্কতা • হাত পদ্ধতি ও সতর্কতা • ব্যবহারিক অনুশীলন ভাল পোনার প্রাপ্যতা, প্রজাতি নির্বাচন ও মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ, ভাল ও খারাপ পোনা বাছাই • পোনা পরিবহন (পদ্ধতি, পরিবহনকালে সর্তকতা) • পোনা ছাড়ার স্থান, ও সময় ও পদ্ধতি	আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর, Ms- Power Point Presentation এবং	৫০ মিনিট
m॥i-ms‡7c	• উদ্দেশ্য যাচাই ও মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ • পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, Ms- এবং Power Point Presentation	০৬ মিনিট
cÖ7. mR॥$K m॥gMÖ@ ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, হ্যান্ডআউট, হোয়াইট বোর্ড, ফ্লিপচার্ট, সেকিডিস্ক, গামছা, গ্লাস, ইত্যাদি।			

() cÖ]! K 5॥%¨ ¨ =॥eb॥

মাছ তার দৈহিক বর্ধন এবং পুষ্টির জন্য পুকুরে প্রাপ্ত খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। এ খাবার প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন ও সম্পূরক উভয় প্রকার হতে পারে। যে পুকুরে প্রাকৃতিকভাবে যথেষ্ট খাবার উৎপন্ন হয় সেটি উত্তম। পুকুরে প্রাকৃতিকভাবে যথেষ্ট খাবার উৎপন্ন না হলে তাতে সম্পূরক খাবার দিতে হয় বা পুকুরের উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। পুকুরের নিজস্ব উর্বরতা ও সার প্রয়োগ- এ দুয়ের মাধ্যমেই পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য প্রধানত প্লাংক্টন অর্থাৎ ছোট ছোট উদ্ভিদকণা উৎপন্ন হয়।

পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা জীবউদ্ভিদ কণা (ফাইটোপ্লাংক্টন) উৎপাদন প্রধানত কয়েকটি পুষ্ঠি উপাদান যথা-কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কোবাল্ট, সিলিকন, মলিবডেনাম ইত্যাদি প্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল। এ উদ্ভিদকণা সূর্যের আলোর সহায়তায় সালোকসংশ্লেষনের মাধ্যমে প্রচুর শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে। এ জন্য পুকুরে প্রচুর পরিমাণ সূর্যের আলো আপতিত হওয়া ও পুষ্টির উপাদানসমূহ থাকা জরুরি। উদ্ভিদকণা পুকুরের খাদ্য শিকল (ফুড চেইন) -এর প্রথম স্তর। পুকুরে চাষযোগ্য বেশকিছু মাছ সরাসরি উদ্ভিদকণাকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। এ ছাড়া ও প্রাণিকণা উদ্ভিদকণাকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। প্রাণিকণা পুকুরের খাদ্য শিকলের দ্বিতীয় স্তর। ছোট ছোট মাছসহ পুকুরে চাষযোগ্য বেশ কিছু মাছ প্রাণীকণাকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। এগুলো শিকলের তৃতীয় স্তর। বিভিন্ন রাক্ষুসে মাছ তৃতীয় স্তরের খাবার খায়। এরা খাদ্য শিকলের চতুর্থ স্তর। পুকুরে ভাল উৎপাদনশীলতার জন্য খাদ্য শিকলের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের খাবার গ্রহণকারী মাছের চাষ সর্বোত্তম।

পোনা মজুদের পূর্বে পুকুরে পোনার উপযোগী খাদ্য তৈরি করে নিতে হবে। এ জন্য মজুদের পূর্বে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা আবশ্যক। পুকুরে যথেষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য মজুদ থাকলে পানির রং বাদামী, সবুজ বা হালকা বাদামী হয়। এ পানিতে মাছে ও চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য উদ্ভিদ ও প্রাণিকণা প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকে। আবার ঘন সবুজ তামাটে লাল বা স্বচ্ছ পানি মাছচাষের জন্য ভাল নয়।

cÖ]!K 5v%¨

কোন জলাশয়ের পানি ধারণের আধার হলো মাটি। মাটির গুণাগুণ পানির গুণাগুণকে প্রভাবিত করে। মাটি ও পানির স্বাভাবিক উর্বরতায় কোন জলাশয়ে জন্মানো উদ্ভিদ-কণা, ক্ষুদে উদ্ভিদ ও প্রাণী মাছ যেগুলোকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সেগুলোকে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য বলা হয়। সার প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন করা যায়। মায়ের দুধ যেমন শিশুর প্রধান খাদ্য, প্রাকৃতিক খাদ্যও তেমনি মাছের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের প্রধান উৎস।

cÖ]!K 5v‡%¨i B,m

পানিতে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদে উদ্ভিদ ও প্রাণীই মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের অন্যতম উৎস। এ ছাড়াও পানির তলদেশে ও কাদার উপরে অবস্থানকারী জীবন্ড়নয় এমন পচা জৈব-বস্তুও মাছ প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এসব পচা জৈব-বস্তুতে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া ও অণুবীক্ষণিক প্রাণী লেগে থাকে, যেগুলো অধিক পুষ্টিমান সমৃদ্ধ এবং মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

জলজ পরিবেশে প্রাপ্ত মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যকে নিম্নরূপে ৬টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

- প্ল্যাঙ্কটন
- পেরিফাইটন
- নেকটন
- নিউসটন
- বেনথোস, এবং
- ম্যাক্রোফাইট।

c_¨vzUb

পানিতে বিদ্যমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদকে প্ল্যাঙ্কটন বলা হয়। প্ল্যাঙ্কটন মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য। পানিতে প্ল্যাঙ্কটন বেশি থাকা পুকুরের অধিক উৎপাদনশীলতা নির্দেশ করে। প্ল্যাঙ্কটনের আধিক্যে পানির বর্ণ সবুজ বা বাদামী দেখায়। প্ল্যাঙ্কটন দুই প্রকার, যথা-

- উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটন এবং
- প্রাণী প্ল্যাঙ্কটন।

Bw{%}c_¨vzUb

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদই উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটন । এগুলোর বর্ণ সবুজ। উদ্ভিদ–প্ল্যাঙ্কটন মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাথমিক উৎস। উদ্ভিদ–প্ল্যাঙ্কটন পানির ঢেউ বা স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে পারে না। স্রোত বা ঢেউয়ের তালে তালে এরা ভেসে বেড়ায়।

cÖপ্লাঙ্কটন

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী ও কীটপতঙ্গের লার্ভাকে প্রাণী প্ল্যাঙ্কটন বলা হয়। প্রাণীপ্ল্যাঙ্কটন মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের দ্বিতীয় বা মধ্যম পর্যাযের উৎস। প্রাণীপ্ল্যাঙ্কটন মাছের প্রাণিজ খাদ্যের প্রধান উৎস।

†cwidv8Ub

পেরিফাইটন হলো ঐ সকল ক্ষুদে উদ্ভিদ ও প্রাণী যারা শিকড়যুক্ত ও অপেক্ষাকৃত বড় জলজ উদ্ভিদের শাখা প্রশাখায় লেগে থাকে বা পানির তলদেশের শক্ত কোন আশ্রয়ে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে জীবন যাপন করে।

†bKUb

অপেক্ষাকৃত বড় ধরনের জলজ প্রাণী যারা মুক্তভাবে সাঁতার কাটতে পারে এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, তাদেরকে নেকটন বলা হয়। নেকটন প্ল্যাঙ্কটন নেটে ধরা পড়া থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। যথা- ওয়াটার বীট্ল, ক্ষুদে উভচর প্রাণী, জলজ পোকা মাকড়, ইত্যাদি।

wbBmUb

পানির উপরিভাগে ঝুলে থেকে বা ভাসমান অবস্থায় সাঁতাররত বা বিশ্রামকারী জীবকে নিউসটন বলা হয়। যথা- প্রোটোজোয়া, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি।

‡ b‡1vm

পানির তলদেশে কাদার উপরিভাগে বা কাদার মধ্যে বসবাসকারী জীবকে বেনথোস বলা হয়। যথা- শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি।

g¨v‡Ovdv8U

অপেক্ষাকৃত বড় ধরনের জলজ উদ্ভিদকে ম্যাক্রোফাইট বলা হয়। যথা- ক্ষুদে পানা, কুটি পানা ইত্যাদি।

cÖ]!K 5v‡%¨i cÖ$Rb?$!v

মাছ চাষের জন্য জলাশয়ে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমিত যোগান দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক খাদ্য মাছের খাদ্য চক্রকে সচল রাখে। ফলে জলাশয়ে মাছের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য উপাদান চক্রাকারে ও অবিরতভাবে উৎপাদিত হয়ে থাকে। এতে মাছের দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি সাধন ও বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

প্রাকৃতিক খাদ্য মাছের স্বাভাবিক খাবার। এজন্য মাছ প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণে বেশি পছন্দ করে। প্রাকৃতিক খাদ্যের পুষ্টিমান বেশি এবং এগুলো সহজেই হজম হয়। এ কারণে প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণে মাছের সুষম বৃদ্ধি ঘটে। ফলে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত হয়।

পরিমিত প্ল্যাঙ্কটন জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পুকুরের বিভিন্ন স্তর হতে খাদ্য গ্রহণকারী বিভিন্ন প্রজাতির মাছকে যথাযথ পরিমাণে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা যায় না। তাছাড়া, সব প্রজাতির মাছ সম্পূরক খাদ্য গ্রহণে সমান উৎসাহ দেখায় না। আবার একই জলাশয়ে একই সময়ে বিভিন্ন ধরনের সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। কৃত্রিম বা সম্পূরক খাদ্য প্রাকৃতিক খাদ্যের বিকল্প নয়, পরিপূরক মাত্র। অনেক সময় সম্পূরক খাদ্য সুষম হয় না। এ জন্য মাছ চাষে প্রাকৃতিক খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

cÖ]!K 5v%¨ ci?7v

মাছের দেহের পুষ্টিসাধন এবং দৈহিক বৃদ্ধি পুকুরে বিদ্যমান বা দেয়া খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। এ খাদ্য পুকুরে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন হতে পারে বা বাইরে থেকে দেয়া সম্পূরক খাদ্য হতে পারে; অথবা উভয় প্রকারের হতে পারে। যে পুকুরে প্রাকৃতিকভাবে যথেষ্ট খাবার উৎপন্ন হয় সেটি ভাল পুকুর। পুকুরে প্রাকৃতিকভাবে যথেষ্ট খাবার উৎপন্ন না হলে তাতে সম্পূরক খাবার দিতে হয়। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। পুকুরের মাটি ও পানির উর্বরতা ও সার প্রয়োগ- এ দুয়ের মাধ্যমেই পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য - প্রধানতঃ প্ল্যাঙ্কটন অর্থাৎ ছোট ছোট উদ্ভিদপ্ল্যাঙ্কটন ও প্রাণিকণা উৎপন্ন হয়।

উদ্ভিদপ্ল্যাঙ্কটন সূর্যের আলোর সহায়তায় বংশ বৃদ্ধি করে। এ জন্য পুকুরে দীর্ঘ সময় কার্যকর সূর্যের আলো পড়া দরকার। পুকুরে চাষযোগ্য বেশকিছু মাছ সরাসরি উদ্ভিদ-প্ল্যাঙ্কটন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এ ছাড়াও, প্রাণিপ্ল্যাঙ্কটন উদ্ভিদ-প্ল্যাঙ্কটন খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। প্রাণিপ্ল্যাঙ্কটন পুকুরের খাদ্যশিকলের দ্বিতীয় স্তর। ছোট ছোট মাছসহ পুকুরে চাষযোগ্য বেশ কিছু মাছ প্রাণিপ্ল্যাঙ্কটনকেখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। এগুলো খাদ্য শিকলের তৃতীয় স্তর। বিভিন্ন রাক্ষুসে মাছ তৃতীয় স্তরের খাবার খায়। এরা খাদ্য শিকলের চতুর্থ স্তর। পুকুরে ভাল উৎপাদনশীলতার জন্য খাদ্য শিকলের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের খাবার গ্রহণকারী মাছের চাষ সর্বোত্তম।

পোনা মজুদের পূর্বে পুকুরে পোনার উপযোগী খাদ্য তৈরি করে নিতে হবে। এজন্য পোনা মজুদের পূর্বে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা দরকার। পুকুরে যথেষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য মজুদ থাকলে পানির রং বাদামি সবুজ বা হালকা বাদামি হয় । ঘন সবুজ তামাটে লাল বা স্বচ্ছ পানি মাছ চাষের জন্য ভাল নয়।

cÖ]!K 5v%¨ ci?7vi cÖ$Rb?$!v

- পানিতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার আছে কিনা তা জানা
- পুকুরের পরিবেশ পোনা ছাড়ার উপযোগী কি না তা জানা
- পুকুরে আরও সার প্রয়োগ করতে হবে কিনা তা জানা

cÖ]!K 5%¨ ci?7vi cN!

পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য আছে কি না তা প্রথমেই খালি চোখে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে রং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝে নেয়া যায়। সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর সকাল ১০-১১ টায় পর্যবেক্ষণ করতে হয়। সূর্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এটি ব্যবহার করা উচিত। এ ছাড়াও নিম্নবর্ণিত পদ্ধতির মাধ্যমে পানির প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাপ করা যেতে পারে।

() †mwKwA=i cNw!

সেকিডিস্ক একটি লোহার চাকতি বিশেষ। এর ব্যাস ২০ সেমি, রং সাদা-কালো। এটি তিন রঙের সুতা দ্বারা ঝুলানো থাকে। গোড়া থেকে প্রথম ২০ সে.মি, লাল, দ্বিতীয় ১০ সে.মি সবুজ বাকি অংশ সাদা (১০০-২০০ সে.মি.)।

¨ Rvi †Kakj

পানিতে সুতা পর্যন্ত ডুবানোর পর সেকিডিস্কের সাদাকালো অংশ দেখা যাওয়ার ওপর পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা পরীক্ষা করা যায়। নিম্নে সেকিডিস্ক রিডিং -এর মাধ্যমে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা নিরূপণের একটি চার্ট দেয়া হলো।

‡mwKwA=i wiwAs	cÖ]!K 5‡%¨i c/`[!v
২০ সে.মি. এর কম	পুকুর অত্যন্ত ঘোলা। এটা যদি উদ্ভিদ/প্রাণিকণার জন্য হয়ে থাকে তাহলে এদের প্রাচুর্যে জন্য পুকুরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সঙ্কট দেখা দিতে পারে। এ অবস্থায় পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য কিংবা সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। আর যদি পানিতে দ্রবীভূত মাটি, কাদা ইত্যাদি মিশ্রণের ফলে এটা হয়ে থাকে তাহলে পুকুর খুবই কম উৎপাদনশীল হবে।
২০-৩০ সে.মি.	পুকুরে ঘোলাত্ব অধিক।
৩০-৪৫ সে.মি.	যদি উদ্ভিদ/প্রাণিকণার জন্য এ রিডিং পাওয়া যায় তাহলে পুকুরটি মাছচাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।
৪৫-৬০ সে.মি.	উদ্ভিদ প্রাণিকণার পরিমাণ কম। সার প্রয়োগ জরুরি।
৬০ সে.মি. এর অধিক	পুকুরের পানি অতিরিক্ত পরিষ্কার। উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। পুকুরের ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন।

m!K'!v

- একই ব্যক্তি কর্তৃক একই সময়ে প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাপ করতে হবে।
- ঘোলা পানিতে বা মেঘাচ্ছন্ন দিনে সেকিডিস্ক ব্যবহার করা যাবে না
- সেকিডিস্ক রিডিং সঠিকভাবে নিতে হবে
- সেকিডিস্কের লাল ও সবুজ সুতা দৈর্ঘ্য সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে।

2) MvgSv M_vm cNw!

পুকুর প্রস্তুতকালীন সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর গামছার সাহায্যে পানি সংগ্রহ করে পরিষ্কার কাঁচের গ্লাসে নিয়ে এ পরীক্ষা করতে হয়। সূর্যের আলোতে যদি গ্লাসের মধ্যে উদ্ভিদকণা (গ্লাস প্রতি ৫-১০টি) দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে।

m!K'!v

- অস্বচ্ছ রঙ্গিন বা ছাপমারা গ্লাস ব্যবহার করা যাবে না
- ঘোলা পানিতে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে না।

+) Rv! cNw!

নিজের হাত কনুই পর্যন্ত পানিতে ডুবানোর পর, হাতের তালু/পাতা দেখতে হবে। পানির রং সবুজাভ হাওয়ার কারণে হাতের তালু দেখা না গেলে বুঝতে হবে পরিমিত খাদ্য আছে।

m!K'!v

- ঘোলা পানিতে ফলাফল আসবে না
- ছোট হাত ব্যবহার করা যাবে না
- হাতের তালু ফর্সা হতে হবে
- একই ব্যক্তিকে একই স্থানে প্রতিবার পরীক্ষা করতে হবে।

‡cvbvi cÖ!wb wPb 6 gRÆjb!Ÿb4¶i.

পোনার প্রাপ্যতা ঃ মিশ্র চাষের ৪-৬ ধরনের কার্পের পোনা দরকার। সব জাতের পোনা একই এলাকায় একই সময়ে নাও পাওয়া যেতে পারে। এলাকাভিত্তিক প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করেই কার্পের পোনার জাত নির্বাচন করা উচিত। একইভাবে গলদা চিংড়ির কিশোর পোনা (ঔাঁবহরষব) বিভিন্ন এলাকার প্রাকৃতিক উৎস এবং হ্যাচারিতে উৎপাদিত পিএল (চড়ংঃ ষধৎাধব) লালনকারীদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। গলদা চিংড়ির পিএল থেকে কিশোর পোনা (ঔাঁবহরষব) পর্যন্ত প্রতিপালন করার পদ্ধতি সম্পর্কে চিংড়ি নার্সারি ব্যবস্থাপনা অধ্যায় বিস্ড়্গরিত আলোচনা করা হয়েছে।

cÈ'ii B,cv%bk?j!v ঃ মাটি ও পানির গুণাগুন ভেদে পোনার মজুদ ঘনত্ব কম বেশি হতে পারে। যেমন ঃ এঁটেল ও লাল মাটির উৎপাদনশীলতা দো-আঁশ মাটির চেয়ে কম। ফলে দো-আঁশ মাটির পুকুরে অন্যান্য মাটির পুকুরের তুলনায় কিছু বেশি পোনা মজুদ করা যায়।

‡cvbvi cÖwk! AvKvi ঃ নির্দিষ্ট সময়ে (৫-৮ মাস) বড় আকারের মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন করতে হলে কম ঘনত্বে বড় আকারের পোনা মজুদ করা যায়।

¨ =¶ebvi 4ib ঃ পুকুরে শুধু সার ব্যবহার করা হলে মজুদ ঘনত্ব কিছু কম এবং সার ও খাদ্য দুই-ই ব্যবহার করলে মজুদ ঘনত্ব কিছু বেশি হতে পারে।

‡cvbvi AvKvi 6 jb! ঃ পুকুরে বড় আকারে (কার্প ঃ ১০-১৫ সে.মি এবং গলদা চিংড়ি ঃ ৫ সে.মি) পোনা ছাড়া হলে কম সময়ে বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়। মিশ্রচাষে শতাংশ প্রতি কার্পের মজুদ ঘনত্ব ৩৩ টি এবং গলদা চিংড়ির ঘনত্ব ১০-২০ টি হতে পারে।

mvix. @ gvS 6 Mj%v wPswTi gRÆjb‡!ŸbgÈ (k!vs‡k)

g‡Si cÖRvwZ!	bgybv-(	bgybv-2	bgybv-+
সিলভার কার্প	৯	৯	৯
কাতলা	৩	৩	৩
রুই	৬	৬	৬
গ্রাসকার্প	৩	৩	৩
রাজপুঁটি	১২	১২	১২
গলদা চিংড়ি	১০	১৫	২০
মোট =	৪৩	৪৮	৫৩

‡cvbv kbvQKi. G s 2vj 6 5vivc ‡cvbv vSv8

‡cvbv kbvQKi.

রুইজাতীয় মাছের পোনা আমাদের কাছে পরিচিত। চাষযোগ্য নতুন প্রজাতি হিসেবে গলদা চিংড়ির পোনা শনাক্তকরণে একটু অসুবিধা হতে পারে। গলদা চিংড়ির পোনার বৈশিষ্ট নিম্নরূপ ঃ

অবস্থা	দৈহিক বৈশিষ্ট্য
লার্ভা (১১তম পর্যায়)	করাতের উপর দিকে ৩/৪টি দাঁত। লম্বায় ৫-৭ মিমি।
ছোট পোস্ট-লার্ভা (পিএল)	করাতের উপর ও নিচে দাঁত। দেখতে স্বচ্ছ, মাথায় একটি হালকা বাদামী রঙের দাত।
বড় পোস্ট-লার্ভা	মাথার দিকটি হালকা কমলা রং। মাথায় লম্বালম্বি ৬-৮ টি কালো দাগ। লম্বায় ১.৫-২.০ সে.মি।
কিশোর চিংড়ি (জুভেনাইল)	দেহ নীলাভ বাদামী/ছাই রঙের। দেহের দ্বিতীয় খণ্ডের খোলস প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডের খোলসকে আংশিক ঢেকে রাখে। করাতের উপর দিকে ১৩-১৪ টি এবং নিচে ১১-১৩ টি দাঁত থাকে।

2vj 6 5vivc ‡cvbvi kbvQKi. V wk:¨ নিম্নরূপ-

Kvc'@

c/‡" 7. w #$	2vj ‡cvbv	5vivc ‡cvbv
চলাফেরা	চঞ্চল	স্থির
আইশ	ঝকঝকে	ফিকে
বিজল	পিচ্ছিল	খসখসে
শরীরে দাগ	কোন দাগ নেই	দেহ, পাখনা ও ফুলকায় লাল দাগ

Mj%v wPswT

c/‡" 7. w #$	2vj ‡cvd-jv2v"	5vivc ‡cvd-jv2v"
দেহের রং	নীলাভ বাদামী/ছাই	লালচে/কমলা
খোলস	পরিষ্কার	নোংরা
আচরণ (গোল পাত্রে স্রোত সৃষ্টি/ আঙ্গুল দিয়ে ২-৩ মিনিট ঘূর্ণির পর পর্যবেক্ষণ)	স্রোতের বিপরীতে সন্তরণশীল	পাত্রের মাঝখানে জমা হয়ে যায়
খোলসের দাগ	প্রতিটি খন্ডাংশে আড়াআড়ি দাগ আছে	দাগগুলো অস্পষ্ট
খাদ্য	পেট খাদ্যে ভর্তি	পেট খালি
পেশী	লেজের নিকটবর্তী খন্ডাংশে ভাল ও পরিষ্কার পেশী	লেজের পেশী ছাই রঙের

,,,

‡cvbv cwi Rb

‡SvU %j?$ AbkÆjb?

এ অনুশীলনীর উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবহনকালে পোনা মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা বৃদ্ধি।

কাজের ধারা

১. অংশগ্রগণকারীদের চারটি ছোট দলে ভাগ করা হবে।
২. প্রত্যেক দল নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে পরিবহনকালে পোনা মৃত্যুর কারণ ও সম্ভাব্য প্রতিকারগুলো চিহ্নিত করবেন
৩. চিহ্নিত বিষয়গুলো নিউজপ্রিন্টে লিখে দলীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে বড় দলে উপস্থাপন করবেন।

সময়- ১৫ মিনিট

‡cvbv cwi Rb 6 A gÆQ

আমাদের দেশে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে অক্সিজেন ব্যাগে কার্পজাতীয় মাছের রেণু ও চিংড়ির পিএল এবং সনাতন পদ্ধতিতে ড্রাম বা এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে চিংড়ির জুভেনাইল ও মাছের চারা পোনা পরিবহন করা হয়ে থাকে। তবে সুযোগ থাকলে আধুনিক পদ্ধতিতে চারা পোনা ও জুভেনাইল পরিবহন অধিক নিরাপদ। সনাতন পদ্ধতিতে পরিবহনকালে ড্রাম বা এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ির গায়ে ধাক্কা লেগে পোনার দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে এবং পাত্রের পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখে দিতে পারে, এমনকি ব্যাপক হারে পোনা মারা যেতে পারে। পক্ষান্তরে, অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহনকালে অক্সিজেনের অভাব হয় না ও পোনার শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। সে কারণে সনাতন পদ্ধতিতে পোনা ও জুভেনাইল পরিবহনে অধিক সতর্কতা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।

‡cvbv g&Zi Kvi.

একাধিক কারণে পরিবহনকালে বা মজুদের অব্যবহিত পরে পোনা ও জুভেনাইল মারা যেতে পারে। সাধারণত যে সব কারণে পোনার মৃত্যু ঘটে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিচে উল্লেখ করা হলো-

অক্সিজেন ঘাটতি

পোনা ও জুভেনাইলের অক্সিজেন চাহিদা বড় মাছ ও চিংড়ির তুলনায় বেশি। সে কারণে যদি অধিক ঘনত্বে পরিবহন করা হয় তবে খুব দ্রুত পাত্রে অক্সিজেন ঘাটতি সৃষ্টি হওয়ার ফলে পোনা ও জুভেনাইল মারা যেতে পারে।

শারীরিক ক্ষত

জাল টানা, ওজন ও গণনা করা এবং এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে স্থানান্তরের সময় পোনার আঁশ উঠে যেতে পারে, শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে এবং জুভেনাইলের এন্টেনা ও উপাঙ্গসমূহ ভেঙ্গে যেতে পারে। পরিবহনকালে এসব পোনা ও জুভেনাইলের মৃত্যুহার বেশি হয়।

G¨v‡gwb$v m&

পরিবহনকালে পোনা ও জুভেনাইলের ত্যাগকৃত মল পচনের ফলে পাত্রে এ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয় এবং এতে পানি দূষিত হয়ে যায়। দূষণের মাত্রা সহ্য ক্ষমতার চেয়ে বেশি হলে পোনা ও জুভেনাইল দ্রুত মারা যায়।

cwi Rb %i-!Y

পরিবহন দূরত্ব যত বেশি হয় পোনা ও জুভেনাইলের ওপর তত বেশি শারীরিক চাপ পড়ে। ফলে এরা মারা যেতে পারে।

kvi?wiK %Ej!v

পোনা ও জুভেনাইল যদি দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয় তবে পরিবহনকালে মৃত্যুহার স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেক বেশি হয়।

‡UKm8 bv Kiv

পরিবহনের জন্য পোনা ধরার আগে টেকসই করা না হলে এরা নাজুক বা কাঁচা থাকে। কাঁচা পোনা পরিবহনকালীন ধকল সহ্য করতে পারে না।

cwi RbKvj?b w ‡ P¨ w #$

- মাছ ও চিংড়ির পরিবহন ঘনত্ব নির্ভর করে এদের জাত, ওজন/আকার, তাপমাত্রা, শারীরতাত্ত্বিক অবস্থা, ইত্যাদির ওপর। যেমন-কাতলা ও সিলভার কার্পের পরিবহনকালীন ঘনত্ব অন্যান্য মাছের তুলনায় ৩০% কম হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাছ ও চিংড়ির অক্সিজেন চাহিদা বাড়তে থাকে। ফলে পরিবহনকালে পাত্রের তাপমাত্রা কম রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। কম তাপমাত্রা এবং পিএইচ একটু বেশি থাকলে মাছ ও চিংড়ির বিপাক কম হয়। তাই পাত্রের পানি ঠান্ডা রাখার জন্য প্রতি ঘন্টা পরিবহন সময়ের জন্য লিটার প্রতি ১০ গ্রাম বরফ মিশানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- মাছের পোনা ও জুভেনাইলের আকার যত বড় হবে পরিবহন ঘনত্ব তত কম ও অক্সিজেন সরবরাহ তত বেশি থাকতে হবে।
- পেটে খাবার থাকলে অক্সিজেন চাহিদা বেড়ে যায়। সে কারণে পোনা পরিবহনের আগে পেট খালি করে নিতে হবে। পেট খালি করে না নিলে পোনার প্রোটিন বিপাক এবং বর্জ্যের ওপর ব্যাক্টেরিয়ার ক্রিয়ার ফলে পানিতে অ্যামোনিয়া বেড়ে যায়।
- কার্প-জাতীয় মাছের পোনা পরিবহনকালে পোনার খারাপ অবস্থার প্রতি স্পর্শকাতরতা কমানোর জন্য ৩ গ্রাম/লিটার হারে খাবার লবণ মিশালে ভাল পাওয়া যায়। কিন্তু পাঙ্গাশ ও চিংড়ির পোনার জন্য কোনভাবেই লবণ ব্যবহার করা যাবে না।

‡cvbv cwi Rb jb!

আধুনিক বা সনাতন যে কোন পদ্ধতিতেই পরিবহন করা হোক না কেন পরিবহন ঘনত্ব মূলত নির্ভর করে পিএল, জুভেনাইল ও চারা পোনার আকার, ওজন এবং পরিবহন দূরত্বের ওপর। সাধারণভাবে ৩৬˝×২০˝ আকারে অক্সিজেন ব্যাগ পিএল বা পোনা পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী সারণিতে আধুনিক ও সনাতন পদ্ধতিতে মাছ চিংড়ির পোনার সহনশীল পরিবহন ঘনত্ব উল্লেখ করা হলো-

K‡cï ‡cvbvi cwi Rb jb!Y

cwi Rb cNw!	‡cvbvi AvKvi (†m)wg))	jb!Ÿj Uvi cwb	cwi Rb %i-!Ÿ(j9Uv)
অক্সিজেন ব্যাগ	৩	৩৩-৩৫ টি	১০-১২
	৪	২০টি	১০-১২
	৫	১৩টি	১০-১২
	৬	৫টি	১০-১২
	৭	৪টি	১০-১২
সনাতন পদ্ধতি (পাতিল)	৩-৫	১৫টি	৩-৪
	৭-১০	৫-৬টি	৩-৪

পাঙ্গাশের চারা পোনার ঘনত্ব কার্পের ২০-২৫% বেশি হতে পারে।

wPswT †cvbvi cwi Rb jb!Y

cwi Rb cNw!	wPswT †cvbvi AvKvi (‡m)wg))	jb!Ÿj Uvi cwb	cwi Rb %i-!Ÿ(j9Uv)
অক্সিজেন ব্যাগ	পিএল	১২৫-১৫০টি	১২-১৬
	পিএল	৩০০-৩৫০টি	৬
	জুভেনাইল	১০০টি	৬
সনাতন পদ্ধতি পাতিল	পিএল	২৫০-৫০০টি	১-১.৫
	জুভেনাইল	১৫-২০টি	৪-৬

mbv!b cwi Rbw

- পরিবহন পাত্রে ১০-১২ লিটার টিউবওয়েলের পানি নিয়ে তাতে ২-৩ লিটার পুকুরের ভাল পানি মেশাতে হবে।
- পোনা বা জুভেনাইল ভর্তি করে পাত্রের মুখ ঘন ফাঁসের জ্বাল দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।
- পরিবহনকালে প্রতি ২-৩ ঘন্টা অন্তর পাত্রের ২/৩ ভাগ পানি পরিবর্তন করতে হবে।

cwjw1b ¨v‡M cwi R‡bi wb$g

আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ ও চিংড়ির পোনা প্যাকিং ও পরিবহন পদ্ধতি মোটামুটি একই রকমের। তবে চিংড়ির পোনার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। নিচে আধুনিক পদ্ধতিতে পোনা প্যাকিং পরিবহনের নিয়ম আলোচনা করা হলো-

- পরিবহনের কমপক্ষে ২ ঘন্টা পূর্বে খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। তবে দূরপাল্লায় পিএল পরিবহনের ক্ষেত্রে জীবিত খাদ্য হিসেবে আর্টিমিয়া নপ্লি বা প্রতি ৫০০ টি পিএল-এর জন্য একটি সিদ্ধ ডিমের কুসুমের $^১/_৮$ ভাগ খেতে দিতে হবে।
- পলিথিন ব্যাগে ছিদ্র আছে কিনা তা ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে। একটি ব্যাগের ভেতর আরেকটি ব্যাগ ঢুকিয়ে কোনগুলো শক্তভাবে বাঁধতে হবে যেন সে স্থানে কোনক্রমেই পোনা আটকে না যায়। অতঃপর ব্যাগের $^১/_৩$ অংশ পানি পূর্ণ করতে হবে।
- শুধু চিংড়ির পিএল ব জুভেনাইল পরিবহনের ক্ষেত্রে প্যাকিংয়ের পূর্বে আশ্রয়ের জন্য কিছু জলজ আগাছা ব্যাগের ভেতর দিতে হবে।
- এবার পিএল বা মাছের পোনা ব্যাগের ভিতর নিয়ে ২/৩ অংশ অক্সিজেন দ্বারা পূর্ণ করতে হবে এবং অক্সিজেন ব্যাগের মুখে শক্ত করে বাঁধন দিতে হবে।
- একসাথে অনেক ব্যাগ পরিবহন করা হলে ব্যাগগুলো তাপ অপরিবাহী কার্টুনে নিয়ে পরিবহন করা অধিক নিরাপদ।

cwi RbKvj?b m!K'!v

- ব্যাগে যাতে কোন প্রকার চাপ না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- পরিবহন পাত্র ভেজা কাপড় বা চট দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে।
- পরিবহনকালে ব্যাগ/পাতিল ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।
- একই ব্যাগ বা পাত্রে সমান আকারে পিএল পরিবহন করতে হবে।
- ব্যাগে যাতে কোন শক্ত বস্তুর আঘাত না লাগে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- পানি ঠান্ডা রাখার জন্য প্রতি ঘন্টা পরিবহন দূরত্বে লিটার প্রতি ১০ গ্রাম হারে বরফ দিলে ভাল হয়।

পরিবেশের তাপমাত্রা ও অক্সিজেনের তারতম্যের কারণে মজুদের পর মাছের পোনা এবং পিএল/জুভেনাইল ব্যাপক হারে মারা যেতে পারে। পুকুরে ছাড়ার আগে এদেরকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত করে নিলে এ মৃত্যু হার অনেকাংশে রোধ করা যায়। পরিবহন পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রায় সমতা আনয়নই হচ্ছে অভ্যস্তকরণ। নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত করে পুকুরে পোনা বা পিএল/জুভেনাইল ছাড়ার ধারাবাহিক কাজগুলো নিম্নরূপ-

- পরিবহন পাত্র ১৫-২০ মিনিট পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে।
- ব্যাগ বা পাত্রের মুখ খোলার পর আস্তে আস্তে পাত্র ও পুকুরের পানি অদল-বদল করে দুই পানির তাপমাত্রা সমতায় আনতে হবে।
- হাত দিয়ে মাঝে মাঝে পরিবহন পাত্র এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রার ব্যবধান পরীক্ষা করতে হবে।
- লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দুই পানির তাপমাত্রার ব্যবধান ১-২ সেঃ এর বেশি না হয়।
- উভয় পানির তাপমাত্রা সমান হলে পাত্রের মুখ কাত করে ধরে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে স্রোতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ অবস্থায় সবল পোনা স্রোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে বাইরে চলে যাবে।
- লক্ষণীয় যে পাড়ের কাছাকাছি অল্প গভীরতায় পোনা ছাড়তে হবে, ঘের বা পুকুরের মাঝখানে নয়।

‡cvbv 6 wcGj SvTvi mg$

ঠান্ডা আবহাওয়ায় দিনের যে কোন সময়ে পুকুরে মাছের পোনা ছাড়া যায়। তবে সকাল অথবা বিকালে পোনা ছাড়াই উত্তম। দুপুরের রোদ, মেঘলা দিনে বা ভ্যাপসা আবহাওয়ায় (বিশেষত নিম্নচাপের দিনে) পুকুর বা ঘেরে মাছের পোনা বা পিএল ছাড়া উচিত নয়।

gREci !?" ¨ =>ebv

gREci !?"mvi cÖ‡qvM

পানিতে ভাসমান বিভিন্ন ধরনের প্লাংকটন মাছ ও চিংড়ির প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য। প্ল্যাংকটন দু'ধরনের, ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও জু'প্ল্যাংকটন। পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

সারের প্রকারভেদ: জৈব ও অজৈব দু'ধরনের সারই পুকুরে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

\R m¨vi

সরাসরি জু'প্ল্যাংকটন এবং ব্যাকটেরিয়ার খাদ্য হিসেবে কাজ করে। পানিতে অজৈব পুষ্টি মুক্ত করে ফাইটোপ্ল্যাংকট উৎপাদনে সাহায্য করে। পুকুরে জৈব সার হিসেবে খৈল এবং চিটাগুড় ব্যবহার করা যেতে পারে।

m!K'!v

গোবর, হাঁসমুরগির বিষ্ঠা বা কম্পোস্ট মাছ চাষে ব্যবহার করা যাবে না কারণ এগুলোতে ক্ষতিকারক জীবাণূ, গ্রোথ হরমোন এবং অনুমোদনবিহীন এন্টিবায়োটিক থাকে।

A\R mvi

প্রাথমিকভাবে ফাইটোপ্ল্যাংকটন উৎপাদনে সহায়ক বা জু'প্ল্যাংকটনের বিস্তারকে তরান্বিত করে। অজৈব সার হিসেবে প্রধানত ইউরিয়া ও টিএসপি ব্যবহার করা হয়।

মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য তথা মাছের ভাল বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত সার প্রয়োজন। এই প্রয়োগ দৈনিক বা সাপ্তাহিক মাত্রায় হতে পারে।

সারের নাম	*পরিমাণ/শতাংশ/দিন*	*পরিমাণ/শতাংশ/সপ্তাহ*
খৈল	*১৫০-২০০ গ্রাম*	*১-১.৫০ কেজি*
ইউরিয়া	*৪-৫ গ্রাম*	*২০-২৫ গ্রাম*
টিএসপি	*২-৩ গ্রাম*	*১০-১৫ গ্রাম*

ইউরিয়া বাদে খৈল ও টিএসপি সার একত্রে ৩ গুণ পানিতে ১২-২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর সার ছিটানোর ২০-৩০ মিনিট আগে ইউরিয়া মিশিয়ে ভালভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে। তারপর গুলানো সার সমস্ত পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ছিটানোর কাজটি সকাল ১০-১১ টার দিকে হলে ভাল হয়।

মাছ ও চিংড়ির পোনার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি বাইরে থেকে খাবার দেয়া হয়। স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মাছ ও চিংড়ির পোনার খাদ্য ও নির্দিষ্ট মাত্রায় সকল পুষ্টি উপাদান থাকা প্রয়োজন। খাদ্যে এ সব পুষ্টি উপাদানের কোনটি প্রয়োজনীয় মাত্রায় না থাকলে পোনার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উপায়ে মাছ চাষ করতে গেলে মজুদ ঘনত্ব বাড়াতে হবে। এ অবস্থায় প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর নির্ভর করা চলে না। নিবিড় মাছচাষের সম্পূরক খাদ্যের ব্যবহার খুবই গুাংত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য দিলে মাছের ও চিংড়ির পুষ্টি পরিপূর্ণভাবে সাধন হয়। ফলে মোট উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। কার্প জাতীয় প্লাংক্টনভোজী মাছ যথা- রুই, কাতলা, মৃগেল, কমনকার্প এবং চিংড়ি, এ ছাড়া ও তৃণভোজী গ্রাস কার্প প্রভৃতি মাছ সম্পূরক খাদ্য গ্রহণ করে থাকে।

m-3¡K 5v¢%¨i B,m

মাছ ও চিংড়ির বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উৎস অনুযায়ী এ সব উপাদানকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন- (ক) উদ্ভিদজাত (খ) প্রাণিজাত।

(K) B¡{%Rv! @ চালের মিহি কুড়া, গমের ভুসি, চালের খুদ, আটা গুড়, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, কলাপাতা, তুঁত পাতা, ক্ষুদিপানা, মিষ্টি কুমড়ার পাতা, ইপিল ইপিল, নেপিয়ার ঘাস ইত্যাদি।

(5) cÖRv! @ ফিসমিল, চিংড়ির মাথার গুঁড়া, কাঁকড়ার গুঁড়া, শামুকের মাংস, গবাদিপশুর রক্ত ইত্যাদি।

m#g m-3¡K 5v¢%¨i 5v%¨ Bcv%vb

বিভিন্ন মাছের প্রজাতি, আকার, জীবনচক্রের বিভিন্ন দশা, ঋতু প্রভৃতি বিবেচনা করে সম্পূরক খাদ্যের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের মাত্রা ঠিক করতে হয়। মাছের দেহ গঠন, শক্তি উৎপাদন এবং বিভিন্ন শারীরবৃত্তিয় সম্পাদনের জন্য আমিষ (Protein), চর্বি (Lipids/Fat),শর্করা,(Carbohydrates),ভিটামিন (Vitamins) এবং খনিজ লবণ (Minerals) অতীব প্রয়োজনীয়।

Awg#

প্রাণিদেহ কলা বৃদ্ধির জন্য আমিষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমিষ হজম হওয়ার প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে এ্যামাইনো এসিডে রূপান্তরিত হয়ে শরীর ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে থাকে। প্রকৃতিতে ২০ ধরনের এ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়।, এদের মধ্যে মাছের ১০ টি এ্যামাইনো এসিড অতীব প্রয়োজনীয়, যেগুলো মাছ তার শরীরে উৎপাদন করতে পারে না। ফলে সে সমস্ত এ্যামাইনো এসিড বাহির থেকে প্রদত্ত খাদ্যের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়। এ সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিডগুলো হলো- আর্জিনাইন, হিস্টিডাইন, আইসোলিউসিন, লিউসিন, লাইসিন, মিথায়োনাইন, ফিনাইল এ্যালালাইন, থ্রিয়োনাইল, ট্রিপটোফেন এবং ভেলাইন। আমিষ প্রাণী এবং উদ্ভিদ উভয় উৎস থেকেই পাওয়া যায়। তবে প্রাণী উৎস থেকে আমিষ সহজেই হজম হয়। অপরদিকে উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত আমিষের পরিমাণ খুবই কম। তবে প্রাণী এবং উদ্ভিদজাত আমিষের সংমিশ্রণে তৈরি খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মাছের সুষম দেহবৃদ্ধির জন্য ৩০-৩৫% আমিষ থাকা প্রয়োজন। ফিশমিল ও সোয়াবিন মিল মাছের আমিষের প্রধানতম উৎস।

Pw "

চর্বি অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড সরবরাহ করে থাকে, যা মাছের শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে থাকে। অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডসমূহ হলো- মাছের জন্য লিনোলিনিক এসিড ও লিনোলিক এসিড এবং চিংড়ির জন্য কোলোস্টেরোল ও লিচিথিন। মেরিন ফিস লিবার অয়েল, ভুট্টা, নারিকেল, সয়াবিন ইত্যাদি চর্বির উৎস।

kKfv

স্বল্প মূল্যের শর্করা জাতীয় খাদ্য মাছের শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে থাকে। সেলুলোজ জাতীয় শর্করা খাদ্য মাছ সহজে হজম করতে পারে না। কার্প জাতীয় মাছ তার দেহের শক্তি উৎপাদনের জন্য ২৫% শর্করার প্রয়োজন। গমের ভূসি, চালের কুড়া ইত্যাদি শর্করার উদাহরণ।

w2Uwgb

মাছের দেহে শক্তি উৎপাদন, কোষ গঠন, রক্ত জমাট বাঁধা এবং ক্যালসিয়াম হজমে ভিটামিন আবশ্যক। প্রাকৃতিক খাদ্যে ভিটামিন স্বল্প পরিমাণ থাকে, ফলে ভিটামিন সম্পূরক খাদ্যের সাথে বাহির থেকে সরবরাহ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন শাকসব্জি থেকে ভিটামিন পাওয়া যায়।

5wbR j .

মাছের হাঁড়, আইস ও দাঁত গঠনে এবং রক্তে চ ঁসংরক্ষণসহ আরও নানাবিধ কাজে খনিজ লবণ প্রয়োজন। ফিসমিল মাছের খনিজ লবন সরবরাহে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে।

আমাদের দেশে মাছ ও চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত কিছু প্রচলিত খাদ্য উপকরণের ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে এগুলোর মধ্যে উচ্চমানের পুষ্টি উপাদান বিদ্যামান। গবেষণায় প্রাপ্ত কতিপয় খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো-

উপাদান	পুষ্টিমান (%)		
	আমিষ	শর্করা	স্নেহ (চর্বি)
চালের কুঁড়া	১১.৮৮	৪৪.৪২	১০.৪৫
গমের ভুসি	১৪.৫৭	৬৬.৩৬	৪.৪৩
সরিষার খৈল	৩০.৩৩	৩৪.৩৮	১৩.৪৪
তিলের খৈল	২৭.২০	৩৪.৯৭	১৩.১৮
ফিসমিল- এ গ্রেড	৫৬.৬১	৩.৭৪	১১.২২
ব্লাড মিল (শুকনো)	৬৩.১৫	১৫.৫৯	০.৫৬
আটা	১৭.৭৮	৭৫.৬০	৩.৯০
চিটাগুড়	৪.৪৫	৮৩.৬২	-
ক্ষুদিপানা (শুকনো)	১৪.০২	৬০.৮৮	১.৯২
কুটিপানা (শুকনো)	১৯.২৭	৫০.১৯	৩.৪৯

m-3iK 5v‡%¨i Ui;!Y

দৈহিক বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য মাছ ও চিংড়ি পুকুরের পরিবেশ থেকে প্রাণিকণা, তলদেশের পোকা-মাকড়, শুককীট, ছোট ছোট কীটের লার্ভা, তলার কেঁচো, মৃত জৈব পদার্থ ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তা ছাড়া চিংড়ির পিএল বা জুভেনাইলের স্বজাতিভোজীতারোধেও সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োগ অত্যাবশ্যকীয়। পুকুরের পরিবেশে যখন খাদ্যের অভাব দেখা দেয় তখন এদের স্বজাতিভোজীতা বৃদ্ধি পায় এবং সবল চিংড়ি দুর্বলগুলোকে ধরে খায়। এর ফলে ব্যাপক হারে চিংড়ি মারা যেতে পারে। পরিমিত পরিমাণে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে চিংড়ির এ ক্ষতিকর স্বভাব নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

বর্তমানে আমাদের দেশের পুকুর-দীঘি ও উপকূলীয় চিংড়ি ঘেরগুলোতে প্রতি শতাংশ মাছ ও চিংড়ির বার্ষিক গড় উৎপাদন যথাক্রমে ৬ কেজি ও ২-২.৫ কেজি। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগে এ সমস্ত জলাশয়ে আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করে খুব সহজেই ৫ গুণের বেশি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। মাছের মজুদ ঘনত্ব কম থাকলে মাছ প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর বেশি নির্ভর করে থাকে। কিন্তু মজুদ ঘনত্ব যতই বাড়তে থাকবে কৃত্রিম/সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ততই বাড়তে থাকবে। নিচে মাছ ও চিংড়ির ব্যাপক, আধা নিবিড় ও নিবিড় চাষে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখানো হলো।

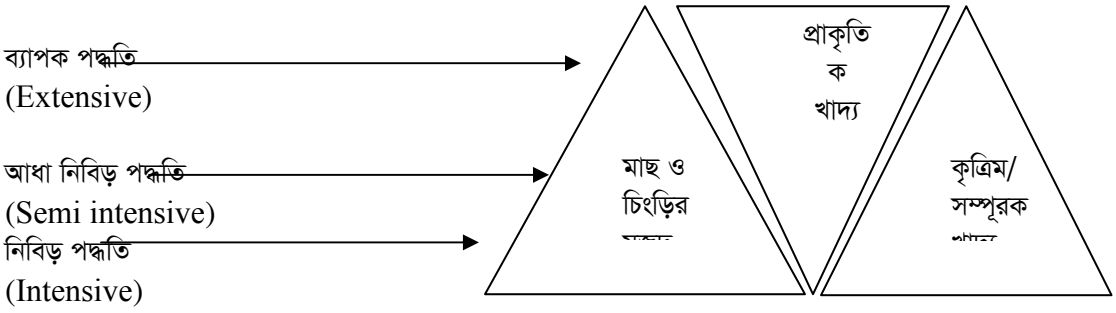

নিম্নে মাছ ও চিংড়ি চাষে সম্পূরক খাবারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-

- অধিক ঘনত্বে মাছ ও চিংড়ি চাষ করা যায়
- অল্প সময়ে মাছ ও চিংড়ি বিক্রয় উপযোগী হয়
- মাছ ও চিংড়ির মৃত্যু হার অনেকাংশে কমে যায়
- মাছ ও চিংড়ি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
- চিংড়ির স্বজাতিভোজিতা রোধ করে
- অল্প আয়তনের জলাশয় হতে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়।

5ৗ%¨ wb ৗP‡b w ‡ P¨ w #$

আমাদের দেশে চাষিরা সম্পূরক খাবার হিসেবে প্রধানত খৈল ও কুড়া ব্যবহার করে থাকেন। এগুলো ছাড়াও প্রায় সারা দেশেই চাষিদের এমন কিছু খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করতে দেখা যায়, যাদের কিছু কিছু আর্থিকভাবে লাভজনক নয়, এমন কি কিছু কিছু পুকুরের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাছ ও চিংড়ির অধিক উৎপাদন। সে কারণে পুকুরে প্রয়োগের জন্য খাদ্য নির্বাচনে বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করা উচিত। নিচে লাভজনকভাবে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য খাদ্য নির্বাচনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় উল্লেখ করা হলো-

- উপাদনসমূহের সহজলভ্যতা
- চাষির আর্থিক সঙ্গতি
- উপকরণসমূহের মূল্য
- মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা
- মাছ ও চিংড়ির পছন্দনীয়
- উচ্চ খাদ্য পরিবর্তন হার

gvS 6 wPsWTi cÖE PwiR%v

সুস্থ সবলভাবে বেঁচে থাকা ও দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির জন্য মাছ ও চিংড়ির খাদ্যে সুষম খাবারের সবগুলো অপরিহার্য কিন্তু এ সব খাদ্য উপাদানের মধ্যে আমিষ সবচেয়ে বেশি মাত্রায় প্রয়োজন। সে কারণে মাছ ও চিংড়ি পুষ্টি চাহিদা বলতে সাধারণভাবে

আমিষের চাহিদা বুঝানো হয়। চর্বি ও খনিজ লবণ কম- বেশি বিদ্যমান থাকে। এ সব আমিষের চাহিদা পূরণ হলে অন্যান্য পুষ্টি উপাদানগুলো খুব একটা অভাব হয় না। মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা এদের বয়স ও প্রজাতির ওপর নির্ভর করে। নিম্নে বয়সভিত্তিক বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদার তালিকা দেয়া-

w w2bO$‡m gv‡Si 5v‡%¨ m ‡bEj Awg‡#i PwR%v

মাছ/প্রজাতি (Fish Species)	আমিষের চাহিদা		
	পোনা (Fry)	অঙ্গুলি পোনা (Fingerlings)	পূর্ণ বয়স্ক (Adult)
১. কমন কার্প (*Cyprinus carpio*)	৪০	৩৮	৩৫
২. রুই (*Labeo rohita*)	৩৫-৪০	৩০	২৫-৩০
৩. কাতলা (*Catla catla*)	৩৫-৪০	৩০	২৫-৩০
৪. ক্যাট ফিস			
ক. চ্যানেল ক্যাট ফিস (*Ictalurus puntatus*)	৪০	৩৫	৩০
খ. মাগুর (*Clarias batrachus*)	৪০	৩২	৩০
গ. আফ্রিকান মাগুর (*Clarias gariepinus*)	৪০	৩৫	৩০
ঘ. পাঙ্গাশ (*Pangasius sutchi*)	৪০	৩৫	৩০
৫. তেলাপিয়া/নাইলোটিকা (*Oreochromis niloticus*)	৩৫-৪০	৩০	২৫
৬. চিংড়ি			
ক. গলদা চিংড়ি (*Microbrachium rosenbergii*)	৩৫-৪০	৩০	৩০
খ. বাগদা চিংড়ি (*Panaeus monodon*)	৩৫-৪০	৩০-৩৫	৩০

5v%¨ BcKi‡.i cEgvb

আমাদের দেশে মাছ অথবা চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত কিছু প্রচলিত খাদ্য উপকরণের ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে উহাদের মধ্যে উচ্চ মানের পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান। গবেষণায় প্রাপ্ত কিছু খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান নিচের টেবিলে উল্লেখ করা হলো-

উপাদনের নাম	পুষ্টিমান (%)		
	আমিষ	শর্করা	স্নেহ
চালের কুঁড়া	১২-১৬	৪০-৪৫	১০-১৫
গমের ভুসি	১৪-১৭	৫০-৬০	৪-৫
সরিষার খৈল	৩০-৩৫	৩৫-৪৫	১০-১২
তিলের খৈল	৩৫-৪০	৩৫-৪০	৮-১০
ফিশমিল- এ গ্রেড	৫০-৫৬	২-৩	৮-১২
ব্লাড মিল	৯০-৯৫	১	১-২
আটা	১৭.৭৮	৭৫.৬০	৩.৯০
চিটাগুড়	৪.৪৫	৮৩.৬২	-
ক্ষুদিপানা	১৪.০২	৬০.৮৮	১.৯২
সয়াবিন খৈল	৪৫-৫৫	৩০-৩৫	৫.১৫
মুরগির নাড়িভূড়ি	৫৫-৬০	২-৩	১২-১৮
চিংড়ির গুঁড়া	৪০-৪৫	৫-৮	৩-৫

BcKi.wb ‡Pb 6 ¨ Rvigvcv

চাষির আর্থিক সামর্থ্য ও পুষ্টি চাহিদা বিবেচনা করে কার্প, পাঙ্গাশ ও চিংড়ির জন্য বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্র খাদ্য তৈরির নমুনা উল্লেখ করা হলো-

KvcRv!?$ g‡Si 5v%¨ V!wi‡! w w2bŒcv%‡bi ¨ Rvi gvcv

উপাদনের নাম	নমুনা-১		নমুনা-২	
	ব্যবহার মাত্রা (%)	খাদ্য (গ্রাম/কেজি)	ব্যবহার মাত্রা (%)	খাদ্য (গ্রাম/কেজি)
ফিশমিশ	-	-	১০	১০০
সরিষার খৈল	৪৫	৪৫০	২৫	২৫০
ধানের কুঁড়া/গমের ভুসি	-	-	২৫	২৫০
আটা/চিটাগুড়	১০	১০০	১০	১০০
মোট	১০০	১০০০	১০০	১০০০

wPswTi 5v%¨ V!wi‡! w w2bŒcv%‡bi ¨ Rvi gvcv

উপাদনের নাম	নমুনা-১		নমুনা-২	
	ব্যবহার মাত্রা (%)	খাদ্য (গ্রাম/কেজি)	ব্যবহার মাত্রা (%)	খাদ্য (গ্রাম/কেজি)
ফিশমিশ	৩০	৩০০	৩০	৩০০
সরিষার খৈল	৪০	৪০০	২৫	২৫০
হাড়/ঝিনুকের গুঁড়া	-	-	৫	৫০
ধানের কুঁড়া/গমের ভুসি	২০	২০০	২০	২০০
আটা	৯	৯০	১০	১০০
চিটাগুড়	১	১০	৫	৫০
খনিজ লবণ ও ভিটামিন	-	১ চা চামচ	-	১ চা চামুচ
মোট	১০০	১০০০	১০০	১০০০

cvnvk g‡Si 5v%¨ V!wi‡! w w2bŒcv%‡bi ¨ Rvi gvcv

উপাদনের নাম	নমুনা-১		নমুনা-২	
	ব্যবহার মাত্রা (%)	খাদ্য (গ্রাম/কেজি)	ব্যবহার মাত্রা (%)	খাদ্য (গ্রাম/কেজি)
ফিশমিশ	১৫	১৫০	১২	১২০
সরিষার খৈল	২৫	২৫০	৩২	৩২০
পশুর রক্ত	৫	৫০	-	-
ধানের কুঁড়া/গমের ভুসি	৫০	৫০০	৫০	৫০০
আটা	৫	৫০	৬	৬০
খনিজ লবণ ও ভিটামিন	-	১ চা চামচ	-	১ চা চামুচ
মোট	১০০	১০০০	১০০	১০০০

মিশ্র খাদ্য ছাড়াও পুকুরে যদি গ্রাসকার্প ও সরপুঁটি থাকে তবে নিয়মিত ক্ষুদিপানা, কুটিপানা, নরম ঘাস, কলার পাতা, পেঁপে পাতা, আলুর পাতা, সজনে পাতা, নেপিয়ার ঘাস, শীতকালীন শাক-সবজি ইত্যাদি দিতে হবে। গ্রাসকার্প প্রতিদিন এর দেহের ওজনের প্রায় ৪০-৪৫% পর্যন্ত সবুজ খাদ্য খেতে পারে।

5v%¨ i·cvHi Rvi (GdwmAvi) (Feed Conversion Ratio- FCR)

খাদ্য রূপান্তর হার হলো খাদ্য প্রয়োগ এবং খাদ্য গ্রহণের ফলে জীবের দৈহিক বৃদ্ধির অনুপাত। অর্থাৎ ১ কেজি মাছ পেতে যত কেজি খাবার খাওয়াতে হয়, তাহাই খাদ্য রূপান্তর অনুপাত।

এফসিআর= প্রদানকৃত খাদ্য / দৈহিক বৃদ্ধি

দৈহিক বৃদ্ধি = আহরণকালীন মোট ওজন - মুজদকালীন মোট ওজন

ধরা যাক, একটি জলাশয়ের মজুদকালীন মাছের মোট ওজন ছিল মোট ১ কেজি। নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ করে ৬ মাস পর আহরণকালে মোট ১৫ কেজি মাছ পাওয়া গেল এবং এই ৬ মাসে মোট ২১ কেজি খাদ্য প্রয়োগ করা হলো।

সুতরাং এফসিআর = ২১ / ১৫-১ = ১.৫

5v%¨ c$wM gvcv

মাছের বেঁচে থাকা, দৈহিক বৃদ্ধি ও প্রজনন কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। এর এই খাদ্যের মাত্রা নির্ভর করে পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলীর অনুকূল অবস্থার ওপর। তাপমাত্রা বাড়লে বিপাকীয় কার্যক্রমের হার বেড়ে যায়। ফলে খাদ্য চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। একইভাবে তাপমাত্রা কমলে খাদ্য চাহিদা ও তুলনামূলকভাবে হ্রাস পায়। পানির পিএইচ মাছের খাদ্য চাহিদার ওপর প্রভাব ফেলে। অম্লত্ব বাড়লে খাদ্য চাহিদা কমে যায়। পিএইচ মাত্রা ৭-৮.৫ এর মধ্যে মাছের খাদ্য চাহিদা বেশি থাকে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন মাত্রা বাড়লে মাছের খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং অক্সিজেন মাত্রা কমলে খাদ্য চাহিদা হ্রাস পায়। সুতরাং মাছ ও চিংড়ির সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

cvwbi w w2bO.vU‡.i 6<vbvgv 6 AbEj gvcv}

উপাদানের নাম	ওঠানামার (পিপিএম)	অনুকূল মাত্রা (পিপিএম)
অক্সিজেন	৩.৫-১২.৬২	৫-৮
কার্বন ডাই-অক্সাইড	০-৯.৩০	০-১৫
পিএইচ	৬-৯.৫০	৭-৮.৫
মোট ক্ষারত্ব	২১৫-৩৬৫	২০০-৫০০
ফসফেট	০.০৪-০.৩৮	-
নাইট্রেট	০.৪৩-১.৭৪	-
সালফেট	৩.৭০-৯.৯০	-

মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের হার নির্ভর করে মূলত পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা, চাষ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যের অবস্থা ও পুষ্টিমান ইত্যাদি বিষয়ের ওপর। বড় মাছ ও বড় চিংড়ির চেয়ে ছোট অবস্থায় এদের খাদ্য চাহিদা অনেক বেশি। সে কারণে উৎপাদন পুকুরে প্রথম দিকে বেশি মাত্রায় খাবার প্রয়োগ করতে হয়। তবে মাছ ও চিংড়ি বড় হওয়ার সাথে সাথে খাদ্য প্রয়োগ হার কমে গেলেও মোট খাদ্যের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। নিচের সারণিতে উন্নত ব্যাপক পদ্ধতির চাষ ব্যবস্থাপনায় কার্প পাঙ্গাশ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে দৈনিক খাদ্য প্রয়োগের নমুনা মাত্রা উল্লেখ করা হলো–

কার্পজাতীয় মাছের দৈহিক ওজনের সাথে খাদ্য প্রয়োগের সম্পর্ক

গড় ওজন (গ্রাম)	দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ (%)
১-৫	১০

৫-১০	৫
১০-৫০	৪
৫০-৫০০	৩

পাঙ্গাশ মাছের দৈহিক ওজনের সাথে খাদ্য প্রয়োগের সম্পর্ক

গড় ওজন (গ্রাম)	দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ (%)
১-৩	১৫-১২
৩-১০	১০-৮
১০-৫০	৭-৬
৫০-১০	৬-৫
৩০০>	৫-৩

চিংড়ির দৈহিক ওজনের সাথে খাদ্য প্রয়োগের সম্পর্ক

গড় ওজন (গ্রাম)	দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ (%)
০.২-১	১৫-১৩
১-২	১৩-১১
২-৩	১১-৯
৩-৫	৯-৭
৫-১৩	৭-৫
১৩-২০	৫-৩
২০-৩০	৩-২.৫

m-3iK 5v%¨ V!wi

বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে খুব সহজেই মাছ ও গলদা চিংড়ির খাদ্য তৈরি করা যায়। চাষি নিজের হাতেই তা করতে পারেন। সম্ভব হলে মিনসিং মেশিন ব্যবহার করেও খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে। নিচে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে প্রয়োগের জন্য মিশ্র খাদ্য তৈরির পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

- প্রয়োজনীয় খৈল কমপক্ষে ১২-২৪ ঘন্টা পূর্বে দ্বিগুণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে উপর থেকে ভাসমান তৈলযুক্ত পানি ফেলে দিতে হবে।
- চালের কুড়া,ভূষি ও ফিশমিল ভালভাবে চালুনি করে নিতে হবে
- চালের খুদ ব্যবহার করা হলে সেদ্ধ করে নিতে হবে
- সমস্ত উপকরণগুলো একটি পাত্রে নিয়ে ভালভাবে মেশাতে হবে
- আটা পরিমাণ মত পানিতে ফুটিয়ে আঠালো পদার্থ তৈরি করতে হবে
- উপকরণগুলো আঠালো পদার্থ দ্বারা মেখে কাঁই তৈরি করে ছোট ছোট বল বানাতে হবে।

m-3iK 5v%¨ cÖ$M

মাছ দিনের বেলায় খাদ্য গ্রহণ করে। সে কারণে মাছচাষের পুকুরে প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় খাবার সমান দু'ভাগ করে একভাগ সকাল ১০-১১টায় এবং অপর ভাগ বিকেল ৩-৪টায় প্রয়োগ করা হয়। খাদ্যের অপচয় রোধ এবং পানির পরিবেশ ভাল রাখার জন্য খাদ্যদানীতে খাদ্য প্রয়োগ করাই উত্তম। কার্পজাতীয় মাছকে খাদ্য দেয়ার সময় এটি পানির উপরি তল হতে ৩০ সে.মি. নিচে এবং পাঙ্গাশ মাছকে খাদ্য দেয়ার সময় পানিতে মধ্যস্তরে খাদ্যদানী স্থাপন করা উচিত। কোন কারণে খাদ্যদানী ব্যবহার করা সম্ভব না হলে প্রতিদিন পুকুরের তলায় কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় খাবার প্রয়োগ করতে হবে। অপর দিকে গলদা চিংড়ি নিশাচার। দিনের আলোর চেয়ে এরা অন্ধকারে চলাচল ও খাদ্যগ্রহণ করতে পছন্দ করে। সে জন্য কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষের পুকুরে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় খাবার দু'ভাগে ভাগ করে একভাগ সকাল ৬টার আগে এবং আরেকবার সন্ধ্যা ৬টার পরে প্রয়োগ করতে

হয়। পূর্বের খাবারকে আবার দু'ভাগ করে অর্ধেক খাদ্যদানীতে এবং বাকি অর্ধেক পুকুরের কায়েকটি জায়গা পাটকাঠি দ্বারা চিহ্নিত করে সেখানে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, চিংড়ির জন্য খাদ্য দেয়ার সময় পুকুরের তলদেশ থেকে এক ফুট উপরে খাদ্যদানী স্থাপন করতে হবে।

m ÆE5v%¨ cÖ$M

গ্রাস কার্প ও সরপুঁটির খাদ্য বাঁশ বা অন্য কোন উপযুক্ত উপকরণ দিয়ে তৈরি চৌকোণাকার ভাসমান ফ্রেমের (ভবববফরহম ৎরহম) মধ্যে দেয়া ভাল। ফ্রেমটি পাড়ের ১-২ মিটার দূরত্বে স্থাপন করতে হয়। ৩০ শতাংশ পুকুরের জন্য ফ্রেমের সাধারণ মাপ হচ্ছে ১ বর্গমিটার। পাতা জাতীয় উদ্ভিদ টুকরো করে ফ্রেমের মধ্যে দিতে হয়। কলাপাতা ব্যবহার করা হলে কুচি কুচি করে দেয়া উচিত। খাদ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে আবার খাদ্য দিতে হবে।

cÖw%‡bi 5v%¨ cwigv. wb.$ cNw!@

প্রতিদিন মাছ ও চিংড়ির জন্য যে খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়, তা নিম্নলিখিত সূত্রের মাধ্যমে বের করা যেতে পারে। প্রতিদিনের খাবার চাহিদা = ডীঘীঝীজ

এখানে, ড (গ্রাম) = নির্দিষ্ট সময়ে মাছ/চিংড়ির গড় ওজন
ঘ = মজুদকৃত মাছের সংখ্যা
ঝ (%) = মাছ ও চিংড়ির বেঁচে থাকার হার
জ (%) = খাদ্য প্রয়োগের হার

B%vRi.

মোট মাছ মজুদ ঃ ১ হেক্টর পুকুরে (ঘ) = ১০,০০০
মাছের গড় ওজন ঃ ৩০ দিন পর (ড) = ১৫ গ্রাম
মাছ বেঁচে থাকার হার (ঝ) = ৯০%
খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা (জ) = ৬%

প্রতিদিনের খাবার চাহিদা = WxNxSxR
= ১৫ গ্রামঢ১০,০০০ঢ০.৯ঢ০.০৬ প্রতিদিন
= ৮,১০০ গ্রাম প্রতিদিন
= ৮.১ কেজি প্রতিদিন

মোট খাদ্য প্রয়োজন (১৫ দিনের জন্য) = ৮.১ কেজি প্রতিদিন ঢ১৫ দিন
= ১২১.৫ কেজি

5v%¨%vb?

খাদ্যদানী (ট্রে)-তে খাবার দিলে খরচ বাঁচে এবং খাদ্যের ব্যবহার যথার্থ হয়। তা ছাড়া খাদ্যের পরিমাপ করাও সহজ হয়।

5v%¨%vb? V!wi

এটির আকার ১ বর্গমিটার হতে পারে। বাঁশ বা কাঠের ফ্রেমের নিচে মশারির কাপড় লাগিয়ে ধর্মজালের মতো করে তা তৈরি করা যায়। ফ্রেমটির উচ্চতা ১০ সে.মি রাখা উচিত। ৩০ শতাংশ পুকুরে ২টি, ৬০ শতাংশ পুকুরে ৪টি এবং ১০০ শতাংশে ৬টি খাদ্যদানী স্থাপন করলেই চলে। খাদ্যদানী ব্যবহার করা হলে তা নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে। তবে প্লাস্টিক বা টিনের পাত্র ব্যবহার করাই উত্তম তাতে মাছের মুখে আঘাত লাগবে না।

5v%¨ cÖ$‡Mi m!K'!v

- প্রতি সপ্তাহে পোনার দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে খাদ্যের প্রয়োগ মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।
- পুকুরের পানি অতিরিক্ত সবুজ হলে খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।
- সরিষারখৈলে পুষ্টিবিরোধী উপাদান গ- কোসাইনোলেট থাকে যা মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। তাই সরিষার খৈল ১২-১৪ ঘন্টা ভিজিয়ে ব্যবহার করলে পুষ্টি বিরোধী উপাদানের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।
- প্রতিদিন একই সময়ে একই স্থানে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

5v%¨ U%vgRv!Ki.

সম্পূর্ণ বা দানাদার খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণ বা তৈরি খাবার গুদামজাতকরণের প্রয়োজন হয়। গুদামজাতকরণের সময় ওজন বা গুণগতমান এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে। খাদ্য সংরক্ষণের জন্য সুষ্ঠুভাবে গুদামজাতকরণ আবশ্যক।

নিম্নলিখিত নিয়মসমুহ গুদামজাতকরণের সময় খাদ্যের গুণগতমান এবং ওজনকে ক্ষতিগ্রস্ড় করে-

- আর্দ্রতার প্রভাব ঃ খাদ্যে আর্দ্রতার পরিমাণ ১০% এর বেশি থাকলে ছত্রাক/পোকা-মাকড় জন্মাতে পারে।
- অপেক্ষিক আর্দ্রতা ঃ ৬৫% এর বেশি থাকলে ছত্রাক/পোকা-মাকড় জন্মাতে পারে।
- তাপমাত্রা ঃ অতিরিক্ত তাপমাত্রায় খাদ্যের পুষ্টিমান ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। পোকামাকড়সমূহ ২৬-৩৭°প তাপমাত্রায় খুব ভাল জন্মাতে পারে এবং এরা খাদ্য খেয়ে ও তাদের মলমূত্র দ্বারা ব্যাক্টেরিয়া ছড়িয়ে থাকে।
- অক্সিজেন সরবরাহ ঃ অক্সিজেন খাদ্যের রেন্সিডিটি (চর্বির জারণ ক্রিয়া) কার্যক্রমে এবং ছত্রাক ও পোকা-মাকড় জন্মাতে সহায়তা করে।
- এনজাইম (পাঁচক রস) ও জারণের ফলে খাদ্যের গুণগতমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- চুরি ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে ও খাদ্য ক্ষতিগ্রস্ড় হতে পারে।

mw<K U%vgRv!Ki. cNw!

(ক) MKbv 5v%¨ 6 5v%¨ Bcv%vb

- পরিষ্কার, শুকনা, নিরাপদ এবং পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ঘরে রাখতে হবে।
- সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখা যাবে না।
- মাটি থেকে ১২-১৫ সে.মি. উপরে এবং সর্বোচ্চ ৬ টি বস্তা একটির উপর আর একটি রাখা যেতে পারে।
- পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য বস্তার নিচে এবং আশপাশে ছাই ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে।
- তিন মাসের বেশি গুদামজাতকরণ অবস্থায় রাখা যাবে না।

(খ) Av%¶2Rv 5v%¨ B,cv%b

- তাজা ছোট মাছ (ঃৎধংয ভরংয) হলে তাৎক্ষণিক খাওয়াতে হবে, অন্যথায় রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে হবে।
- তৈলাক্ত/চর্বিযুক্ত খাদ্য কালো রঙের পাত্রে নিম্ন তাপমাত্রায় রেখে দিতে হবে।
- ভিটামিন ও খনিজ লবণসমূহ বাতাস ও আলোকবিহীন পাত্র করে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে হবে।

5v%¨ c$‡M †iKA'msi7.

সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণের ফলে একজন চাষি বুঝতে পারে যে বর্তমানে বা অতীতে যে খাবার দেয়া হয়েছে তা কতটুকু কার্যকর হয়েছে। ফলে পরবর্তী সিদ্ধান্ড় নিতে চাষিকে সাহায্য করবে।

নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

- পুকুরের পরিচিতি নম্বর
- মজুদকৃত মাছের সংখ্যা
- মাছের উৎস
- মজুদ ঘনত্ব
- মজুদকৃত মাছের গড় আকার
- ব্যবহৃত খাদ্যের ধরন
- খাবারের হার
- প্রতিদিন খাবারের সময়
- সর্বশেষ মাছের গড় ওজন
- মাছ বৃদ্ধির হার
- মাছ জীবিতের হার
- মাছ আহরণের পরিমাণ

- খাদ্য রূপান্তর হার (FCR)

---

m-3†K 5‡%¨
m-3†K 5‡%¨ c‡$‡Mi Ui‡EY
%j?$ Ab‡Ejb?

এ অনুশীলনীর উদ্দেশ্য হচ্ছে মাছ চাষে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি।
K‡Ri 4viv

১. প্রশিক্ষণার্থীদের দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হবে।
২. প্রত্যেক গ্রুপে প্রশিক্ষণার্থীগণ আলোচনা করে মাছ চাষে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের গুরুত্বসমূহ চিহ্নিত করবেন।
৩. চিহ্নিত বিষয়গুলো ফ্লিপ চার্টে লিখে দলের সামনে উপস্থাপন করবেন।

সময়- ১০ মিনিট

,,

=Ïg‡j¨i wc‡jU †gwkb, 5v%¨ V!i?, msiD. 6 c‡$wM †Kakj

বিগত ১৯৯৪ সনে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সম্পূর্ন দেশিয় পদ্ধতিতে স্থানীয় মালামাল ব্যবহার করে অগ্রসর চাষি পর্যায়ে ব্যবহারযোগ্য মাছের দানাদার খাদ্য/ ভেজা পিলেট খাদ্য তৈরীর প্রথম মেশিন উদ্ভাবন করে এবং ১৯৯৮ সনে তার আরও উন্নত মডেল উদ্ভাবন করা হয়। আদর্শ সাইজের ১০ হর্স পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন পিলেট মেশিনটির উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি ঘণ্টায় ১০০-১৫০ কেজি এবং বাজার মূল্য ২৫,০০০-৩০,০০০ টাকা। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে সহজ প্রযুক্তিতে দেশিয় কাঁচামাল ব্যবহার করে স্বল্পমূল্যের খামার উপযোগী সেমি-অটো পিলেট মেশিন উদ্ভাবন করা হয় যা দিয়ে শুষ্ক পিলেট বা দানাদার শুষ্ক খাবার তৈরী করা যায়। ২০ হর্স পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন সেমি-অটো পিলেট মেশিনটিতে প্রতি ঘণ্টায় ১৫০-২০০ কেজি শুষ্ক দানাদার বা পিলেট খাদ্য তৈরী করা যায় এবং বাজার মূল্য ৬৫,০০০-৭০,০০০ টাকা। মটরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সেইসাথে মেশিন দুইটির দৈহিক কাঠামো পরিবর্তন করে এর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। তাছাড়া মেশিন দুইটি থ্রিফেজ/টু ফেজ ও ২২০ ভোল্ট বিদ্যুতের মটর এবং ডিজেল ইঞ্জিন দিয়েও একনাগারে ২৪ ঘণ্টা চালানো যায়।

চিত্র: স্বল্পমূল্যের পিলেট মেশিন

‡ miKvi? B‡%¨vQv K!‡&B{‡w ! wc‡jU †gwkb

সম্প্রতি যশোর, বগুড়া, মেহেরপুরসহ বিভিন্ন জেলায় বেসরকারী উদ্যোক্তা কর্তৃক পিলেট মেশিন উদ্ভাবিত বা সংযোজিত হয়েছে। কেবল বড় খামারী নয়, অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্য এবং ব্যবহারবিধি সহজ বিধায় অনেক মাঝারী মাপের খামারীও এখন নিজেরাই এই সংযোজিত মেশিন দ্বারা নিজেরাই মাছের খাবার তৈরী করে নিচ্ছেন। এর সুফল অনেক–

১. যে কোন পিলেট খাবারের ন্যায় এই খাবারেও অপচয় বহুলাংশে হ্রাস পায় ফলে খাদ্য ব্যয়ও হ্রাস পায়।
২. অপচয় হ্রাসের ফলে পুকুরের পানি অপেক্ষাকৃত বেশী পরিস্কার থাকে। মাছের পরিবেশ সুস্থ রেখে অধিক উৎপাদনে সহায়তা দেয়।

৩. নিজের পছন্দমত বা প্রয়োজনমত উপকরণ দিয়ে যখন প্রয়োজন তখনই খাবার তৈরী করে নেয়া যায়।
৪. সংযোজিতব্য যন্ত্রপাতি প্রায় সর্বত্র স্থানীয়ভাবেই পাওয়া যায়।
৫. সংযোজিত এই মেশিন সহজে মেরামত বা সংস্কার করা যায়।
৬. সর্বোপরি, এর মাধ্যমে তৈরী খাবারের উৎপাদন ব্যয় কম বিধায় মাছচাষীর মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

wc‡jU 5v%¨ msiD.

- শুকনা পিলেট খাদ্য বায়ুরোধী প্লাস্টিকের বস্তায় কোন পাত্রে মুখ বন্ধ করে ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে
- মাঝে মাঝে সংরক্ষিত পিলেট খাবার পুনরায় রোদে শুকিয়ে রাখা উচিত
- গুদাম ঘরে সংরক্ষিত পিলেট খাদ্য মেঝেতে না রেখে তা পাটাতনের উপরে রেখে সংরক্ষণ করতে হবে
- সংরক্ষণকৃত পিলেট খাদ্য ১-২ মাসের মধ্যে ব্যবহার করে ফেলা উচিত। তবে খাদ্যে এন্টিফাংগাল এজেন্ট/এন্টি-অক্সিডেন্ট ব্যবহার করলে তা ৩-৪ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

bgE$b, AvswkK AvRi. 6 cE gRE

উদ্দীপক কার্যক্রম

এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো অংশগ্রহণকারীদের মাছচাষে আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদের গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করা।

wb‡%kKv

অধিবেশনের পূর্বেই ১ ও ২ নং ক্রমানুসারে ফ্লিপচার্টটি তৈরি করে রাখতে হবে-

১. ফ্লিপচার্টের প্রথম পৃষ্ঠায় বর্গাকারে বা আয়তাকার একটি জায়গা নির্ধারণ ও চিহ্নিত করুন এবং ৫টি মাছের ছোট ছবি আলাদা আলাদা করে কেটে রাখুন। এ পৃষ্ঠার উপরে বর্ষা ঋতুর কার্ডটি আটকিয়ে দিন।
২. ফ্লিপচার্টের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একই আয়তনের জায়গা দু'টি বড় মাছের ছবি, একটি মধ্যম মাছের ছবি ও একটি ছোট মাছের মোট চারটি ছবি লাগিয়ে দিন। এ ছাড়াও এ পৃষ্ঠার উপরে হেমন্তের ঋতু কার্ডটি লাগিয়ে দন।

Bc=¯’vcbK¨‡ji Kv/Ug-

১. ৫ জন প্রশিক্ষণার্থী দ্বারা আলাদাভাবে ১ নং ক্রমে প্রস্তুকৃত ছোট মাছের ছবিগুলো আঠা দিয়ে আটকিয়ে দিতে বলুন এবং ব্যাখ্যা করুন যে বর্ষাকালে এ পুকুরে পোনা ছাড়া হলো ও পদ্ধতিগতভাবে পুকুর ব্যবস্থাপনা শুরু করা হলো। এভাবে শরৎ পেরিয়ে হেমন্ত হলো। পুকুরের মাছের কি অবস্থা হলো তা দেখানোর জন্য ফ্লিপচার্টের ২য় পৃষ্ঠা প্রদর্শন করুন।
২. ফ্লিপচার্টের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখা যাবে যে গত তিন থেকে চার মাসে দু'টি মাছ বেশ বড় হয়েছে যা এখনই ধরার উপযোগী, একটি মাছ মোটামুটি বড় হয়েছে এবং একটি মাছ তেমন বড় হয়নি। এ ছাড়াও পুকুরে মাছ ছাড়া হয়েছিল ৫টি তবে এখন পাওয়া যাচ্ছে ৪ টি। একটি নিশ্চয় মারা গিয়েছে। এখন যদি বড় মাছ দুটি ধরা হয় তবে পুকুরে কয়টি মাছ থাকবে এবং কতটি মাছ থাকা উচিত। কাঙ্ক্ষিত মাছ রাখতে হলে কি করতে হবে? আরও তিনটি মাছের পোনা ছাড়তে হবে।

এ ক্ষেত্রে বড় মাছ দু'টি ফ্লিপচার্ট থেকে সরিয়ে আরও তিনটি ছোট মাছের ছবি আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে।
এভাবেই পুকুরে আংশিক আহরণ ও পুনঃ মজুদের গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে বোঝানো সহজ হবে।

bgE$b, AvswkK AvRi. 6 cEgRE

নমুনায়ন হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে মাঝে মাঝে পুকুরে জাল টেনে পুকুরে মোটামুটি সকল মাছের মোট ওজন ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

bgE$b Kivi cÖvRb?$!v

(১) পুকুরের মোট মাছের ওজন জানা।
(২) মাছের বৃদ্ধি হার জানা এবং প্রয়োগকৃত খাদ্যমান সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নেয়া।
(৩) মাছকে কি হারে খাওয়া দেয়া দরকার তাহা নিরূপণ করা।
(৪) মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।
(৫) রোগাক্রান্ত মাছের রোগ নির্ণয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

bgbE$‡bi mE4v 6 AmE4v

সুবিধা

(১) পুকুরের তলায় জমাকৃত ক্ষতিকর বিষাক্ত গ্যাসসমূহ মুক্ত হয়।
(২) তলায় বিদ্যমান বিভিন্ন পুষ্টি উপাদন পানির সাথে মিশে মাছের প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদনে সহায়তা করে।
(৩) রাক্ষুসে বা বাজে মাছ পুকুরে ঢুকছে কিনা বোঝা যায়।
(৪) মাছের ব্যায়াম হয়।
(৫) পানিতে অক্সিজেন মিশে।

অসুবিধা

নমুনাকরণের ফলে পুকুরের মাছ সম্পর্কে অন্যান্যরা জানতে পারে, ফলে চুরির সম্ভাবনা থাকে।

bgbE$‡bi mg$ wKS^ ‡ P¨ v #$

(১) নমুনায়নের সার্বিক তথ্য পেতে হলে প্রতিটি প্রজাতির মোট সংখ্যার ৫-১০% মাছ ধরতে হবে।
(২) নমুনায়নের ক্ষেত্রে ছোট-বড় সব সাইজের মাছ নিয়ে নমুনাকরণ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
(৩) নমুনায়নের ক্ষেত্রে বেড় জাল ব্যবহার করা ভাল। তবে বেড় জালের অভাবে ছোট পুকুরের ক্ষেত্রে ঝাঁকি জাল ব্যবহার করা যাবে, তবে সে ক্ষেত্রে পুকুরের বিভিন্ন জায়গা থেকে মাছ ধরে নমুনাকরণ করতে হবে।
(৪) প্রত্যেক নমুনায়নে বেড় জাল দুই বারের বেশি কোন ভাবেই টানা ঠিক নয়।
(৫) মাছ মজুদের এক থেকে দুই মাস পর অর্থাৎ মাছগুলো বড় হলে নমুনাকরণ শুরু করতে হবে এবং প্রত্যেক মাসে একবার করে নমুনায়ন করতে হবে।

AvswkK AvRi.

আংশিক আহরণ হলো বাজারজাতযোগ্য বড় মাছগুলো সঠিক সময়ে ও পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা। আংশিক আহরণের জন্য মাছের আকার, সময় ও পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে আহরনের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। মাছ আহণের সাধারণ বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ -

- মাছের আকার ও ওজন
- জীবভর
- ঝুঁকি
- মাছের বাজারদর

K) gv‡Si AvKvi 6 6Rb

স্বভাবগতভাবে মাছ/চিংড়ি ঝাঁকে চলার কারণে সমস্ত মাছের বৃদ্ধি সমান হয় না। তাই মাছচাষে অর্থনৈতিকভাবে লাভের জন্য বড় মাছগুলোকে আহরণ করে ছোটগুলোকে বড় হওয়ার সুযোগ করে দেয়া উচিত। এ জন্য যখনই -

রুই,কাতলা, মৃগেল, কমন কার্প, সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, মাছসমূহ	= ৭৫০ গ্রাম
সরপুঁটি ও তেলাপিয়া	= ৬০-৯০ গ্রাম
গলদা চিংড়ি	= ৩০-৭০ গ্রাম

উল্লিখিত ওজনের বেশি ওজন হলেই মাছ ও চিংড়ি আহরণ করা উচিত।

5) R? 2i

মাছের জীবভর হলো পুকুরে উপস্থিত সমস্ত মাছের ওজন। মাছ জীবভরের ওপর ভিত্তি করে আহরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জীবভর কখনই প্রতি শতাংশে ৭.৫ কিলোর বেশী রাখা উচিত নয়। এতে পুকুরের পানির পরিবেশের ভারসাম্যতা নষ্ট হতে পারে, রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। তাই যখনই জীবভর প্রতি শতাংশে ৭.৫ কিলোর বেশি হবে তখনই বড় মাছগুলো আহরণ করা উচিত।

cbgRE

বেশি উৎপাদন পেতে হলে পুকুরের মাছ ও চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা চক্র সারা বছর ধরে চালু রাখতে হবে। উৎপাদন চক্র চালু রাখার জন্যে যখনই যে প্রজাতির যতগুলো মাছ বা চিংড়ি আহরণ করা হবে সে প্রজাতির ততগুলোর মাছ ও চিংড়ি এবং ১০-১৫% অতিরিক্ত পোনা বা জুভেনাইল প্রয়োজনবোধে মজুদ করতে হবে। সাধারণত ১০% পোনা মাছ বা জুভেনাইল মারা যেতে পারে। এ বিবেচনায় অতিরিক্ত চারা পোনা বা জুভেনাইল ছাড়তে হয়। অর্থাৎ যদি ১০০টি মাছ বা চিংড়ি ধরা হয় তবে ১১০-১১৫ টি চারা পোনা বা জুভেনাইল ছাড়তে হবে। এ মজুদ পদ্ধতিই হলো পুনঃ মজুদ। এ জন্যে মাছ আহরণের পূর্বেই চারা পোনা বা জুভেনাইলের প্রাপ্যতা যাচাই করে দেখা প্রয়োজন।

প্রকল্প কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

<u>cwi ?D.</u>

পরিবীক্ষণ বলতে বুঝায়-

- পরিচালিত কার্যক্রমের অগ্রগতি (গৃহীত উদ্যোগ, প্রচেষ্টা, কার্যসূচি) পর্যালোচনা
- পরিচালিত কার্যক্রমের প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে ঈপ্সিত ফলাফলের তুলনা করা
- প্রয়োজনে ঈপ্সিত ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহন করা
- এ সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ করা
- তথ্য প্রক্রিয়াজাত করা
- সিদ্ধান্ত গ্রহনের লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং
- সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য তা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা

gj¨v\$b মূল্যায়ন বলতে বুঝায়-

- মূল্যায়নের প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে বা যাবে কিনা তা নির্ধারণ
- প্রাপ্ত ফলাফল যাচাই এবং তার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ
- প্রয়োজনে প্রকল্পের উদ্দেশ্যে, প্রত্যাশিত ফলাফল মাত্রা এবং কর্মপন্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে

cwi ?D. 6 gj¨v\$‡bi !^bvZ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নে দেয়া হ'ল

	cwi ?D.	gj¨v\$b
সংজ্ঞা	কোন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগ,কর্ম-প্রচেষ্টা, কার্যসূচি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদন করা হচ্ছে কিনা এবং প্রত্যাশিত ফলাফল ঈপ্সিত উদ্দেশ্যে অর্জনের পথে এগুচ্ছে কিনা সে বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবিরতভাবে বা সময়ে সময়ে পর্যালোচনা ও সমীক্ষা পরিচালনা করাকে পরিবীক্ষণ বলে।	প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেবলীর আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা, দক্ষতা, কার্যকারিতা এবং প্রভাব নিরুপণ করাকে মূল্যায়ন বলে।
প্রধান লক্ষ্য	অগ্রগতিকে মূল ধারায় রাখা বাস্তবায়নকালে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা যাচাই বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ নির্দেশনা	সামগ্রিক ফলাফল, কার্যকারিতা ও প্রভাব মূল্যায়ন করা প্রকল্প প্রণয়নের যৌক্তিকতা নির্ণয়প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে যে সমস্ত বিষয়াদি জানা যায় তা চিহ্নিত করা এবং ভবিষ্যৎ প্রকল্প প্রণয়নে তার প্রয়োগ
প্রধান বিষয়	প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পদের সঠিক ব্যবহার করা	প্রকল্পের যৌক্তিকতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা, স্থায়িত্বশীলতা, প্রভাব এবং উদ্দেশ্যে অর্জনের বিষয় নিরীক্ষা করা
সময়	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে	নির্দিষ্ট সময়েঃ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে বেইজ লাইন) প্রকল্প চলাকালে প্রকল্প সমাপ্তিলগ্নে ও প্রকল্প সমাপ্তির পরবর্তীতে (প্রভাব নিরুপণ)

cwi ?D. 6 gj-¨vq‡bi m-3K©

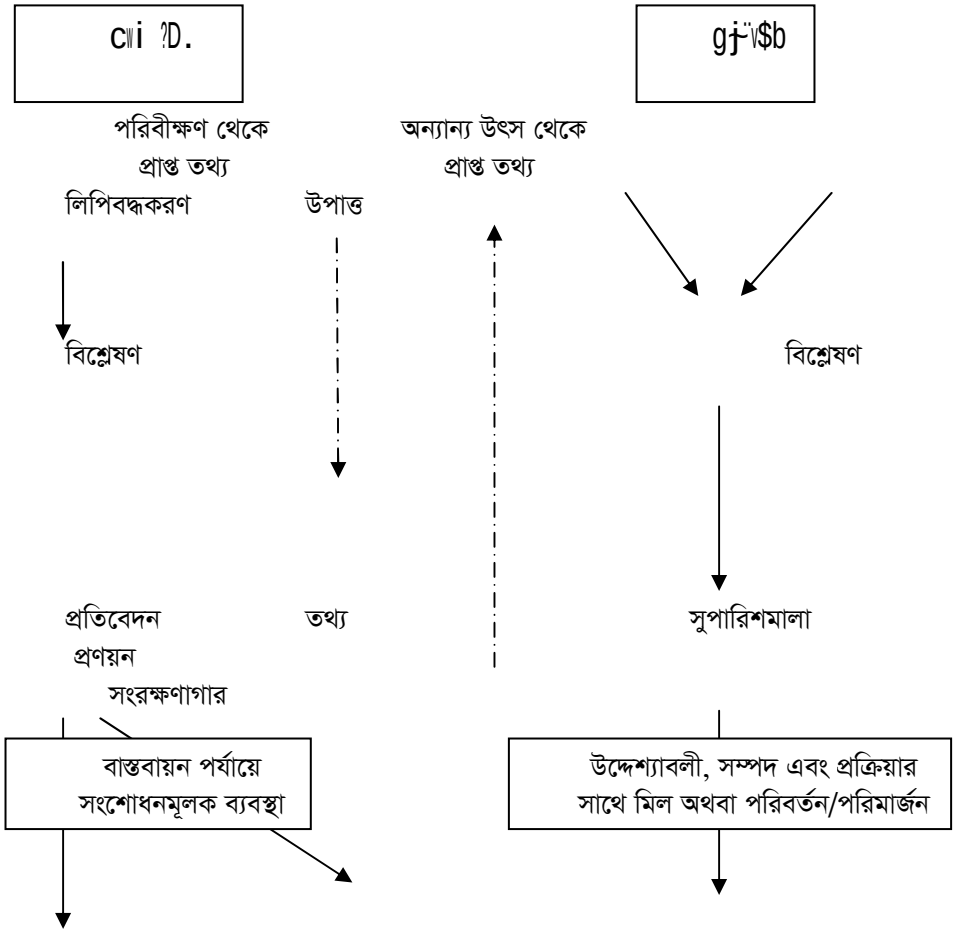

যদি এলাকাবাসী নিজেরাই নিজেদের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং অগ্রগতি বিশ্লেষণ করেন তবে তাকে অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ বলে।

AskMÖnYgj-K cwi ?D‡.i cÖ‡qvRb?$!v

- পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হচ্ছে কিনা তা জানা যায়
- নিয়মিত কাজের অগ্রগতি জানা যায়

- নিজ নিজ দায়িত্ব কতটুকু পালিত হলো তা অবহিত হওয়া যায়
- দলগতকাজে কিভাবে একে অন্যকে সহায়তা করছেন তা জানতে পারা যায়
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে তা সমাধান করা যায়

AskMÖbgjK gj¨vqb.€

প্রকল্পের সুফলভোগী জনগণ যদি নিজেরাই নিজেদেও কার্যক্রম মূল্যায়ন করেন তবে সেটি অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন।

AskMÖbgjK gj¨vq‡.i cÖwRb?$!v

অংশগ্রহনমূলক মূল্যায়নের ফলে জনগণ বুঝতে পারে-

- কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কী কী সফলতা এসেছে
- কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে এবং কেন
- কোন কোন ক্ষেত্রে আশানুরুপ ফল পাওয়া যায় নাই এবং তা কেন
- ভবিষ্যৎ কার্যক্রম আরো গতিশীল ও যথোপযুক্ত করতে হলে কি কি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে

cwi ?D. 6 gj¨v$b ¨ =v@

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা হলো একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা যার দ্বারা প্রকল্পের অগ্রগতি জানার জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করা হয়। এটি শুধু তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম নয় বরং তথ্য বিশ্লেষন প্রক্রিয়ার দ্বারা ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ক্রম। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যবস্থাপক যথার্থ ও সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন। ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কার্যকারিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং চংড়ান্ত পর্যাযে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জিত হয়।

cwi ?D. 6 gj¨v$b ¨ =vi *wU †Dc

১. <u>cÖwnK!v@</u> প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেও সাথে কতটা মিল আছে তা বিচার বিশ্লেষন করা অথবা অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে সক্ষম হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সীমিত পর্যায়ের হতে পারে। যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অথবা খাত বা সেক্টরার হতে পারে, যা দেশবাসীর কাঙ্খিত চাহিদা পূরণ করে।

২. **<u>দক্ষতাঃ</u>** প্রকল্প বা কর্মসূচীতে গৃহীত ব্যবস্থাদি কতটা দক্ষতার সাথে পালিত হচ্ছে তা যাচাই করা। এটি সময় বা অর্থ অপচয় বন্ধ করে লব্ধ ফলাফলের গ্রহনযোগ্য মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

৩. **<u>স্থায়িত্বশীলতাঃ</u>** উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক চলমান প্রক্রিয়া। ফলে এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, যেভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে এবং যে ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে তা ঐ ধরনের কার্যক্রমের ধারাবহিকতা ব্যাহত না করে উন্নয়নের প্রক্রিয়া প্রকল্প মেয়াদের পরেও গতিশীল ও কার্যকর রাখবে।

৪. **<u>কার্যকারিতাঃ</u>** প্রকল্প যে উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা কতটা স্বার্থক হচ্ছে তা যাচাই করা। উল্লেখ্য, এ উদ্দেশ্যে তাৎক্ষনিক হতে পারে-যা সাধারণতঃ প্রকল্প প্রস্তবনায়সুনির্দিষ্টবাবে উল্লিখিত থাকে এবং যা সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করা যায়। আবার সংশ্লিষ্ট খাতেরসার্বিক লক্ষ্যের সাথে পরিমাপও করা যেতে পারে।

৫. <u>cÖv @</u> এটি সাধারণত: প্রকল্প সমাপ্তির কিছু সময় পর করা হয় যাতে বৃহত্তর কোন লক্ষ্যে সাধিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা যায়।যেমন-দারিদ্র বিমোচন সহায়ক হচ্ছে কিনাবা খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে স্থায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে পারছে।

cKÖíi cÖv wbi;c. cNw!

একটি প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রভাব নিরুপণ বিষয়টি প্রধানত: তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রকল্প একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য কাজ করে।একই জনগোষ্ঠীর ওপর তিনটি পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়।

প্রভাব নিরুপণের পর্যায়		পদ্ধতি
১.	প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে	বেইজলাইন
২.	প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে এবং অব্যবহিত পর	নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মসূচি

৩.	প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্নের কিছু সময় পর	প্রভাব নিরুপণ

†বইজলাইন জরিপ :

কোন প্রকল্পের শুরুতে সে প্রকল্প এলাকার এবং এলাকার মানুষের ঐ সময়ের গুণ্গত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করাই বেইজলাইন জরিপ। প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে বেইজলাইন জরিপের বিষয়াদি নির্ধারিত হয় ।

B‡yk¨

প্রকল্প চলাকালীন বা প্রকল্প শেষে এর পরিবর্তন ও তার কার্যকারিতা মূল্যায়নে এ তথ্য ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ এ তথ্য প্রকল্পের কার্যকারিতা যাচাই করার ক্ষেত্রে মান নির্দেশক (Paramater) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বেইজলাইন উপাত্ত সংগ্রহের গুরুত্ব

কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এক বা একাধিক ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যকে বিবেচনায় রেখে। তাই প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর পূর্বে প্রকল্প এলাকা এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে রাখা প্রয়োজন। এর ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্তির পর অর্জিত ফলাফলের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফলের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

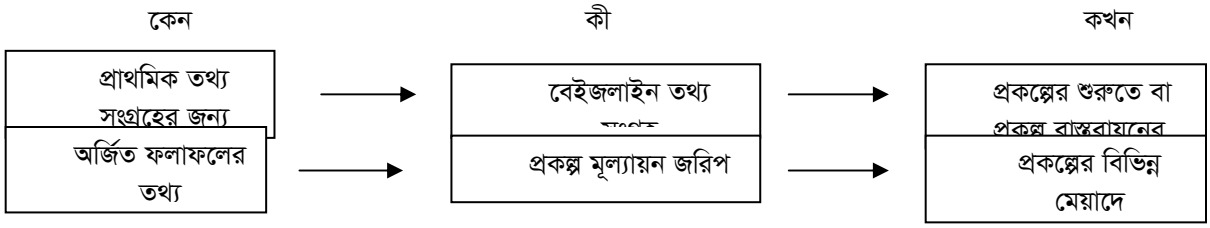

বেইজলাইন জরিপে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। জরিপ করার জন্য ২ ধরনের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহপত্র (Questionnaire) ব্যবহার হয়। :

১. সুসংগঠিত প্রশ্নমালা (Structured Questionnaire)
২. আধা-সংগঠিত প্রশ্নমালা (Semi-structured Questionnaire)

cÖfv wbi;c.Z

প্রভাব নিরুপণ হচ্ছে প্রকল্পের একটি ব্যাপকভিত্তিক মূল্যায়ন। একটি প্রকল্প বা কার্যক্রমের প্রভাব নিরুপণ করা হয় সে কার্যক্রম সমাপ্তির পর। প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং উপকরণসমূহের যথাযথ ব্যবহারের মূল্যায়ন কাজটি প্রকল্পের প্রভাব নিরুপন থেকে সহজতর। কারণ মানুষের জীবন মানের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদী এবং পরিমাপ করাও জটিল। আবার এটাও সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয় যে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মানুষের জীবনের এ পরিবর্তন হয়েছে। এ পরিবর্তনের পিছনে আরও অন্যান্য কার্যক্রমের ভূমিকা থাকতে পারে। যেমন-

- বাইরের কোন সুযোগ (চাকুরী পাওয়া), পরিবেশগত কোন সুযোগ
- পরিবারের সদস্য সংখ্যার পরিবর্তন (মেয়ে বিয়ে দেয়ায় একজন কমে যাওয়া বা ছেলে বিয়ে করানোতে একজন নতুন সদস্য যোগ হওয়া)
- অন্যান্য সংস্থার সেবা থেকে (যেমন- অন্য কোন সেবা সংস্থা বা এনজিও থেকে প্রশিক্ষণ বা ঋণ পাওয়া)

এ সমস্যাগুলো থাকা সত্ত্বেও প্রভাব নিরুপণ করা প্রকল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রক্রিয়া সুফলভোগীর জীবনমানে শুধু প্রকল্পের প্রভাব নয়, পারিপার্শ্বিক সেবাসমূহের প্রভাবও জানা যায়। মূলকথা হলো পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ব্যবহারের চূড়ান্ত সুফল হিসেবে প্রভাব নিরুপণ বিষয়টিকে বিবেচনা করা হয়।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন যে জনগোষ্ঠীর জন্য পরিচালিত হবে তা প্রধানত: দুই ধরনের। যেমন-

১. প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠী

২. প্রকল্প এলাকার বাইরের জনগোষ্ঠী।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত জনগোষ্ঠীর ওপর প্রকল্পের প্রভাব পড়বে। যা বাইরের জনগোষ্ঠীর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ফলে প্রকল্পের প্রভাবের পরিমাপ করার ভিত্তি হিসেবে প্রকল্পের বাইরের গ্রামে তথ্যসমূহ নিয়ন্ত্রক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে যে পরিবর্তনের ছাপ পড়বে তার তুলনা হবে প্রকল্পের বাইরের জনগোষ্ঠীর সাথে। তাই প্রকল্পভুক্ত বা বাইরের জনগোষ্ঠীর আর্থ- সামাজিক, ভৌগলিক অবকাঠামোর দিকগুলোর সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন। এছাড়াও এ উভয় ধরনের জনগোষ্ঠীর তথ্য সংগ্রহ একই সময়ে করতে হবে।

যেমন: এ দুই ধরনের গ্রামের বা জনগোষঠীর আকার, পরিবারের সংখ্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান ইত্যাদিও সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির দ্বারা একজন ব্যবস্থাপক নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্যাদি পেয়ে থাকেন যার মাধ্যমে তিনি-

- প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক সনাক্ত করতে পারেন
- প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো দুর করতে সময়োচিত ও যথার্থ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
- প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় কতটুকু প্রভাব ফেলেছে তা জানতে ও বুঝতে পারেন।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কৌশল অবশ্যই প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নির্ধারণ করা দরকার। এজন্য প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সাথে নিয়ে কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। যৌক্তিক ও পর্যায়ক্রমিক নিম্নবর্নিত বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গেও সহায়তায় করা হয়। বিষয়গুলো হচ্ছে-

- কার চাহিদা, কী তথ্য, কী ধরনের তথ্য এবং কতদিন পর পর তথ্য নিতে হবে তা নির্ধারণ করা।
- তথ্যের উৎস সনাক্ত করা এবং বস্তনিষ্ঠভাবে উদ্দেশ্য যাচাই নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) নির্ধারণ করা।
- কখন ও কীভাবে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হবে তা পরিকল্পনা করা।
- পরিকল্পিত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতির পরীক্ষা ও উন্নয়ন করা।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সাবধানতার সাথে নির্বাচন করা দরকার। প্রাসঙ্গিক ও অর্থপূর্ণ নির্দেশকগুলো ব্যবহার করে শুধু কাঙ্খিত ও প্রয়োজনীয় তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা উচিত।

বেইজলাইন জরিপ

ইংরেজী Survey শব্দের অর্থ হলো জরিপ। তথ্য সংগ্রহপত্র ব্যবহারের মাধ্যমে কোন এলাকার যে কোন এক বা একাধিক বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করাকে সার্ভে বা জরিপ বলে। যেমন- আদম শুমারি, ভূমি জরিপ, পশু জরিপ, জলাশয় জরিপ, ইত্যাদি।

কোন প্রকল্প শুরু হওয়ার পূর্বে প্রকল্প এলাকার গুনগত ও পরিমানগত তথ্যাদি সংগ্রহই হলো বেইজলাইন জরিপ। প্রকল্প চলাকালীন সময় বা প্রকল্প শেষে সম্পাদিত কার্যক্রম মূল্যায়নে সংগৃহীত এসব তথ্যাদি মান নির্দেশক (Parameter) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রকল্প চলাকালীন মূল্যায়ন বা চূড়ান্ত মূল্যায়নে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে প্রাথমিক তথ্যের তুলনার মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যকারিতা যাচাই করাই বেইজলাইন জরিপের মূল উদ্দেশ্য।

জরিপ কার্যক্রম সম্পাদনে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে। সাধারণতঃ বেইজলাইন জরিপ করার জন্য যে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয় তা পূরণ করার জন্য দুটি পদ্ধতি অনুসরন করা হয়ে থাকেঃ

১. আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার (Formal Intervew)
২. আংশিক সংগঠিত সাক্ষাৎকার (Semi-structured Interview)

১. আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার

এ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য উত্তর দাতাকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়। যেমন- আপনার পুকুরের আয়তন কত? এতে সুসংগঠিত তথ্য সংগ্রহপত্র ব্যবহৃত হবে।

২. আংশিক সংগঠিত সাক্ষাৎকার

তথ্য সংগ্রহে এ ধরনের সাক্ষাৎকার আনুষ্ঠানিকভাবে (Informal) হয়ে থাকে। পূর্ব থেকে একটি চেকলিস্ট তৈরি করা থাকে। চাষির নিকট থেকে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে চেক-লিস্ট পূরণ করা হয়। চাষিকে চেক-লিস্টটি দেখতে দেয়া হয় না। এ ক্ষেত্রে

তথ্য সংগ্রহের সময় তথ্য দাতা যাতে আলোচনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে না পাওে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চেক লিস্টটি অনেক সময় আধা-সংগঠিত তথ্য সংগ্রহপত্রের রুপ নেয়।

bgbEw Rwic

কোন একটি জরিপ কার্যক্রমে প্রতিটি লোক বা প্রতিটি বাড়ী থেকে তথ্য সংগ্রহ করা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবিকভাবে সম্ভব হয় না। সকলের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনি সময়সাপেক্ষ। তা ছাড়া পরিসংখ্যানগত প্রয়োজন মেটাতে তার দরকারও নেই। এ কারণে অনেক সময় দলের অংশ বিশেষ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে জরিপ করা হয়। একেই নমুনা জরিপ বলা হয়।

‡Kb bgbEw Rwic Kiv R$€

- নমুনা জরিপে কম সময় লাগে
- নমুনা জরিপে ভূল কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- নমুনা জরিপে কম খরচ লাগে
- সম্ভাব্য ভূল-ভ্রান্তি পরিমাপ করা যায়
- পরিসংখ্যানগতভাবে সম্পূর্ণ জরিপের বিকল্প হিসেবে অর্থবহ ফল দেয়।

bgbEw Rwi‡ci AH2EÇw #$mgR~

- নির্দিষ্ট অভীষ্ট দল থাকবে
- জরিপ কাঠামো/নক্সা তৈরি করতে হবে
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ধারণ করা
- জরিপের আকার এবং সংখ্যা নির্ধারণ করা
- অভীষ্ট দলের সংখ্যা নির্ধারণ করা।

bgbERwic cNw!

নমুনা জরিপ পদ্ধতি প্রধানত দুই প্রকার-

ক. দৈবচয়ন (জধহফড়স)

দৈব চয়ন প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অভীষ্ট দলের প্রত্যেক সদস্যের সমান সুযোগ থাকে।

খ. উদ্দেশ্যমূলক নমুনা জরিপ

১. নমুনা নির্বাচনে বিষয়ভিত্তিক বিচার বিবেচনা করা হয়
২. দৈব চয়নের মাধ্যমে করা হয় না
৩. নমুনা অভীষ্ট দলের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে না।

bgbEwi AvKvi

নমুনা জরিপের আকার সাধারণত: অভীষ্ট দলের সংখ্যা বা আকারের ওপর নির্ভর করে। নমুনা জরিপের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর সকল স্তরের প্রতিনিধিত্ব থাকলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায় (যেমন- জেলে, তাঁতি, শিক্ষক, মহিলা, পুরুষ, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি)।

জরিপকালে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখতে হবে-

১. সময়, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর সংখ্যা, সম্পদের পরিমাণ
২. অধিক তথ্যের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে এমন সংখ্যক পরিবারের সাক্ষাৎকার নিতে হবে যা পরিসংখ্যানগতভাবে গ্রাহ্য হবে
৩. অধিক বিশ্লেষণের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

কোন প্রকল্প এলাকার অভীষ্ট দলের যত নমুনা নেয়া হবে সেখানে কিছু না কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে। সুতরাং যখন জরিপ নমুনা নির্বাচন করা হয় তখন অবশ্যই এ ত্রুটি বিচ্যুতিকে মাথায় রেখে নমুনার আকার নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রকৃত প্রয়োজনের চেয়ে কিছুটা বেশি সংখ্যা নিতে হবে। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে সাধারণত:৩% ত্রুটি-বিচ্যুতি গ্রহণযোগ্য।

vw.wR¨K g,m¨Pv# cwiwPw!

2wgKv

মাছ আমরা পাই দু'ভাবে- (১) কেবল আহরণ করে (capture fishery) এবং (২) চাষাবাদের সুবাদে (culture fishery)। বিশ্বে প্রথমোক্তটি অর্থাৎ কেবল আহরণ করা মাছের উৎপাদন পরিমাণ স্থির, এমনকি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের বিগত ৪ দশকের পরিসংখ্যান সুস্পষ্টভাবে এটি তুলে ধরেছে যে এদেশে মোট জাতীয় মৎস্য উৎপাদনে capture fishery'র অবদান ক্রমশঃ কমে আসছে। বিশ্বে অনেক দেশেই capture fishery ইতোমধ্যে সর্বোচ্চ স্থায়িত্বশীল উৎপাদন (Maximum Sustainable Yield) এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে বা খুব শীঘ্রই পৌঁছতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের উদাহরণ দিয়ে বলা যায় ক্রমবর্ধমান মৎস্য চাহিদা পূরণে culture fishery ক্রমশইঃ জোরালো ভূমিকা রাখতে সম্ভব এবং রেখে চলছে। মৎস্যচাষ চাকুরী সুযোগ বৃদ্ধি করে। ফলে অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, তাদের আয় বাড়ে। বর্ধিত আয় খাদ্যসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয়িত হয় যা খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ ক্ষুধা নিবারণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। বিশেষজ্ঞদের দৃঢ় অভিমত এই যে, বর্তমানে প্রাপ্য সম্পদ ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমেই মৎস্যচাষ হতে উৎপাদন আরও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন কেবল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও বাজার চাহিদা পূরণের জন্য বাণিজ্যিক হারে মৎস্যচাষ উৎপাদন বৃদ্ধির সক্রিয় প্রচেষ্ট গ্রহণ ।

vw.wR¨K g,m¨Pv# K? €

() ¨ mvw$K B‡yk¨

বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ হলো এমন চাষ কার্যক্রম যার মুখ্য উদ্দেশ্য সম্ভব সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন (মুনাফা = আয় - ব্যয়)। গ্রামীণ প্রচলিত মৎস্যচাষ কার্যক্রম যা আমরা সচরাচর দেখে থাকি বাণিজ্যিক কার্যক্রম তার বিকল্প নয়, বরং সম্পূরক। প্রচলিত গ্রামীণ মৎস্যচাষ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য মাছের পারিবারিক চাহিদা মেটানো। বাণিজ্যিক মৎস্যচাষে মাছ বাজারে বিক্রয়ের জন্যই উৎপাদিত হয়ে থাকে। এ দু'এর মাঝখানে কিছু উদ্যোক্তা থাকতে পারেন যারা দুটোই করে থাকেন- তাদেরকে কোন ভাগে ফেলা হবে তা নির্ভর করে পারিবারিক ভোগ আর বাজারে বিক্রয় এ দুটোর মধ্যে - কোনটি প্রধান ভূমিকা রেখে থাকে তার ওপর। কারণ গ্রামীণ মৎস্যচাষে কিছু চাষি মাছ বিক্রয় করতেও পারেন এবং কিছু মুনাফা অর্জন করতে পারেন। মাছ বিক্রয় করাটাই বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক মৎস্যচাষ কার্যক্রমের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য নয়, বরং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে কীনা সেটিই দুইয়ের মাধে মুল পার্থক্য গড়ে দেয়।

2) kg kwQi B,m

অবাণিজ্যিক চাষে শ্রমের প্রধান উৎস হয়ে থাকে পরিবার এবং বাণিজ্যিক চাষে শ্রমের প্রধান বা একমাত্র উৎস ভাড়া করা শ্রমিক।

+) •.

বাণিজ্যিক মৎস্যচাষীরা ঋণ সুবিধার জন্য জামানত (collateral) প্রদানে সক্ষম। ফলে তারা তাদের মূলধনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহের (যেমন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ) সমূহের দ্বারস্থ হতে পারেন এবং ঋণ পেয়েও থাকেন। কিন্তু অবাণিজ্যিক চাষিরা এই ঋণ সংগ্রহ করতে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহের দ্বারস্থ হন (যেমন উচ্চসুদে মহাজন, বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনের কাছ হতে) বা দাদন আকারে।

C) B,cv%b-Rjv$!b AbE!

উচ্চ মাত্রার পুঁজি নির্ভরশীল হওয়ায় (capital intensive) বাণিজ্যিক চাষের উৎপাদন-জলায়তন অনুপাত অবাণিজ্যিক চাষের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে থাকে। অর্থাৎ একক প্রতি জলায়তনে বাণিজ্যিক চাষে উৎপাদন হার উল্লেখযোগ্য হারে বেশী হয়ে থাকে।

*) g,m¨Pv# GjvKv

অবাণিজ্যিক চাষে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ও এর লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয় এসব কাজ মূলত গ্রামীণ এলাকায় হবে। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ খুব বেশী ক্রয় নির্ভর নয় বলে এবং উৎপাদিত মাছ বিক্রয়ের জন্য সাধারণত স্থানীয় হাট বাজার ব্যবহৃত হয় বা স্থানীয় ভাবেই বিক্রয় হয় বলে গ্রামীণ এলাকাতেই এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। অপরদিকে বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ উপাদানসমূহে বিশেষ বিশেষ বাজার থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ক্রয় করা হয়ে থাকে এবং উৎপাদিত মাছ স্থানীয়ভাবে নয় বরং উপযুক্ত বাজার যেখানে আছে সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয় বিধায় এই কার্যক্রমের স্থান সাধারণতঃ শহরের আশে পাশে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থাসম্পন্ন স্থানেই হয়ে থাকে। তবে খুবই বড় আকারের সমন্বিত খামার যার উৎপাদন উপকরণসমূহে নিজেদের উদ্যেগেই তৈরী হয়ে থাকে বা করা যায় এবং প্রক্রিয়াজতসরণসহ বাজারজাতকরণের নিজস্ব ব্যবস্থা রয়েছে সেসব শিল্প আকারের খামারসমূহ অপেক্ষাকৃত গ্রামীণ এলাকায়ও হতে পারে এতে করে কমমূল্যের জমির কারণে উৎপাদন খরচ যেমন কমিয়ে আনা যায় তেমনি উপযুক্ত পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়।

F) g,m¨Pv# cÖE

অবাণিজ্যিক মৎস্যচাষে সাধারণত সনাতন (extensive) অথবা আধা নিবিড় (semi intensive) চাষ ব্যবস্থার উপযোগী মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অপরদিকে বাণিজ্যিক চাষে আধা-নিবিড় থেকে (যেমন তেলাপিয়া চাষে সার ও সম্পূরক খাবার (pelleted) নিবিড় (যেখানে সার নয়, কেবলই সম্পূরক খাবার সরবরাহ করা হয়) চাষে ব্যাবহৃত হতে পারে।

vw.wR¨K g,m¨Pv‡#i mvE4v-AmvE4v

<u>mvE4vmgR</u>

১. <u>5v%¨ wbivcIv$ A %vb</u>। বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করে যার ফলে স্থিতিশীল আয় প্রাপ্তির সুযোগও বৃদ্ধি পায়। এই আয়ের কিছু অংশ মাছ কেনায় ব্যায়িত হয়ে খাদ্য নিরাপত্তায় আবদান রাখে।

২. <u>!ĵbvgj K2v‡ BbP kg gRE w.wR¨K g,m¨Pv‡#i B,cv%bk?j!v w=Þ!k?j iv5‡! GgbwK wT‡$ †/‡! mvRv/¨ K‡i।</u> তুলনামূলকভাবে বেতন বা মজুরী অধিক বিধায় চাকুরী ধরে রাখার জন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাঝে প্রতিযোগিতামূলক আবহের সৃষ্টি হয়। এমন পরিবেশে সৃষ্ট প্রতিযোগিতা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৩. miKvi? ivR=l &‡! A %vb iv‡5। বাণিজ্যিক মৎস্যচাষে অধিক উৎপাদনশীলতার জন্য বাড়তি মুনাফা সরকারী রাজস্ব আকারে অবদান রাখতে পারে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা বা খাদ্য উৎপাদন কারখানাসমূহ হতেও অধিকহারে রাজস্ব এসে থাকে।

৪. w.wR¨K g,m¨Pv# V ‡%wkK gy&# G‡b †%$। রপ্তানিতে বিশেষ অবদান রাখে বিধায় বাণিজ্যিক মৎস্যচাষের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ বিশেষ অবদান রেখে আসছে। দেশে মৎস্যচাষ ক্রমশ অধিকহারে বাণিজ্যিকিকরণের ফলে এর অবদান প্রায় প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে।

৫. w ‡k# wKS^A %vb। একটু দূরবর্তী এবং নিভৃত এলাকায় (মূলত কম মূল্যে জমি পাওয়া যায় বিধায়) বাণিজ্যিক মৎস্যচাষের খামার গড়ে উঠলে আশে পাশে অবকাঠামো গত কিছু উন্নয়ন ঘটে, যেমন রাস্তাঘাট তৈরী, এলাকায় বিদ্যুতের সংযোগ ঘটানো, দোকান পাট গড়ে ওঠা, ইত্যাদি।

৬. M‡ #.v 6 c(Œ)M! Bb‡b Ab‡Ki **(catalyst)** 2‡K v cvjb। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাসের কার্যকর পন্থাসমূহ ক্রমাগত উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ। এই ধরনের সফল উদ্যোক্তাদের ক্রমবর্ধমার চাহিদা পূরণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হলে গবেষণা অর্থবহ হয় এবং প্রয়োজনভিত্তিক হয়।

AmE4vmgR-

১. w.wR¨K g,m¨Pv# A1Mbw!K V #g¨ G s mvgwRK Aw=‡!v & K‡i। এটি বিশেষ করে চিংড়ি চাষের বেলায় পরিলক্ষিত হয়। বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপকরা অনেক সময় স্থানীয় শ্রমিকের বদলে বাহির থেকে ভাড়া করা শ্রমিক কাজে লাগায়। অধিকতর আনুগত্যলাভের প্রত্যাশায় তারা এটি করে থাকে যা স্থানীয়ভাবে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগায়।

২. cwi‡ kw cb‡i। ক্রমবর্ধমান নিবিড়তার কারণে বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ স্থানীয় পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকে।

৩. w.wR¨K 6 A w.wR¨K g,m¨Pv# g,m¨ B,cv%b †7‡c m mg‡$8 cwic‡K R$bv। ধরে নেয়া হয় যে, কোন দেশের সার্বিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক মৎস্যচাষ পরিপূরক ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু অনেক সময়েই এর উল্টোটা হয়। বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ কিছু লোককে ধনী করতে পারে। তবে সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচনে খুব কমই ভুমিকাই রাখতে পারে। এটিও দেখা যায় যে, বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ অপেক্ষাকৃত উচ্চ-শিক্ষিত ধনী এবং পুরুষ। এগুলো ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য আরও বাড়াতে পারে। মৎস্যচাষ ক্ষেত্র নারীদের প্রয়োজনীয় ভুমিকাকে দুর্বল করতে পারে।

mdj w.wR¨K g,m¨Pv‡#i c~'k!v' wj

বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ অন্যান্য ব্যবসায়মুখী কার্যক্রমের মতই। প্রধান লক্ষ্য সম্ভব সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে দক্ষতার সাথে উৎপাদনের জন্য কারিগরি ভাবেও সক্ষম হতে হবে।

১. KwiMwi w ‡ Pbv। কারিগরি পর্যায়ে কম খরচে মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়াদি হলোঃ প্রজাতি, খামারের অবস্থান এবং খাদ্য। বাজার চাহিদা, পোনা প্রাপ্তির সহজলভ্যতা এবং অধিক উৎপাদনশীল প্রযুক্তির প্রাপ্যতা এক্ষেত্রে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। স্থান নির্বাচনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভুমি মূল্য, নির্মাণ ব্যয়, উপকরণাদি সংগ্রহ ব্যয় এবং বাজারজাতকরণ ব্যয়, ইত্যাদি সবকিছুই নির্ভর করে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের ওপর। মাটি ও পানির প্রাকৃতিক গুণাগুণও এক্ষেত্রে আর এক গুরুতপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

উন্নতমানের পোনা ও খাদ্য প্রাপ্যতাও বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে কেবল উন্নত মানের পোনা থেকে ভাল উৎপাদন আশা করা যেতে পারে। মাছ চাষে খাদ্য ব্যয় মোট ব্যয়ের অর্ধেক বা তারও বেশী হয়ে থাকে। তাই সুলভে ভাল খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

২. A1Wbw!K Bc‡/wwM!v /vPv8। সম্ভাব্য সকল ব্যয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে আয়ের পরিমাণ হিসাব করে মুনাফার হার ও পরিমাণ দুটোই যাচাই করে দেখতে হবে অর্থনৈতিকভাবে কার্যক্রমটি আকর্ষণীয় হবে কীনা।

৩. gv‡Si Og 4gvb PwwR%v v vRvi Av‡S K?bv !v /vPv8। এটি বিশেষ করে প্রযোজ্য বিশেষ বিশেষ প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে। কোন বিশেষ প্রজাতির চাহিদা অদূর ভবিষ্যতে হ্রাস পাবে নাকি বাড়বে তার ওপরে নির্ভর করে বাজার মূল্য। বাংলাদেশের মানুষের মাছের চাহিদা বহু-প্রজাতি ভিত্তিক, কোন বিশেষ প্রজাতির ওপর দীর্ঘস্থায়ী নয়। পাংগাস মাছ এ ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এককভাবে চাহিদা তেমন বৃদ্ধি না পাওয়ায় উৎপাদন ব্যয়ের সাথে সংগতি রেখে মাছের দাম গত কয়েক বছর ধরে বাড়ছেনা, এবং ক্ষেত্র বিশেষে কমে গেছে। ইদানীং মনোসেক্স তিলাপিয়া চাষের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজ করছে।

৪. xwK w ‡ Pbv। সম্ভাব্য সকল ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে একজন উদ্যোক্তাকে এগোতে হবে। ঝুঁকিসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে

- জৈব ঝুঁকি। মাছ চাষের নিবিড়তার সাথে সম্পর্কিত।
- আবহাওয়াগত ঝুঁকি। বৃষ্টি না হওয়া ইত্যাদি।
- অর্থনৈতিক ঝুঁকি।
- সামাজিক ঝুঁকি। ধান ও মাছ চাষে জমিতে পানি রাখতে পারা বা না পারা।
- স্ব-প্রণোদিত ঝুঁকি। একই প্রজাতি অনেকে চাষ করলে তার বাজার মূল্য কমে যেতে পারে।
- নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের ঝুঁকি।

৫. cwK msM‡Öi m-| ¨!v। পুঁজির জন্য অর্থের উৎসের সাথে কার্যকর ভাবে যোগাযোগ করতে পারা এবং তা সংগ্রহ করতে পারার সম্ভাব্যতার ওপর বাণিজ্যিক মৎস্যচাষের সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

৬. mTK †/vMv‡/vM ¨ =>। মাছচাষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ করা এবং মাছ বাজারজাতকরণের জন্য ভাল সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যকীয়।

৭. ¨ mwW$K B,mvR G s ¨ =>ebv w #‡$ cvi%wk'!v c‡ÖwRb। মালিক বা উদ্যোক্তা পক্ষের মধ্যে বিশেষভাবে ব্যবসায়িক উদ্দিপনা থাকা প্রয়োজন। যেন এর জন্য প্রয়োজনীয় সকলকাজ সুন্দরভাবে সমাধা করার মত মানসিক প্রস্তুতি থাকে। আবার কেবল মানসিক সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়, সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য উদ্যোক্তার বা উদ্যোক্তাবৃন্দের যথেষ্ট ব্যবস্থাপনাগত পারদর্শিতা থাকা প্রয়োজন।

তেলাপিয়া মাছের বাণিজ্যিক চাষ

লিঙ্গ রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত পুরুষ তেলাপিয়া (Monosex Tilapia) চাষ ইতোমধ্যেই মৎস্যচাষি এবং সাধারণের মাঝে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। সহজ ব্যবস্থাপনায় বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে চাষের মাধ্যমে ৪-৬ মাসে শতাংশ প্রতি ৪০-৬০ কেজি তেলাপিয়া মাছ উৎপাদন করা যায়। তেলাপিয়া মাছ পুকুরে ডিম দিয়ে বাচ্চা উৎপাদন করে। ফলে পুকুরে পোনার আধিক্য সৃষ্টি এবং মাছের উৎপাদন ব্যাহত হয়। এজন্য পুকুরে মনোসেক্স পুরুষ তেলাপিয়ার চাষ করা হয়। পুরুষ তেলাপিয়ার বৃদ্ধির হার স্ত্রী তেলাপিয়া অপেক্ষা ৩০% বেশি হওয়ায় মনোসেক্স পুরুষ তেলাপিয়ার চাষ ক্রমশ লাভজনক ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

উৎপাদন পদ্ধতি

পুকুর প্রস্তুতি (ভৌত ও জৈব)

পাড় ও তলদেশঃ পাড়ে ঝোপঝাড় থাকলে পরিস্কার করতে হবে। পানিতে যথেষ্ট পরিমাণে (কমপক্ষে দৈনিক ৮ ঘন্টা) সূর্যালোক প্রবেশের সুবিধার্থে সম্ভব হলে বড় গাছ অথবা সম্ভব না হলে গাছের ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে পানি নিস্কাশন পুকুরের পাড় মেরামত ও তলদেশ অতিরিক্ত কর্দমমুক্ত করে সমান করতে হবে। অন্যথায় পুকুরের পানির গুণাগুণ দ্রুত খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া তলদেশ সমান না হলে পরবর্তীতে মাছ আহরণ করা দুরুহ হবে। এ কাজটি জানুয়ারি – ফেরুয়ারি মাসের মধ্যে সম্পাদন করাই উত্তম।
জলজ আগাছা এবং রাক্ষুসে ও অন্যান্য মাছ দূরীকরণঃ পানি প্রাপ্তিতে সমস্যা না হলে পুকুরের পানি নিষ্কাশন করে সব জলজ আগাছা এবং রাক্ষুসে ও অন্যান্য মাছ অপসারণ করতে হবে। পানি প্রাপ্তিতে সমস্যা হলে, পুকুরে বারবার জাল টেনে যতদূর সম্ভব মাছ ধলে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে প্রতি শতাংশ আয়তন ও প্রতিফুট পানির গড় গভীরতার জন্য ২৫-৩০ গ্রাম হারে রোটেনন প্রয়োগ করে অবশিষ্ট মাছ ধরে ফেলতে হবে।

চুন প্রয়োগঃ পানি নিষ্কাশন বা রোটেনন প্রয়োগের ২/৩ দিন পর প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগঃ চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ১০০ গ্রাম ও টিএসপি ১০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।

পোনা মজুদ

সময় ও সতর্কতাঃ সার প্রয়োগের ৪/৫ দিন পর যখন পানি বর্ণ হালকা সবুজ রঙ ধারণ করবে তখন পোনা মজুদ করা যাবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা পুকুরে ছাড়ার সময় পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পোনা বহনকারী পাত্রের পানি পুকুরের পানির সাথে কিছুটা সময় নিয়ে অল্প অল্প করে পরির্তন করতে হবে যেন পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পিএইচ ক্রমশ পুকুরের পানির সমান হয়ে যায়।

মজুদন হারঃ ন্যূনতম ১৫ গ্রাম ওজনের ২৫০টি পোনা প্রতি শতাংশে মজুদ করতে হবে। সে হিসেবে ১ একর জলায়তনের পুকুরে মজুদযোগ্য মাছের সংখ্যা হবে ২৫,০০০ টি এবং মোট ওজন ৩৭৫ কেজি (এর সাথে অন্যান্য মাছ যুক্ত করা যেতে পারে: সিলভার কার্প ৭০০ টি (১০-১৫ সেমি আকারের), রুই ২০০টি (১৫-২০ সঃমিঃ আকারের), কাতলা ১০০টি (১৫-২০ সেমি আকারের) এবং শিং/মাগুড় ২০০-৩০০টি (৫-৭ সেমি আকারের) অর্থাৎ মোট ১২০০-১৩০০টি)

পোনা সংগ্রহঃ মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোন নিজে উৎপাদন করা সবচেয়ে ভাল। সেক্ষেত্রে নার্সারি পুকুর প্রস্তুত করে প্রতি শতাংশে ১২০০-১৫০০টি (২১-২৪ দিন বয়সের) লিঙ্গা রূপান্তরিত পোনা মজুদ করতে হবে।
পোনা মজুদের পর ২৮-৩০% প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য নিম্নের সারণি অনুযায়ি প্রতিদিন পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

দিন	খাদ্য প্রয়োগের হার	খাদ্যের প্রকার
১-৭	৩০%	নার্সারি
৮-১৪-	২৫%	নার্সারি
১৫-২১	২০%	স্টার্টার-১
২২-২৮	১৫%	স্টার্টার-১
২৯-৩৫	১২%	স্টার্টার-২
৩৬-৪২	১০%	স্টার্টার-২

পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্য্ নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন এবং প্রতি সপ্তাহে নমুনায়ন করে পোনার বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে।
এরূপ ব্যবস্থাপনায় ৬ সপ্তাহ পর ১৫-২০ গ্রাম ওজনের পোনা পাওয়া যাবে। এক একর পুকুরে মজুদের জন্য ২৫ শতাংশ জলায়তনের নার্সারি পুকুর ব্যবহার করতে হবে।
পোনা উৎপাদন করা সম্ভব না হলে নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে বর্ণিত আকারের প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা সংগ্রহ করতে হবে।

সতর্কতাঃ যে সব হ্যাচারিতে উৎপাদিত তেলাপিয়ার পুরুষ-সংখ্যা শতকরা ৯৮ বা তার চেয়ে বেশি, কেবল সেখান থেকেই পোনা সংগ্রহ করতে হবে। অন্যথায় উৎপাদন ব্যাহত হয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যাবে।

মজুদপরবর্তী সার প্রয়োগ

প্রতি ১৫ দিনে শতাংশ প্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৫০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে উল্লেখিত সার দুই ভাগ করে প্রতি সপ্তাহে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাছাড়া পানির রং এর ওপর নির্ভর করে কতদিন পর পর সার প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। সম্ভব হলে প্রতি দিন পরিমিত মাত্রায় সার দেয়া উত্তম।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

বাজার হতে তৈরি খাবার কিনে অথবা চাষি নিজে খাবার তৈরি করে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। বাজার থেকে তৈরি খাবার ক্রয় করা হলে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তাতে কমপক্ষে ২৮% আমিষ থাকে।

বাজারের খাবারের পরিবর্তে চাষি নিজেই নিম্নোক্ত মিশ্রণ অনুযায়ী পিলেট খাদ্য তৈরী করে তা পুকুরে প্রয়োগ করতে পারেন।

প্রতি ১০০ কেজি খাবারে মিশ্রণ তৈরির জন্য		
উপাদান	ব্যবহার মাত্রা (%)	পরিমাণ (কেজি)
চালের কুঁড়া (অটোমিল)	২৯.৫	২৯.৫
গমের ভূশি	২০	২০
ফিশ মিল	২৫	২৫
সরিষার খৈল	২০	২০
চিটাগুড়	৫	৫
ভিটামিন/মিনারেল	০.৫	০.৫
মোট	১০০	১০০

কোন অবস্থাতেই জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো উপাদান মাছের খাদ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়

সতর্কতাঃ মাছের খাবারের প্রতিটি উপাদানের মান গ্রহণযোগ্য হতে হবে। উপাদানসমূহ অথবা মিশ্রিত খাদ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে অন্যথায় নিম্নমানের খাবার প্রয়োগের ফলে উৎপাদন কোন অবস্থাতেই আশানূরূপ হবে না।

খাদ্য প্রয়োগের হারঃ পোনা মজুদের পর নিম্নের সারণি অনুযায়ী কমপক্ষে ২৮% আমিষসমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগ করতে হবেঃ

সপ্তাহ	খাদ্য প্রয়োগের হার	খাদ্যের প্রকার
১ম দুই সপ্তাহ	১০%	স্টার্টার-২
২য় দুই সপ্তাহ	৮%	স্টার্টার-৩
৩য় দুই সপ্তাহ	৭%	স্টার্টার-৩
৪র্থ দুই সপ্তাহ	৬%	স্টার্টার-৩
৫ম দুই সপ্তাহ	৫%	গ্রোয়ার-১
৬ষ্ঠ দুই সপ্তাহ	৪%	গ্রোয়ার-১
৭ম দুই সপ্তাহ	৪%	গ্রোয়ার-২
৮ম দুই সপ্তাহ	৩%	গ্রোয়ার-২

পরবর্তীতে সর্বশেষে বর্ণিত হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য কমপক্ষে প্রতিমাসে ১ বার নমুনায়ন করে প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে।

প্রতিদিন উক্ত পরিমাণ খাদ্য সকাল ও বিকেলে দুইবারে সমান ভাগ করে দিতে হবে।

পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণঃ

প্রধানত যে বিষয়গুলো পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণে বিবেচ্য তা হলো-

- মজুদ পূর্ববর্তী সময়ে পানির রং সবুজাভ হওয়া;
- পরবর্তীতে পানি ঘোলাত্বমুক্ত রাখা;
- পানির উপরিস্তরে লাল-অ্যালজি বা অতিরিক্ত আয়রনের কারণে লাল রং ধারণ করা এবং সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া; এবং
- সম্ভব হলে, পানির পিএইচ (৭.৫-৮.৫), দ্রবীভূত অক্সিজেন মাত্রা (৫-৭ পিপিএম বা নিযুতাংশ) মেপে দেখা ও নিয়ন্ত্রণে রাখা, ইত্যাদি।

মাছের অবস্থা পর্যবেক্ষণঃ

প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো-

- নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের বৃদ্ধির হার ও তার ভিত্তিতে দেয় খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ
- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিশেষ করে রোগবালাই-এর উপস্থিতি ও করনীয় নির্ধারণ।

আহরণ ও বিক্রয়ঃ

চার মাসে তেলাপিয়াসহ অন্যান্য মাছ বিক্রয় উপযোগী হবে (তেলাপিয়া মাছের গড় ওজন ২০০ গ্রাম অন্যান্য মাছ গড়ে ১.২৫ কেজি)। মাছ ধরার জন্য বেড়জাল/ঝাকিজাল ব্যবহৃত হতে পারে। প্রয়োজনে পুকুর শুকিয়ে সকল মাছ ধরা যেতে পারে।

প্রাক্কলিত উৎপাদন ব্যয়, সম্ভাব্য মোট আয় ও মুনাফা

(১ একর জলায়তনের পুকুরে ৪ মাসে)

মাছচাষ থেকে তেলাপিয়া-টাকা আয় অন্যান্য-টাকা আয়

ইজারামূল্য, পুকুর প্রস্তুতি, রোটেনন, চুন, সার ইত্যাদি): থোক	৬৫.০০০.০০
পোনা ক্রয়ঃ তেলাপিয়া (২৫,০০০ টি x টাকা ২.০০) + (অন্যান্য ১২০০টি x টাকা ১০.০০	৬২.০০০.০০
সার	৬০০০.০০
খাবার ৭৫০০ কেজি x টাকা ৪০.০০/ কেজি	৩,০০,০০০.০০
অন্যান্য (শ্রমিক, জালটানা, ঔষধপত্র, বাজারজাতকরন ইত্যাদি) (থোক)	৭০,০০০.০০
ব্যাংক সুদ	৫৫,৩০০.০০
মোট	৫,৫৩,৩০০.০০

আয়ঃ ৫,০০০ কেজি x ১১০.০০/কেজি, ৫,৫০,০০০.০০ ১,৫০০ কেজি x ১৭০.০০ কেজি, ২,৫৫,০০০.০০

মোট আয় ৮,০৫.০০০.০০

প্রতি চার মাসে নিট মুনাফা ২,৫১,৭০০.০০ টাকা। বৎসরে ২ বার চাষে মুনাফা দ্বিগুণ হতে পারে।

তেলাপিয়ার রোগ ও প্রতিকার

তেলাপিয়া একটি উচ্চ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মাছ। তবে উচ্চ মজুদ ও ঘনত্ব ও বদ্ধ জলজ পরিবেশে পরিত্যক্ত খাবার, মাছের বিপাকীয় বর্জ্য ও অন্যান্য আবর্জনা পঁচনের ফলে পানি দূষিত হয়ে অনেক সময় রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। তেলাপিয়া সাধারণত প্রটোজোয়া জাতীয় পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় আক্রান্ত পুকুরে প্রতি শতাংশ ২০০-২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করতে হবে। অনেক সময় তেলাপিয়া স্ট্রেপ্টোকক্কাস ও অ্যারোমোনাড সেপটিসেমিয়া নামক পরজীবি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। রোগের আক্রমণ হলে যথাশীঘ্র সম্ভব উপজেলা মৎস্য অফিস, সরকারি মৎস্য খামার কোনো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত।

পাঙ্গাস মাছের বাণিজ্যিক চাষ ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

vsj¢%‡k 1v8 cvnvm Pv‡#i †cÖ! 6 m-| bv@

যতদূর জানা যায় ১৯৯০ সালে থাই পাঙ্গাস প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে আমদানী হয়। পরবর্তীতে অতি দ্রুত এ মাছের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে থাই পাঙ্গাস মাছ চাষের একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে। নতুন প্রজাতির এই পাঙ্গাসের আদি নিবাস থাইল্যান্ড। ১৯৯৩ সালে মাসে মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট থাই পাঙ্গাসের পোনা উৎপাদনের সফলতার পর থেকে এর চাষ ব্যাপকভাবে প্রসার ঘটে। বর্তমানে ময়মনিংহের ত্রিশাল উপজেলায় আধুনিক উপায়ে বাণিজ্যিক পাংগাসের চাষ-এর সুখ্যাতি সারা দেশে আলোচিত বিষয় হয়েছে।

এইমাছ বদ্ধ জলাশয় বিশেষ করে পুকুরে চায়ের খুবই উপযোগী। তাছাড়া পেন, খাঁচা, উন্মুক্ত জলাশয়ে চাষ দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। কার্প জাতীয় মাছের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি উৎপাদন ক্ষমতার কারণে পাঙ্গাসই বর্তমানে দেশের প্রাণিজ আমিষ চাহিদা

পূরণে বিরাট ভুমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক খামারে নিবিড় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে চাষ হচ্ছে। এই মাছের চাষ বাংলাদেশে বিল্পব ঘটিয়েছে। তবে দেশের সর্বত্র এর উৎপাদন হার সমান নয়। অনেক এলাকাতেই বাণিজ্যিক চাষ প্রবর্তনের মাধ্যামে উৎপাদন আরও অনেক বাড়িয়ে চাষির মুনাফা বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

cvnvmPv‡#i mE4vmgR-R‡jv@

১. এ মাছটি রাক্ষুসে নয় বলে অন্য প্রজাতির সাথে মিশ্র চাষ করা যায়।
২. এ মাছটি সর্বভূক বলে যে কোন সম্পূরক খাদ্য দিয়ে চাষ করা যায়।
৩. দ্রুত বর্ধনশীল ও অধিক ঘনত্বে চাষযোগ্য এবং বেঁচে থাকার হারও বেশি
৪. মৃদু লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।
৫. সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর।
৬. বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।
৭. প্রতিকূল পরিবেশে (অর্থাৎ অল্প অক্সিজেন, পিএইচ এবং ঘোলাত্বের তারতম্য) এ মাছ সহজেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে।
৮. প্রায় সব ধরনের জলাশয়ে চাষ করা যায়।
৯. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি।
১০. বিদেশেও রপ্তানিযোগ্য।
১১. বাণিজ্যিক চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

cvnvmPv‡#i AmE4v@

১. বাজারদর তুলনামূলভাবে কম।
২. সময়মত পোনা পাওয়া যায়না।
৩. অন্তঃপ্রজনন জনিত কারণে মাছের বৃদ্ধি ঠিকমত হয় না।
৪. বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই-এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।
৫. পুকুরে নিবিড় চাষ করার কারণে অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।
৬. খাবারের দাম বেশি হওয়াতে উৎপাদন খরচ খুব বেশি।
৭. নিচু জমিতে বাণিজ্যিক চাষের কারণে পার্শ্ববর্তী উঁচু জমিগুলোতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং ফলত ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
৮. পানি বিষাক্ততার জন্য অনেক ক্ষেত্রে মাছ খাবার গ্রহণ বন্ধ করে দেয় এতে উৎপাদন কমে যায় এবং রোগবালাই দেখা দেয়।
৯. অনেক ক্ষেত্রে পানি দুর্গন্ধ হয়ে যায়। পানির পরিবেশ খারাপ হওয়ার কারণে, পেট ফোলা, লালচে দাগ ইত্যাদি দেখা দেয়।
১০. বাজারজাতকরণের বর্তমান পদ্ধতির কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র চাষিরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

cvnvmPv‡# w ‡ P¨ w #$@

১. পানির পরিবেশ ঠিক রাখার জন্যে পাঙ্গাসের একক চাষ না করে ৫-৭% কার্পজাতীয় মাছ মজুদ করা যেতে পারে।
২. পরিকল্পিত উপায়ে খামার করা যাতে পার্শ্ববর্তী ফসলের জমিতে প্রভাব না পড়ে।
৩. তলদেশের মাটি দুষিত হবার কারণে ১/২ বছর পর পর তলদেশের মাটির একটা স্তর উঠিয়ে সার হিসাবে ফসলের জমিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
৪. পোনা মজুদের ক্ষেত্রে ভাল পোনা নির্বাচন করা ।
৫. হ্যাচারী মালিকদের ব্রুড নির্বাচনে সততার সাথে কাজ করা

পুকুর নির্বাচন

- বাণিজ্যিক চাষের জন্য ৮-১০মাস পানি থাকে, এ রকম অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির পুকুর হলে ভাল হয়।
- পুকুরের আয়তন ৪০ শতাংশেরও বেশী হতে পারে এবং পানির গভীরতা ৪-৬ ফুট থাকা আবশ্যক।
- পুকুর পাড়ে ঝোঁপ-জঙ্গাল না থাকা আবশ্যক।

পুকুর প্রস্তুতি

পুকুর প্রস্তুতির মূল উদ্দেশ্য হলো মাছের বসবাসযোগ্য পরিবেশ তৈরী করা। পুকুর প্রস্তুতির অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো নিম্নলিখিত কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করা যায়:

- ❖ আগাছা ও পাড় পরিষ্কার - পুকুরে ভাসমান, লতানো, নিমজ্জিত ইত্যাদি জলজ আগাছা কায়িক শ্রমের মাধ্যমে পরিষ্কার করতে হবে।
- ❖ পোনা প্রাপ্তির ওপর পোনা মজুদের সময় নির্ভর করে। তবে মার্চ থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মাছ দ্রুত বাড়ে বিধায় মার্চ মাসের মধ্যেই পোনা মজুদ করতে পারলে ভাল হয়।

সারণি-১: প্রজাতির নাম* ও মজুদ সংখ্যা

প্রজাতির নাম	মজুদ সংখ্যা (প্রতি শতাংশ)	আকার (সেমি.)
পাঙ্গাস	৭৫ - ৯০	১২ - ১৫
সিলভার কার্প	১৮ - ২২	১২ - ১৫
রুই	১২ - ১৫	১২ - ১৫
মনোসেক্স তেলাপিয়া	৪৫ - ৫৩	৫ - ৭
মোট-	১৫০ - ১৮০	-

*ময়মনসিংহের ত্রিশাল এলাকায় কোন কোন সফল চাষি এসবের সাথে কার্পিও, মৃগেল, সরপুঁটি, ইত্যাদিও অল্প পরিমাণে যুক্ত করে থাকেন।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ ও মাত্রা

- ❖ বাণিজ্যিক চাষ মূলতঃ সম্পূরক খাবার ভিত্তিক।
- ❖ খাদ্যে গুণগত মানসম্পন্ন উপাদান ব্যবহার করতে হবে এবং প্রোটিনের পরিমাণ ২৫-৩২% নিশ্চিত করতে হবে।
- ❖ মজুদকৃত মাছের বয়স ও দৈহিক ওজন বিবেচনা করে সঠিক হারে খাদ্য প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। অতিমাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ পরিহার করতে হবে।
- ❖ মাছ ছাড়ার পরের দিন থেকে ১ম ১৫ দিন মজুদকৃত মাছের মোট দেহ ওজনের ১০% হারে ও পরে মাসে মাসে কমিয়ে ২-৩% হারে প্রতিদিন মোট পরিমাণের সকালে (৫০%) ও বিকালে (৫০%) খাবার দিতে হবে।
- ❖ মাছ মজুদের পর প্রতি ১৫ দিনে একবার জাল টেনে মাছের নমুনায়নের মাধ্যমে গড় ওজন অনুযায়ী খাবারের পরিমাণ সমন্বয় করতে হবে। নিম্নের সারণি-২ অনুসরণে খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে।

সারণি-২: মৎস্য খাদ্য (৩০% আমিষ সমৃদ্ধ) তৈরির সূত্র ও ৫০০ কেজি খাবার তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপাদানের পরিমাণ

খাদ্য উপাদান	শতকরা হার (%)	পরিমাণ (কেজি)
শুটকী মাছের গুড়া	৫.০	২৫.০
সরিষার খৈল	৪৪.৯	২২৪.৫
গমের ভুশি/চালের কুঁড়া	৩৫.০	১৭৫.০
ফিশ কনসেনট্রেট	১০.০	৫০.০
আটা	৫.০	২৫.০
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.১	০.৫
মোট	১০০	৫০০.০

ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা

- পুকুরের পানি দ্রুত কমে গেলে অন্য কোন উৎস হতে পানি দিয়ে ভরে দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। অপরদিকে পানি বেড়ে উপচে পড়ার সম্ভাবনা থাকলে অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে।
- পানির স্বচ্ছতা ৮ সেমি. এর কম হলে খাবার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে।
- পানিতে অক্সিজেনের অভাব হলে মাছ পানির উপরে উঠে খাবি খেতে থাকে। এ অবস্থায় পানির উপরিভাগে লাঠি পেটা করে বা সাঁতার কেটে ঢেউ সৃষ্টি করে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে প্যাডেল হুইলার বা এ্যারেটর ব্যবহার করে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- মাঝে মাঝে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।
- মাঝে মাঝে হররা টেনে পুকুরের তলার বিষাক্ত গ্যাস দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- যে মাছগুলো বিক্রি বা খাওয়ার উপযোগী হয়ে যাবে, সেগুলো বাজারজাত করতে হবে তাহলে ছোট আকারের মাছগুলো বাড়ার সুযোগ পাবে।

মাছ আহরণ ও উৎপাদন

- পাংগাস মাছ মার্চ-ডিসেম্বরে ৮-৯ মাস চাষ করলে ১.৫- ২.৫ কেজি ওজনের হয়ে থাকে এবং বিক্রয়যোগ্য হয়।
- মাছ ধরার জন্য টানা বেড়জাল ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বাজারে জীবিত অবস্থায় বিক্রয় করার জন্য ভোরে মাছ আহরণ করা হলে উচ্চ মূল্য পাওয়া যাবে।
- সঠিকভাবে পাঙ্গাসের চাষ করে অধিকাংশ চাষিই আট মাসে একর প্রতি ১৮-২০ টন ফলন পেয়ে থাকেন, যদিও কারও কারও ফলন ২৫-৩০ টন অবধি পৌছে গেছে।

সারণি-৩: প্রাক্কলিত উৎপাদন ব্যয়, সম্ভাব্য মোট আয় ও মুনাফা (এক একর জলয়তনের পুকুরে, ৮ মাসে)

ইজারামূল্য, পুকুর প্রস্তুতি, রোটেনন, চুন সার ইত্যাদি: থোক	৬০,০০০.০০
পোনা ক্রয়, পাঙ্গাস ১২০০০টি, প্রতিটি ৫ইঞ্চি ১২০০০ x ৪ টাকা	৪৮,০০০.০০
এবং অন্যান্য-রুই, কার্পিও, মৃগেল, সিলভার কার্প, তেলাপিয়া	২৪,০০০.০০
প্রতিটির ৩-৪টি প্রজাতির সমন্বয়ে ৬০০০টি x ৪.০০ প্রজাতি	
খাবারঃ ৩০,০০০ কেজি x ৩৫ টাকা (নিজস্ব খামারে উৎপাদিত)	১০,৫০,০০০.০০
অন্যান্য: প্রমিক, জলটানা, ঔষধপত্র, বাজারজাতকরন: থোক	১,০০,০০০.০০
ব্যাংক সুদ: (১০% হারে, ৮ মাসের জন্য)	৮৫,৪৬৭.০০
মোট ব্যায়	**১২,৬৭,৪৬৭.০০**

- আয়ঃ গড় উৎপাদন ১৮,০০০ কেজি x ১০০ টাকা প্রতি কেজি হারে = ৳ ১৮,০০,০০০.০০
- ব্যয়ঃ ৳ ১২,৬৭,৪৬৭.০০
- মুনাফাঃ ৳ ৫,৩২,৫৩৩.০০

কেবল সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই একজন চাষি এ পরিমাণ মুনাফা তুলে নিতে পারবেন।

পাঙ্গাস চাষে বিরাজমান সমস্যাসমূহ

- মৎস্য খাদ্যের পুষ্টিমান হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদনের হার ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে।

- খাদ্য উপাদানের মূল্য বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- অতিমাত্রায় মজুদ ও অধিক খাদ্য ব্যবহারের কারণে পানি দূষণের ফলে অনেক খামারেই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।
- অতিরিক্ত ঘনত্বে (শতাংশে ২০০-৩৫০) পোনা মজুদের ফলে কাংখিত মাত্রার চেয়ে উৎপাদন কম হচ্ছে।
- পুষ্টি চাহিদা অনুযায়ী বাণিজ্যিকভাবে পাঙ্গাসের খাদ্যে প্রয়োজনীয় ২৫-৩২% প্রেটিনের স্থলে অধিকাংশ খাদ্যে ১৫-১৮% প্রোটিন ব্যবহার। খাদ্য পরিবর্তন হার (এফসিআর) ১.৮ থেকে ২.৫ তে অবনতি।
- বছরের পর বছর একই পুকুরে কালো কাদা অপসারণ না করে পোনা মজুদের ফলে পুকুরের পানি দূষণ হচ্ছে।
- অব্যবহৃত খাদ্য, মাছের জৈবিক বর্জ্য ও তলদেশের সঞ্চিত কালো কাদা পঁচনের ফলে পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি, অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের বিষাক্ততা মাছের মড়কের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমস্যা নিরসনে করণীয়

- অধিক মজুদ ঘনত্ব পরিহার করতে হবে।
- খাদ্যে গুণগত মানসম্পন্ন উপাদান ব্যবহার করতে হবে এবং প্রোটিনের পরিমাণ ২৫-৩২% নিশ্চিত করতে হবে।
- মজুদকৃত মাছের বয়স ও দৈনিক ওজনের ভিত্তিতে সঠিক হারে খাদ্য প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। অতিমাত্রায় খাদ্য প্রদান পরিহার করতে হবে।
- পানির গুণাগুণ রক্ষার জন্য প্রতি মাসে সঠিক মাত্রায় চুন/জিওলাইট ব্যবহার করতে হবে।
- মৌলিক রোগ প্রতিরোধ কৌশল অবলম্বন, জীবানু উচ্ছেদ, বাহিরের জীবাণুর প্রবেশ রোধ, উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো ও রোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং নিয়মিত খামার পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে।
- কোন কারণে মাছ রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে সাথে সাথে মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।
- পুকুরে পরবর্তী ফসলের সময় পোনা মজুদের পূর্বে অবশ্যই পুকুরে শুকিয়ে কালো কাদা, অবশিষ্ট খাদ্য, অপসারণ করে সঠিক মাত্রায় চুন প্রয়োগ করে মাছ মজুদ করতে হবে।
- মাছের স্বাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত মাছের দেহের দুর্গন্ধ দূরীকরণের জন্য মাছ বিক্রির ২দিন পূর্বে নতুন পুকুরে স্থানান্তর করে ৪৮ ঘন্টা পানির প্রবাহ দিতে হবে। এতে মাছের গন্ধ দূর হবে ফলে ভোক্তাদের চাহিদা এবং মাছের মূল্য বৃদ্ধি পাবে।
- বছরের পর বছর একই পুকুরে কালো কাদা অপসারণ না করে পোনা মজুদের ফলে পুকুরের পানি দূষণ হচ্ছে।
- অব্যবহৃত খাদ্য, মাছের জৈবিক বর্জ্য ও তলদেশের সঞ্চিত কালো কাদা পঁচনের ফলে পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি, অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের বিষাক্ততা মাছের মড়কের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমস্যা নিরসনে করণীয়

- অধিক মজুদ ঘনত্ব পরিহার করতে হবে।
- খাদ্যে গুণগত মানসম্পন্ন উপাদান ব্যবহার করতে হবে এবং প্রোটিনের পরিমাণ ২৫-৩২% নিশ্চিত করতে হবে।
- মজুদকৃত মাছের বয়স ও দৈনিক ওজনের ভিত্তিতে সঠিক হারে খাদ্য প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। অতিমাত্রায় খাদ্য প্রদান পরিহার করতে হবে।
- পানির গুণাগুণ রক্ষার জন্য প্রতি মাসে সঠিক মাত্রায় চুন/জিওলাইট ব্যবহার করতে হবে।
- মৌলিক রোগ প্রতিরোধ কৌশল অবলম্বন, জীবানু উচ্ছেদ, বাহিরের জীবাণুর প্রবেশ রোধ, উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো ও রোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং নিয়মিত খামার পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে।
- কোন কারণে মাছ রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে সাথে সাথে মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।
- পুকুরে পরবর্তী ফসলের সময় পোনা মজুদের পূর্বে অবশ্যই পুকুরে শুকিয়ে কালো কাদা, অবশিষ্ট খাদ্য, অপসারণ করে সঠিক মাত্রায় চুন প্রয়োগ করে মাছ মজুদ করতে হবে।

- মাছের স্বাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত মাছের দেহের দুর্গন্ধ দূরীকরণের জন্য মাছ বিক্রির ২দিন পূর্বে নতুন পুকুরে স্থানান্তর করে ৪৮ ঘন্টা পানির প্রবাহ দিতে হবে। এতে মাছের গন্ধ দূর হবে ফলে ভোক্তাদের চাহিদা এবং মাছের মূল্য বৃদ্ধি পাবে।

রুই-জাতীয় মাছের বাণিজ্যিক মিশ্রচাষ ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা: জনপ্রিয়তা এবং চাষ প্রযুক্তির তুলনামূলক সহজলভ্যতার কারণে রুই-জাতীয় মাছের চাষ বাংলাদেশে সর্বাধিক। এই মাছের বাজার-চাহিদা সবসময়ই বেশী। ফলে অনেক চাষি এই মাছ চাষে আগ্রহী। মূলত চাষিদের ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে এই মাছের নিবিড় চাষের প্রযুক্তির বিল্লব ঘটেছে। 'চাপের পোনা' যা সাধারণ পোনার চেয়ে অধিক ঘনত্বে রেখে এক শীতকাল পার করে দিয়ে মজুদ করা হয় তা দ্রুত বৃদ্ধি পায় । দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে এই ধরনের পোনা ব্যবহারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করে চাষিরা অল্প সময়ে অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হচ্ছেন। চাষ নিবিড়তার পাশাপাশি 'উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার' (এড়ড়ফ অয়ঁধপঁষঃঁৎব চৎধপঃরপবং-এঅচ) প্রয়োগের মাধ্যমে নিরাপদ মাছ উৎপাদন করে অধিকতর উচ্চমূল্যে বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব।

চাষ পদ্ধতি

পুকুর নির্বাচনঃ বাণিজ্যিক মাছচাষের জন্য অপেক্ষাকৃত বড় আকারের পুকুর, ৪০ শতাংশ বা তদূর্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় । পানির গভীরতা ৪ থেকে ৬ ফুটের মধ্যে হলে ভাল হয়। মাটি দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ এবং পুকুরটি আয়তাকার হওয়া উত্তম।

পুকুর প্রস্তুতি (ভৌত ও জৈব)

- পাড় ও তলদেশ: পাড়ে ঝোপ-ঝাড় থাকলে পরিষ্কার করতে হবে। পানিতে যথেষ্ট পরিমাণে (কমপক্ষে দৈনিক ৮ ঘন্টা) সূর্যালোক প্রবেশের সুবিধার্থে সম্ভব হলে বড় গাছ কেটে ফেলতে হবে। সম্ভব না হলে অন্তত ভেতর দিকের ডাল-পালা কেটে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে পানি নিষ্কাশন করে পুকুরের পাড় মেরামত ও তলদেশ অতিরিক্ত কর্দমমুক্ত করে সমান করতে হবে। অন্যথায় পুকুরের পানির গুণাগুণ দ্রুত খারাপ হয়ে যাবে। তাছাড়া, তলদেশ সমান না হলে পরবর্তীতে মাছ আহরণ করা কঠিন হবে।
- জলজ আগাছা ও অবাঞ্চিত মাছসহ রাক্ষুসে মাছ দুরীকরণ: যদি পানি প্রাপ্তি বিশেষ সমস্যা না হয় তাহলে পুকুরের পানি নিষ্কাশন করে সব জলজ আগাছা এভং অবাঞ্চিত মাছসহ রাক্ষুসে মাছ আপসারণ করা যেতে পারে। পানি প্রাপ্তি সমস্যা হলে, প্রথমে পুকুরে বারবার জাল টেনে যতদূর সম্ভব সকল মাছ ধরে ফেলতে হবে। এরপর অবশিষ্ট সব মাছ ধরে ফেলার জন্য প্রতিশতক আয়তন ও প্রতিফুট পানির গড় গভীরতার জন্য ২৫-৩০ গ্রাম হারে রোটেনন প্রয়োগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ৪ ফুট পানির গড় গভীরতার এক একর পুকুরে ১০-১২ কেজি রোটেনন লাগবে।
- চুন প্রয়োগ: রোটেনন প্রয়োগ করা হয়ে থাকলে প্রয়োগের ২/১ দিন পর প্রতি শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। এই হারে এক একর জলায়তন বিশিষ্ট পুকুরের জন্য চুন লাগবে ১০০ কেজি
- সার প্রয়োগ: সাধারণভাবে একটি পুকুরে প্রস্তুতকালীন সারের সুপারিশকত মাত্রা নিম্নরূপ-

সার	প্রয়োগমাত্রা/শতক
অজৈব সার:	১০০-১৫০গ্রাম

ইউরিয়া	
টিএসপি*	৫০-৭৫ গ্রাম

* টিএসপি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহার করলে ইউরিয়ার প্রয়োগ মাত্রা অর্ধেক হবে।

পোনা মজুদঃ

- সময় ও সতর্কতা: পুকুর প্রস্তুতির ৪/৫ দিন পর যখন পানি হালকা সবুজ রঙ ধারণ করবে তখন পোনা মজুদ করা যাবে। 'চাপের পোনা' ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসেই মজুদ করা হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা পুকুরে ছাড়ার সময় পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পাত্রের পানি পুকুরের পানির সাথে কিছুটা সময় নিয়ে অল্প অল্প করে পরিবর্তন করতে হবে, যেন পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পি এইচ (P^H) ক্রমশ পুকুরের পানির মত হয়ে যায়। এর পর পাত্রের পানিসহ মাছ ধীরে ধীরে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে।

মজুদ হার

- দেশে এখন অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মজুদ হার ব্যবহৃত হচ্ছে, এতে সংখ্যার পাশাপাশি পোনার ওজনও কম-বেশি হয়। পদ্ধতি ও প্রজাতিভেদে পোনার আকার ২৫০ গ্রাম থেকে ১.৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। প্যাডল হুইলে বা এ্যারেটরের সাহায্যে পানিতে অক্সিজেন মিশ্রণ ও পানি প্রবাহ তৈরির সুযোগ থাকলে মজুদ হার বাড়ানো এবং বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব। সফল মজুদহারসমূহের ভিত্তিতে গঠিত চারটি মজুদ মডেল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

মডেল-১: পোনার ওজন ২৫০-৪০০ গ্রাম		
প্রজাতি	সংখ্যা /বিঘা (৩৩ শতাংশ)	সংখ্যা /একর
কাতলা	১৫-২০	৪৫-৬০
সিলভার কার্প	১৬০-২২০	৪৮০-৬৬০
রুই	১৬০-২২৫	৪৮০-৬৮০
মৃগেল/কালবাউস	৯০-১০০	২৭০-৩০০
গ্লাস কার্প	১৫-২০	৪৫-৬০
মিরর কার্প	৮০-৯০	২৪০-২৭০
গ্লাস কার্প	৫-১০	১৫-৩০
মোট	৫২৫-৬৮৫	১৫৭৫-২০৬০

মডেল-২: পোনার ওজন ৪০০-৭৫০ গ্রাম		
প্রজাতি	সংখ্যা /বিঘা (৩৩ শতাংশ)	সংখ্যা /একর
কাতলা	৫০	১৫০
সিলভার কার্প	১০০	৩০০
রুই	১৫০	৪৫০
মৃগেল/কালবাউস	১০০	৩০০
মোট	৪০০	১২০০

মডেল-৩: পোনার ওজন ৭৫০গ্রাম-১ কেজি

প্রজাতি	সংখ্যা /বিঘা (৩৩ শতাংশ)	সংখ্যা /একর
কাতলা	২৫	৭৫
সিলভার কার্প	৭০	২১০
রুই	১২০	৩৬০
মৃগেল/কালবাউস	৬০	১৭৫
গ্লাস কার্প	১০	৩০
মোট	২৮৫	৮৫০

মডেল-৪: পোনার ওজন ১কেজি - ১.৫ কেজি		
প্রজাতি	সংখ্যা /বিঘা (৩৩ শতাংশ)	সংখ্যা /একর
কাতলা	২০	৬০
রুই	৯০	২৭০
মৃগেল/কালবাউস	৫০	১৫০
মোট	১৬০	৪৮০

- কোন কোন অঞ্চলে শিং, মাগুর শতকে ১৫-১৮ টি হারে রুই জাতীয় মাছের সাথে মিলিয়ে চাষ করা হয়। বাজারজাত করার উপযোগী হয়ে গেলে বড় মাছ গুলো ধরে বিক্রয় করে দিয়ে সমসংখ্যাক পোনা পুন:মজুদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে।

পোনার উৎস

বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের চাহিদা পুরণের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'চাপের পোনা' মাছের খামার গড়ে উঠেছে। কোন কোন সরকারী মৎস্য খামার বা অন্য কোন ভাল উৎস থেকে পোনা সংগ্রহ করে অনেক চাষি নিজেরাই খামারের আলাদা ইউনিটে এই ধরনের বিশেষ পোনা তৈরি করে নিতে পারেন।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

গ্রাস কার্পের জন্য আলাদাভাবে কচি ঘাস, ক্ষুদি পোনা, কলাপাতা ইত্যাদি প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে দিতে হবে। এ ছাড়া বাকি সব মাছ প্রধানত তৈরী সম্পূরক খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। খাবার চাষি নিজে তৈরি করে নিতে পারেন অথবা বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাতকরা তৈরি পিলেট খাবার ব্যবহার করতে পারেন। মাছের ওজন গড়ে ১.৫ কেজি হওয়া পর্যন্ত সঠিকভাবে নমুনায়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেহের ওজনের ৩% হারে প্রতিদিন দিতে হবে। এ খাবার সমান দুভাবে ভাগ করে সকাল-বিকাল সমহারে দেয়া যায়। মাছের গড় ওজন ১.৫ কেজির বেশি হয়ে গেলে খাদ্য প্রদান হার ধীরে ধীরে পুকুরে মাছের মোট ওজনের ২.৫% এ নামিয়ে আনতে হবে। নমুনায়ন পনের দিন পরপর মজুদকৃত প্রতিটি প্রজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে করতে হবে। কেবল নির্ভরযোগ্য এবং সরকারী নিয়ম মেনে চলা খাদ্য প্রস্তুতকারীর নিকট হতে খাবার ক্রয় করতে হবে। প্রয়োজনে চাষি নিজেও নিম্নোক্ত ভাবে খাবার তৈরি করে নিতে পারেন। এতে করে একদিকে যেমন উৎপাদনের গুণগতমান নিশ্চিত করা যাবে তেমনি তা মূল্য সাশ্রয়ী হবে।

প্রতি ১০০ কেজি খাদ্য তৈরিতে বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার মাত্রা

খাদ্য উপাদন	**পরিমাণ (কেজি)**
চালের কুড়া/গমের ভুশি	৪৯.৫০
সরিষা/সয়াবিন/তিলের খৈল	২০.০০

ফিশমিল/প্রোটিন কনসেনট্রেট	২০.০০
আটা	৫.০০
চিটাগুড়	৫.০০
ভিটামিন ও খনিজ	০.৫০
মোট	১০০

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় করণীয়

- সংরক্ষিত পিলেট খাদ্য এক মাসের মধ্যে ব্যবহার করে ফেলা উচিৎ। তবে খাদ্যে এন্টি ফাংগাল এজেন্ট/এন্টি- অক্সিডেন্ট ব্যবহার করলে উপযুক্ত পরিকেশে তা ৩-৪ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।
- পোনা মজুদের পর প্রতিদিন সকাল বিকালে মাছের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মেঘলা দিনে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।
- পুকুরের পানি কমে গেলে ভাল উৎস হতে পানি সরবরাহ করতে হবে। অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে পুকুরের পানি বেড়ে গিয়ে উপচে পড়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলে পানি বের করে দিতে হবে।
- সেক্কি ডিস্কে পানির স্বচ্ছতা ৮ সেন্টিমিটারের নীচে নেমে গেলে খাবার দেয়া বন্ধ থাকবে।
- পানিতে অক্সিজেনের অভাবে মাছ পানির উপরের স্তরে উঠে খাবি খেতে থাকে। এই অবস্থায় পানিতে ঢেউ সৃষ্টি করে/প্যাডেল হুইল বা এ্যারেটর ব্যবহার করে বা অন্য কোন উপায়ে পানিতে অক্সিজেনের পারিমাণ বাড়াতে হবে।
- পুকুরের তলায় যাতে বিষাক্ত গ্যাস জমতে না পারে সেজন্য মাঝে মাঝ হররা টানতে হবে।
- জাল টেনে মাঝে মাঝে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।
- বিক্রির উপযোগী মাছ ধরে ফেরতে হবে যেন অপেক্ষাকৃত ছোট মাছগুলো বাড়ার সুযোগ পায়।

আহরণ

- ফেব্রয়ারী-মার্চে মজুদ করে ডিসেম্বরের মধ্যেই সব মাছ ধরে ফেলতে হবে।
- বাজার চাহিদার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঠিক করা প্রয়োজন।
- ভোর বেলায় মাছ ধরতে হবে।

উৎপাদন

বর্ণিত পদ্ধতিতে একর প্রতি মাছের উৎপাদন ৪-৫ টন পাওয়া সম্ভব।

সম্ভাব্য উৎপাদন ব্যয়, আয় ও মুনাফা (এলাকাভেদে ইজারা মূল্য ও উপকরণ মূল্যের পাথক্যের জন্য **ব্যয়, আয় ও মুনাফা** কমবেশী হতে পারে)

জলায়তন এক একর, সময়কাল: ৮-৯ মাস

ব্যয়ের খাত	ব্যয় (টাকা)
ইজারামূল্য, পুকুর প্রস্তুতি, রোটেনন, চুন, সার, ইত্যাদি): থোক	৬০,০০০.০০
পোনা: বিভিন্ন মডেলের গড় থোক (মডেল ভেদে তারতম্য হবে)	৫০,০০০.০০
খাবার: ৯০০০ কেজি x ৪০ টাকা (নিজস্ব খামারে উৎপাদিত)	৩৬০,০০০.০০

অন্যান্য (শ্রমিক, জালটানা, ঔষধপত্র, বাজারজাতকরণ): থোক	১,০০,০০০.০০
ব্যাংক সুদ (১০% হারে, ৯ মাসের জন্য)	৩৯,৩৭৫.০০
মোট ব্যয়	৬,০৯,৩৭৫.০০

আয়: উৎপাদন ৪৫০০ কেজি × ২২৫ টাকা প্রতি কেজি হারে= ৳ ১০,১২,৫০০.০০

ব্যয়: = ৳ ৬,০৯,৩৭৫.০০

মুনাফা= ৳ ১০,১২,৫০০.০০ - ৳ ৬,০৯৩৭৫.০০= ৳ ৪,০৩,১২৫.০০

উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার সাধারণ নিয়মাবলি সর্বক্ষেত্রে সঠিকভাবে মেনে একজন চাষি এ পরিমাণ মুনাফা তুলে নিতে পারবেন।

‡RPvi m‡P!b!v 6 gvS Pv‡# bvi?

‡RPvi m‡P!b!vZ

জেন্ডার শব্দটির অর্থ অভিধানের ভাষায় লিঙ্গ বলা হয়। সাধারণত ব্যাকরণেও জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয় লিঙ্গ চিহ্নিত করা জন্য, যেমন- পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লিবলিঙ্গ, ইত্যাদি। কিন্তু এভাবে জেন্ডার এবং সেক্স একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন, সাহিত্যে জেন্ডারের ভিন্ন ও ব্যাপকতর অর্থ নির্দেশিত হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাই জেন্ডার এবং সেক্সের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরষের বৈশিষ্ট্য সূচক ভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরষের স্বাতন্ত্র্য কিংবা শরীর বৃত্তিয়ভাবে নির্ধারিত নারী ও পুরয়ের বৈশিষ্ট্য যা জন্মগত এবং সাধারণত অপরিবর্তনীয়।

জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী ও পুরষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী ও পুরষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী ও পুরষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয় এবং সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন/বিভিন্ন হয়ে থাকে।

বস্তুত নারী ও পুরষ এই বিপরীত লিঙ্গের মধ্যকার সম্পর্কের সামাজিক রূপই হচ্ছে জেন্ডার। এক কথায় জেন্ডার হচ্ছে নারী ও পুরষের মধ্যকার সমাজ সৃষ্ট সম্পর্ক এবং লিঙ্গ হচ্ছে নারী ও পুরষের জন্মগত বা জৈবিক বৈশিষ্ট্য।

জেন্ডার সম্পর্ক সংস্কৃতি, জাতি, ধর্ম শ্রেণী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হলেও গোটা বিশ্বজুড়ে দু টি গুরত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সাধারণত অভিন্ন অবস্থা বিদ্যমান। নারী-পুরষের দৈনন্দিন কাজ, দায়-দায়িত্ব, ব্যবহৃত সময়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বা অসমতা অর্থাৎ জেন্ডারভিত্তিক শ্রম বিভাগ। দ্বিতীয়ত পুরষের তুলনায় সম্পত্তি, অধিকার, পছন্দ, ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর দুর্বলঅবস্থা, বা সুযোগের অভাব অর্থাৎ সমাজে নারীর অমর্যাদাজনক বা দুর্বলঅবস্থান।

‡RPvi 2wgKv

পৃথিবীতে নারী এবং পুরষ যে কাজগুলো করে তাদের এক কথায় বলে জেন্ডার ভূমিকা।

জেন্ডার ভূমিকা তিন ধরনের-

ক. পুনঃ উৎপাদনমূলক (গৃহস্থালি) ভূমিকা
খ. উৎপাদনমূলক (আয়মূলক) ভূমিকা
গ.সামাজিক ভূমিকা

পুনঃ উৎপাদনমূলক ভূমিকা

এ জাতীয় কাজগুলো কোন বিনিময় মূল্য ছাড়াই নিজেদের প্রয়োজনে করা হয়ে থাকে। যেমন-সন্তান ধারণ ও লালন পালন, বাড়িঘর রক্ষণাবেক্ষণ, শ্রম শক্তিযোগাদারদের যত্ন- অতীত (দাদা-দাদী, নানা-নানী, পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি), বর্তমান (স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, দেবর, ননদ, ইত্যাদি), ভবিষ্যত (পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনী)।
জীবন ধারণ ও মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এ জাতীয় কাজ অপরিহার্য। এ কাজগুলো নিজেদের প্রয়োজন করা হয় এবং সাধারণত এ কাজগুলো নারীরাই করে থাকে। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে পুরুষের অংশগ্রহণ প্রায় নেই বললেই চলে।
উৎপাদনমূলক (আয়মূলক) ভূমিকা
যে কাজ করলে আয় হয় সে সব কাজগুলোকে এক কথায় উৎপাদন ভূমিকা বলে। এই আয় সরাসরি অর্থের মাধ্যমে হতে পারে আবার দ্রব্যের মাধ্যমেও হতে পারে যার কিছু না কিছু বিনিময় মূল্য আছে। যেমন -চাকুরী করা, ব্যবসা করা, রিক্সা চালানো, ইট ভাঙ্গা, ইত্যাদি। সরাসরি অর্থের সাথে জড়িত বলে এ জাতীয় কাজ সব সময় গুরুত্ব পেয়ে থাকে এবং যারা এ ধরণের কাজের সাথে যুক্ত তাদের মর্যাদা বেশি।
আমাদের সমাজে আয়মূলক কাজের সাথে সাধারণত পুরুষেরাই বেশি যুক্ত।

সামাজিক ভূমিকা
যে সব কাজ কোন বিনিময় মূল্য ছাড়াই সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে করা হয় তা হলো সামাজিক ভূমিকা। এই ভুমিকা মূলত দুই ধরনের -ক) সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা খ) সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা।

ক) সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা
অর্থ বা পারিশ্রমিক ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সকলের স্বার্থে যা করা হয় তা হলো সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা। যেমন গ্রামের সকলে বা কয়েকজন অথবা একাই পুরাতন সাঁকো ও রাস্তা মেরামত, বাধ নির্মাণ, মৃত্যুবাষিকী পালন, ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানের সাহায্যসহযোগিতা করা। নারী-পুরুষ উভয়েই এই ভূমিকা অংশ নিতে পারে।

খ) সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা
সমাজের কল্যাণার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে যে ভূমিকা পালন করা হয় তা হলো সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি হচ্ছে সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের প্রধান দিক। যেমন ইউনিয়ন পরিষদের কর্মসূচী, কোথায় স্কুল হবে, ইত্যাদি। মোটকথা সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা হলো সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা আর সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা ঐ কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত।
সাধারণত পুরুষেরা দু ধরনের উৎপাদনমূলক এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা ওসামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা, পালন করে এবং নারীরা তিন ধরনের যথা- পুনঃ উৎপাদনমূলক, সামাজিক ব্যবস্থাপনাএবং সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে এবং তিনটি ভূমিকার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে।

‡RPvi PwR%v
চাহিদা বলতে মানুষের জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণের প্রয়োজনীয়তাকে বুঝি। সাধারণ চাহিদা ও জেন্ডার চাহিদার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। জেন্ডার চাহিদা কেবল নারীদের দেশ কাল অবস্থানগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও বিশ্বব্যাপী এখনও নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক দূর্বল অবস্থায় আছে এবং এই কারণেই জেন্ডার চাহিদা প্রধানত নারীদের হয়ে থাকে। জেন্ডার

PwR%v %Ei‡bi -
ক) বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা এবং খ) কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা।

বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা

নারীর প্রাত্যহিক জীবনযাপন ও তার কাজ-কর্ম সম্পাদনের বাস্ড়ব সমস্যা থেকে উভূদত হয় বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা। একজন নারী (সকাল থেকে রাত) তার দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করতে গিয়ে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ নারীরা তাদের তিন ধরনের ভূমিকা পালনে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়, বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তা দূর করা সম্ভব। বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নারীর প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকা পালন সহজতর হয়। কাজের বোঝা হ্রাস পায়। ফলে জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়, দায়িত্ব আরও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারে। যেমন, নারীর দূর থেকে খাবার পানি সংগ্রহের কষ্ট লাঘবের জন্য বাড়িতে টিউবওয়েল বা পাকা কুয়া স্থাপন, উন্নত চুল্লী সরবরাহের মাধ্যমে জ্বালানি ও শ্রমের সাশ্রয় করা, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, নারীকে আয় উপার্জনমূলক কাজে জড়িত করে সংসারের অভাব কিছুটা দুর করা, ইত্যাদি হলো জেন্ডার চাহিদা পূরণের নমুনা।

বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নারীর অবস্থানের উন্নয়ন ঘটলেও তা কিন্তু সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে না। অর্থাৎ নারী-পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতা পরিবর্তনে সরাসরি সহায়তা করে না। এই চাহিদা সহজে পূরণ করা সম্ভব এবং চাহিদা পূরণের উপকরণ বা উপায়গুলো প্রত্যাহার করে নিলে নারীর অবস্থা আবার পূর্বের মত হয়ে পড়ে।

কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা

সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর দুর্বল অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন থেকে নারীর কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার উদ্ভব। পুরুষের তুলনায় নারীর অধস্তন অবস্থার বিশ্লেষণ এবং তা মোকাবেলা করার জন্য কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা চিহ্নিত করা হয়। মোটকথা ক্ষমতা, অধিকার, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পছন্দ ও সুযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতা বা বৈষম্য দুর করার জন্য যে চাহিদার উদ্ভব হয় সেটা হলো কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা। জেন্ডার শ্রম বিভাগ, ক্ষমতা, মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ, আইনগত অধিকার অর্জন, সমান মজুরি প্রাপ্তি, সম্পদে মালিকানা ও নিজ আয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ, নিজ দেহ ও প্রজননের ওপর আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার, পারিবারিক নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ, ইত্যাদি কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেহেতু এই জেন্ডার চাহিদা নারীর মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ, অধিকার, ক্ষমতা, ইত্যাদি অর্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাই এটা পূরণ অত্যন্ত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। এর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা।

জেন্ডার এবং উন্নয়ন

নারীরা পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক, মোট শ্রমশক্তি ৪৮% এবং জাতীয় আয়ে নারীর অবদান ৩০ ভাগ। নারীরা পৃথিবীর মোট কাজের দুই/তৃতীয়াংশ সম্পাদন করে এবং পুরুষের চাইতে প্রায় ১৫ গুণ সাংসারিক কাজের বোঝা বহন করে। কিন্তু মোট সম্পাদনের মাত্র এক ভাগের মালিক হলো নারীরা এবং মোট আয়ের ১০ ভাগের ১ ভাগ লাভ করে নারীরা। গোটা দুনিয়ার চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী ১৫৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৭০ ভাগই হলো নারী। যেহেতু নারীর সাংসারিক কাজকে উৎপাদনমূলক বা অর্থনৈতিক কাজ হিসাবে গণ্য করা হয় না সেহেতু প্রতি বছর বিশ্ব অর্থনীতি থেকে নারীর এই অদৃশ্য অবদানস্বরূপ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায় অর্থাৎ পরিমাপ করা যায় না। সমাজে ক্ষমতার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রাপ্তি থেকে নারীরা বঞ্চিত হবার মূল কারণ জেন্ডার শ্রম বিভাগের মধ্যে। সে জন্যই সমগ্র মানব জাতির স্বার্থেই ন্যায্যসমতার ভিত্তিতে উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করাটা জরুরী কর্তব্য। আর এর অর্থই জেন্ডার সচেতন হয়ে ওঠা এবং সে জন্যই জেন্ডার আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ইস্যু হয়ে উঠেছে।

gvSPv‡# bvi?

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ৩৬.৩ নম্বর অনুচ্ছেদে কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ প্রদান করার বিষয়ে উল্লেখ আছে। অপরদিকে, জাতীয় মৎস্যনীতি ১৯৯৮ ও জাতীয় মৎস্য কৌশল ২০০৬ এর আলোকে ইতোমধ্যেই গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কৌশল ও নীতিমালায় মৎস্যচাষ ও তদশংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকান্ডে সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ অগ্রাধিকার ও সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। জাতীয় মৎস্যনীতির উদ্দেশ্যবলীর মধ্যে অন্যতম হল :

- মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও মৎস্যজীবিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন; এবং
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন, মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন কর্যক্রমে নিয়োজিত থেকে আত্মকর্মসংস্থানসৃষ্টি এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে নারীর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ রয়েছে। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার সাথে সন্মিলিতভাবে বাড়ির আঙ্গিনাস্থ পুকুরে পুষ্টিসমৃদ্ধ ছোট মাছ চাস সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে পারিবারিক আয়বৃদ্ধি, মহিলা/শিশুদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও সামাজিকভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ: নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য সেক্টরের অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রসমূহ, যেখানে আরো অধিকসংখ্যক নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে, হলো :

- বসতবাড়ি সংলগ্ন পুকুরে সমন্বিত ও পরিবেশবান্ধব মাছ ও চিংড়ি চাষ এবং পোনা প্রতিপালন;
- সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও খাঁচায় মাছচাষ;
- জলমহল ব্যবস্থাপনা, বিল নার্সারি স্থাপন ও পরিচালনা;
- মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম তৈরি ও বিপনন;
- হওড়-বাঁওড় ও খাল-বিলে মাছ ধরার মৌসুমে অতিরিক্ত মাছ ও চিংড়ির স্বাস্থ্যসম্মত শুটকিকরন;
- পারিবারিক পর্যায়ে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ও সহজলভ্য উপকরণের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকরণ;
- মাছ ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় কর্মী হিসাবে; এবং
- সেক্টর-সংশ্লিষ্ট বিকল্প কর্মসংস্থান।

এক্ষেত্রসমূহে নারীর পদচারণা যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের উদ্দেশ্যে আপামর নারী কর্মীগণকে চাহিদাভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো, শতকরা ৩৫ ভাগ নারী সিআইজির সদস্য হিসেবে প্রকল্পের সেবার আওতায় আনা। নারীদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করার জন্য লক্ষ্যে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। যেমন, প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ, এআইএফ-২ অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর ইত্যাদি। মাছ চাষের মত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ফলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ঘটছে এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত হচ্ছে। ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির সাথে মৎস্য সেক্টর উন্নয়ন কর্মকান্ডে জেন্ডার সমতাকরণের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জিত হবে।

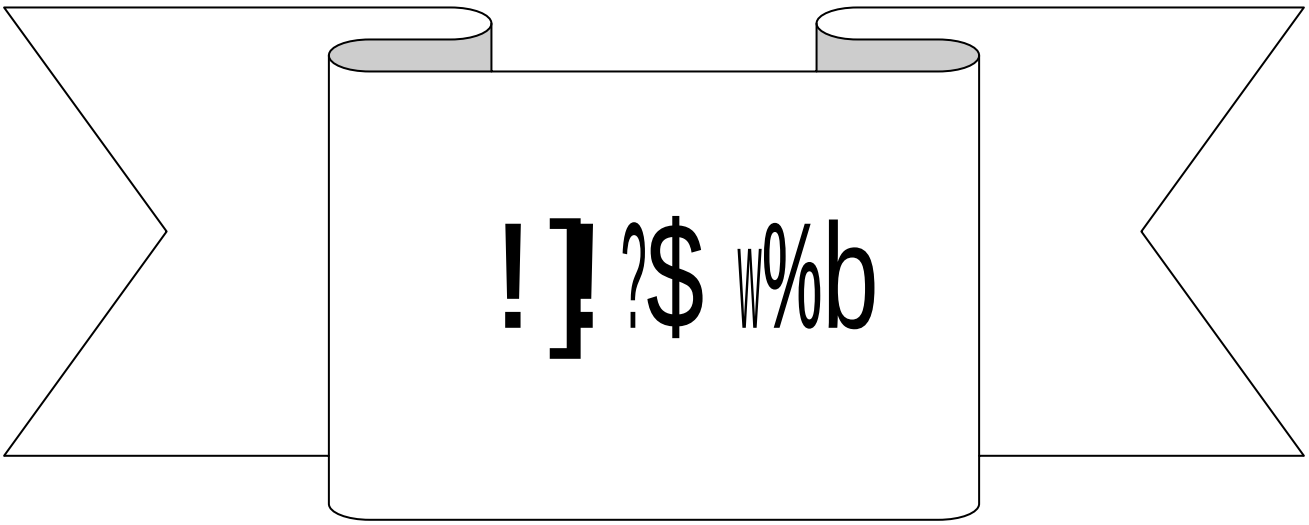

- উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (GAqP), ও মাছচাষে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
- মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যায় বরফের ব্যবহার

- ➢ মাছচাষে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা
- ➢ মৎস্য সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা
- ➢ কোর্স পুনরালোচনা, প্রশিক্ষণ-পরবর্তী মূল্যায়ন, কোর্স মূল্যায়ন এবং সমাপনী

Blg g,m¨Pv# AbÆjb

() Blg g,m¨Pv# AbÆjb v UA A¨v‡Kv$vKvjPvicÖKwUm **(Good Aquaculture Practice-GAqP)** K?€

উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন বা GAqP হলো- চাষ, আহরণ ও আহরণোত্তর পর্যায়ে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত নিয়মাবলি অনুসরণ করে দূষণমুক্ত ও নিরাপদ মাছ/চিংড়ি উৎপাদন করা। তবে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং পরিবেশ সহনীয় হতে হবে। সামগ্রিকভাবে খামার পরিকল্পনা, পুকুর তৈরি, পোনার মান, খাদ্য ও পানির গুণাগুণ ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও আহরণোত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সবই GAqP এর আওতায় আসে। বাংলাদেশের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং মাছের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারের জন্য এটি অপরিহার্য।

GAqP Gi B‡yk¨ R‡jv @

- ভোক্তার জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত মাছ/চিংড়ি উৎপাদন করা ;
- মানবদেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে এমন রোগজীবাণু দ্বারা মাছ/চিংড়ি যাতে সংক্রমিত না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;
- ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক যেমন- নাইট্রোফুরান, ক্লোরামফেনিকল বা অন্য কোন ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা কীটনাশক দ্বারা চিংড়ি দূষিত হবেনা;
- মাছচাষের শুরু থেকে আহরণ ও আহরণোত্তর পরিচর্যা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে চাষীর এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করা যাতে উৎপাদিত মাছ বা চিংড়ি মানব স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

2) wbivc% g,m¨ 6 wPswT K?

নিরাপদ মৎস্য ও চিংড়ি হলো- খামারে উৎপাদিত মৎস্য ও চিংড়ি সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত এবং তাতে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর কোন উপাদান না থাকা।

+) 5vgv‡ii mvw K ¨ =vebv$ AbÆ.?$ cÖb cÖb Blg AbÆjbmgR

প্রত্যেক চাষীকে চাষের প্রতিটি পর্যায়ে গুড প্র্যাকটিস অনুসরণ করতে হবে ঃ

+)(5vgv‡ii A =vb m-3wK'!

- আশেপাশের বাড়িঘর, গৃহপালিত পশুর খামার, আবর্জনা ইত্যাদি হতে পানি দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন স্থানে খামার নির্মাণ করতে হবে ;
- খামার নির্মাণের সম্ভাব্য স্থানে অতীতে কীটনাশক, ভারী ধাতু ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে কিনা এবং বর্তমানে মাটিতে তার কোন অবশেষ (Residue) বিদ্যমান আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে ;
- ক্ষতিকর জীবাণু আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে ।

+)2 g,m¨\wPswTPv‡# ¨ w! cwb m-3wK'!

- পার্শ্ববর্তী নদী, খাল, বিল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উৎস থেকে খামারে পানি দূষণের সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে হবে ;
- খামারের পানিতে ক্ষতিকর জীবাণু (কলিফর্ম, স্যালমোনেলা), ভারী ধাতু (আয়রন, জিংক, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, লেড, মার্কারি, কোবাল্ট, ক্যাড্মিয়াম), কীটনাশক, অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি আছে কিনা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে;
- কলকারখানা ও নর্দমার দূষিত পানি ঘেরে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকলে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে ;
- খামারে বৃষ্টির গড়ানো পানির প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

+)+5vgv‡ii Av‡kcv‡ki cwi‡ k m-3wK'!

- বন্যা প্রবণ, ময়লা-আবর্জনার স্তুপের আশেপাশে খামারের স্থান নির্বাচন করা যাবে না।
- খামারের আশেপাশের ঝোঁপ-ঝাড়, জলজ আগাছা, ময়লা আবর্জনা যা ক্ষতিকর জীবাণুবাহী প্রাণীকে আকৃষ্ট করতে পারে তা পরিষ্কার করতে হবে।
- খামারের পাড়ে বা আশেপাশে মলমূত্র ত্যাগ করা যাবে না।
- খামারেপশু-পাখীর বিচরণ বন্ধ করতে হবে।

+)C 5vgv‡ii cwipvi-cwibSbOv, =I=>¨ =vebv

- খামার প্রাঙ্গন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (জাল, বাকেট, বাস্কেট ও অন্যান্য সরঞ্জাম) পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।
- একবার ব্যবহৃত সরঞ্জাম পুনরায় ব্যবহারের পূর্বে জীবাণূমুক্ত করতে হবে। এক খামারের সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত না করে অন্য খামারে ব্যবহার করা যাবে না।
- খামারে কর্মচারী ও মানুষের যথেচ্ছ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- খামারে কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিতে হবে।
- গৃহপালিত পশু-পাখির গোবর বা বিষ্ঠা সার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
- খামারে কর্মরত লোকজনকে ঘের বা পানির উৎস সংলগ্ন এলাকায় মলমূত্র ত্যাগ করতে দেয়া যাবে না।

+)* g,m¨\wPswTi 5v%¨ m-3wK'! /!Ö m!K'!v

- কেবল নির্ভরযোগ্য উৎস হতে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে হবে। খাদ্যের মান ও নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে ২-৩ মাসের মধ্যে সংরক্ষিত খাবার ব্যবহার করে ফেলতে হবে ;
- খাদ্যের ব্যবহৃত উপকরণের গুণগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং তাতে ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক বা রাসায়নিকের উপস্থিতি আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে ;
- মৎস্য বা চিংড়ির বর্ধনের জন্য হরমোন জাতীয় কোন উপাদান খাদ্যে ব্যবহার করা যাবে না ;
- পুরানো, বাসি, মেয়াদ উত্তীর্ণ, দুর্গন্ধ ও ছত্রাকযুক্ত নিম্নমানের খাবার ব্যবহার করা যাবে না ;
- কাঁচা খাবার সরাসরি ঘেরে ব্যবহার করা যাবে না ;
- পরিষ্কার, শুষ্ক ও ঠান্ডা পরিবেশে পাকা মেঝে প্লাটফর্ম এর উপর খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে ;
- খাদ্য গুদামে জীবাণুবাহী তেলাপোকা, ছুঁচো, ইঁদুর, বেজি, পাখি, ইত্যাদির প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

+)F v#4 ¨ Rvi m-3wK'!

- কেবল সর্বশেষ উপায় হিসেবে অনুমোদিত ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে ;

- ঔষধ সংরক্ষণে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ;
- সঠিক ব্যবহারবিধি মেনে ঔষধ ব্যবহার করতে হবে ;
- ঔষধ ব্যবহারের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে ;
- অবশেষ নিঃশেষের সময় (Withdrawal period) মেনে চলতে হবে।

+)G g,m¨\ wPsiT AvRi. msOvH•

- মৎস্য/চিংড়ি আহরণের পূর্বে ক্ষতিকর জীবাণু (স্যালমোনেলা, কলেরা, ই.কলাই) ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে ;
- মৎস্য বা চিংড়ি আহরণের ২ দিন আগে থেকে খাবার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে ;
- ভোরে অথবা ঠান্ডা আবহাওয়ায় চিংড়ি আহরণ করতে হবে;
- মৎস্য/চিংড়ি সংরক্ষণে পানযোগ্য পানি দিয়ে তৈরি বরফ ব্যবহার করতে হবে ;
- আহরিত মৎস্য/চিংড়ি বরফঠান্ডা পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে। আহরণের সাথে সাথে প্রতি কেজি মৎস্য/চিংড়িতে এক কেজি বরফ দিয়ে সংরক্ষণ ও দ্রুত পরিবহন করতে হবে ;
- বরফ পরিবহনে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।

+)J g,m¨\wPsiTPv‡#i mvgwRK 6 cwi‡ kM!

- খামারের জমির বৈধ মালিকানা থাকতে হবে ;
- আশেপাশের জলজ ও স্থলজ পরিবেশ এবং বন্য প্রাণীর আবাসস্থল নষ্ট করতে পারে এমন জায়গায় খামার তৈরি করা যাবে না ;
- উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও প্রাকৃতিক জলাভূমি ধ্বংস করে পুকুর/ঘের তৈরি করা যাবে না ;
- গুরুত্বপূর্ণ পানির প্রবাহকে পরিবর্তন করতে হবে এমন জায়গায় মৎস্য/চিংড়ি চাষ করা যাবে না ;
- আশেপাশের জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা ও যাতায়াত ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন জায়গায়মৎস্য/চিংড়িচাষ করা যাবে না
- খামার/ঘেরের কারণে যাতে মাটি ও আশেপাশের জলাশয়ের লবণাক্ততা বৃদ্ধি না পায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে ;
- খামারের কালো মাটি ও বর্জ্য শোধন না করে বাইরে কোথাও ফেলা যাবে না।

+)e g,m¨ 6 wPsiTPv‡# kg AwÂKvi 6 wkM k‡gi ¨ Rvi m-3wK'!

- শ্রমিকের লিখিত নিয়োগপত্র থাকতে হবে ;
- শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী খামারে শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে ;
- শ্রমিকদের ঘোষিত ন্যূনতম মজুরী ও প্রাপ্য সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে ;
- খামারে ১৪ বছরের কম বয়সের কোন শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না

উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন বিষয়ক কয়েকটি বিশেষ বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১. মাঘ মাসে পুকুর প্রস্তুতি

মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে ফাল্গুন মাস হতে মাছের উৎপাদন বর্ষ শুরু হয়। মাছের উৎপাদন বছরের শুরুতেই পোনা মজুদের জন্য পুকুর প্রস্তুতির কাজ মাঘ মাসেই সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এটি মাছ চাষে সাফল্যের প্রথম সোপান। এক্ষেত্রে নিচের কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করণীয়ঃ

১.১ পাড় মেরামত

১.২ চুন প্রয়োগ

১.৩ সার প্রয়োগ

২. ফাল্গুন মাসে চাপের পোনা মজুদ

রুইজাতীয় মাছের বেলায় এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ গত বছরের শীত পার করা ও চাপেরাখা পুরাতন চাপের পোনার বয়স বেশি হওয়ার কারণে এগুলো মৌসুমের শুরু হতেই দ্রুত বাড়তে থাকে। ফলে খুব কম সময়েই এগুলো বাজারজাত করা যায়।

৩. নির্বাচিত প্রজাতির নির্দিষ্ট সংখ্যায় ও অনুপাতে বড় মাপের গুণগত মানসম্মত পোনা মজুদ

উৎপাদন বছরের শুরুতে নির্বাচিত প্রজাতির বড় মাপের নির্দিষ্ট সংখ্যক গুণগত মানসম্মত পোনা নির্দিষ্ট অনুপাতে মজুদ করা মাছ চাষে সাফল্যের তৃতীয় সোপান। সাধারণত পোনা যত বড় হবে উৎপাদন তত বেশি হবে। মৎস্য অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশনকৃত পরীক্ষিত ভালো হ্যাচারি হতে গুণগত মানসম্মত পোনা সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

৪. পোনা টেকসইকরণ ও সঠিক নিয়মে জলাশয়ে অবমুক্তকরণ

৫. প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ এবং দৈনিক নিয়মিত সুষম সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ গোবর বা হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ব্যবহার করা চলবেনা।

৬. মাসে মাসে জাল টেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষণ

৭. আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে জীবন্ত মাছ বিপণন

gv‡Si †ivM, cÖwZKvi 6 xØX ¨ =e¨bv

রোগ হচ্ছে যে কোন প্রাণীর দেহের অস্বাভাবিক অবস্থা যা বিশেষ কিছু লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ পায়। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মাছ ও চিংড়ির মাঝেও নানা ধরনের রোগ বালাই হতে দেখা যায়। রোগ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অজ্ঞতা বা অবহেলার কারণে প্রতি বছরই অনেক চাষির পুকুরে ব্যাপক আকারে মাছ ও চিংড়ি মারা যায়। চাষি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং দেশ লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় থেকে বঞ্চিত হয়।

†iv‡Mi Kvi.

জলজ পরিবেশের চাপ, রোগ-জীবাণু এবং মাছ ও চিংড়ির অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সে জন্য মাছ ও চিংড়ি রোগাক্রা হওয়ার পিছনে একাধিক কারণ বা বিষয় কাজ করে। এখন পর্যন্ত যে সব কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

- পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণের অবনতি (পানির তাপমাত্রা, পচা জৈব পদার্থ, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি)
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ও খাদ্য প্রয়োগ
- বাইরে থেকে ময়লা ধোয়া দূষিত পানির প্রবেশ
- অধিক মজুদ ঘনত্ব
- প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব
- ত্রুটিপূর্ণ পরিবহন ও হ্যান্ডেলিং
- পরজীবী ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণ

নিচের প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে মাছ ও চিংড়ির রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণ বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা যায়-

রোগের কারণ এবং মাছ ও চিংড়ির মড়কের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পানির পরিবেশ দূষিত হওয়ার ফলে পোনার মৃত্যহার অধিক হয় এবং পোনা দ্রুত মারা যায়। পোনার মড়কের অন্যান্য কারণ, যেমন- রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু, পুষ্টির অভাব ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া অপেক্ষা পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা অনেক বেশি।

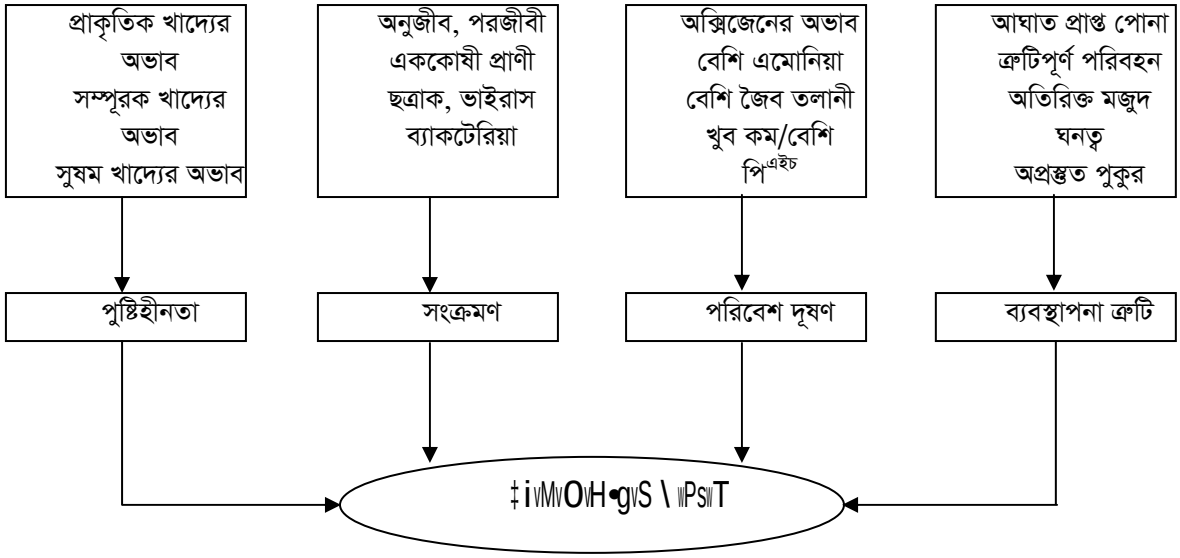

†iv‡Mi mv4vi. j7.

রোগের প্রকারভেদ ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বা পরজীবীর আক্রমণের ধরন অনুযায়ী রোগাক্রান্ত মাছ ও চিংড়ির মাঝে বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে রোগাক্রান্ত মাছ ও চিংড়ির মধ্যে যে সমস্ত লক্ষণ ও আচরণ বেশি দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-

রোগাক্রান্ত মাছ

- ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং ছন্দহীনভাবে পানির উপর সাঁতার কাটে
- শরীরের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে
- খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেয় বা একেবারে বন্ধ করে দেয়
- পানির উপর ভেসে খাবি খায়
- ফুলকার স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে যায়
- দেহের উপর লাল/কালো/ সাদা দাগ পড়ে
- দেহে বিজল থাকে না, দেহ খসখসে হয়ে যায়
- মাছ পানির তলদেশের কোন কিছুর সাথে গাঁ ঘষতে থাকে
- চোখ ফুলে যায় বা বাইরের দিকে বের হয়ে আসে।

রোগাক্রান্ত চিংড়ি

- ঠিকমত খাদ্য গ্রহণ করে না
- ধীর গতিতে চলাচল করে
- এলোমেলোভাবে পানির উপর সাঁতার কাটতে থাকে
- পাড়ের কাছাকাছি ভেসে থাকে, কখনও পাড়ে উঠে আসে
- খোলস নরম হয়ে যায়
- ফুলকায় কালো দাগ দেখা যায়
- খোলসের উপর নীলাভ রং বা শেওলা জমে যায়
- হাঁটার অংগ এবং এণ্টিনা খসে পড়ে অথবা বাঁকা হয়ে যায়।

gvS 6 wPswTi mv4vi. tivM

মাছ ও চিংড়ির রোগ চিকিৎসা অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। কারণ রোগ সনাক্তকরণ ও প্রতিটি মাছ বা চিংড়ির আলাদা আলাদাভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তারপরও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে এগুলোর চিকিৎসা বা রোগের প্রতিকার করা জরুরী হয়ে পড়ে। নিচে মাছ ও চিংড়ির কিছু সাধারণ রোগ ও এগুলোর প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

gv‡Si mv4vi. tivM

7! tivM

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের অধিকাংশ মাছ এ রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারণত শীত মৌসুমে এ রোগের সংক্রমণ বেশি হয়। এখন পর্যন্ত এ রোগের সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। তবে দূষিত পরিবেশে ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে বলে ধারণা করা হয়।

লক্ষণ

- ত্বকে লাল দাগ ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়
- ক্ষতস্থানে রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায়।

প্রতিরোধ

শীতের শুরুতে ১ কেজি/প্রতি শতকে পুকুরে চুন প্রয়োগ এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখলে এ রোগ সাধারণত: হয় না

প্রতিকার

২-৪ পিপিএম পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে ১ মিনিট গোসল

১২৫ পিপিএম ফরমালিন দ্রবণে মাছকে গোসল করানো (যতক্ষণ সহ্য করতে পারে)।

<u>†jR 6 cv5bv cPv †ivM</u>

এ রোগ সাধারণতঃ অ্যারোমোনাস ও মিক্সো-ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। কার্পজাতীয় মাছে আক্রমণ বেশি হলেও মাঝে মাঝে পাংগাস মাছেও এ রোগ দেখা যায়। সাধারণত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে মাছ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

লক্ষণ

- মাছের দেহ ঘোলাটে বর্ণ ধারণ করে
- ত্বকের পিচ্ছিলতা কমে যায়
- প্রাথমিক পর্যায়ে লেজ ও পাখনায় লাল দাগ দেখা যায়
- পাখনার পর্দা ছিড়ে যায় এবং আস্তে আস্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

প্রতিরোধ

পুকুরে ১ কেজি/প্রতিশতক হারে চুন প্রয়োগ।

প্রতিকার

- ২.৫% লবণ পানিতে ২-৩ মিনিট গোসল
- ২-৪ পিপিএম পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে ১ মিনিট গোসল।

<u>Aeš^m (‡cUdŠjv †ivM)</u>

ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগের সংক্রমণ হয়ে থাকে। সরপুটি, গ্রাসকার্প, সিলভারকার্প ও শিং-মাগুরজাতীয় মাছে এ রোগ বেশি সংক্রমিত হতে দেখা যায়। সাধারণত শীতের প্রাক্কালে ও শীতকালে এ রোগ বেশি হয়ে থাকে।

লক্ষণ

- রোগাক্রান্ত মাছের পেট ও আঁইশের নিচে পানি জমে
- মাছের পেট ফুলে বেলুনের মত আকার ধারণ করে
- চামড়ায়ঘা হয় ও অন্ত্র ফুলে যায়
- আঁইশ আলগা হয়ে যায়।

প্রতিরোধ

- সুষম খাদ্য প্রয়োগ
- জৈব সার কম দেয়া
- প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ

প্রতিকার

- প্রতি কেজি খাবারে ২৫০ মি.গ্রাম রেনাভেট মিশিয়ে ৪-৭ দিন খাওয়ানো

<u>AviU‡jwmm (gv‡Si BKb^)</u>

সব ধরনের মাছে এ রোগ হতে পারে। সাধারণত মাছের পাখনা ও আঁইশের ফাঁকে আরগুলাস নামক এক প্রকার পরজীবী দ্বারা মাছ আক্রান্ত হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে আরগুলাসের আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে।

লক্ষণ

- মাছ অবিরাম ছুটাছুটি করতে থাকে
- মাছের গায়ে এ পরজীবী লেগে থাকতে দেখা যায় খালি চোখেই
- মাছ শক্ত জিনিসের সংগে গা ঘষতে থাকে

- দেহের বিভিন্ন স্থানে লাল ক্ষতের সৃষ্টি হয়

প্রতিকার

- ১০ লি. পানিতে ২০০ গ্রাম লবণ মিশিয়ে ঐ দ্রবণে মাছকে গোসল করানো
- পুকুরে ৬-১২ গ্রাম/শতাংশ/ফুট হারে ডিপটেরেক্স পরপর ৩ সপ্তাহ প্রয়োগ অথবা
- সুমিথিয়ন ২-৩ মিলি/শতাংশ/ফুট হারে পরপর ৩ সপ্তাহ পুকুরে প্রয়োগ।

প্রতিরোধ

- প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ
- আক্রান্ত পুকুরে ব্যবহৃত ভেজা জাল অন্য পুকুরে ব্যবহার না করা

ScvK †ivM (‡m‡cÖ Mwb$vwmm)

এ রোগ সাধারণত রুইজাতীয় মাছের সকল প্রজাতি ও অন্যান্য চাষযোগ্য মাছে সংঘটিত হতে দেখা যায়। মাছের ডিম এবং রেণুর এটি একটি প্রধান রোগ। রোগ সংক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে মাছের মড়ক দেখা দেয়। রোগটি সংক্রামক।

লক্ষণ

- মাছের দেহে বা ডিমে মিহি সুতার ন্যায় উজ্জ্বল বস্তু দেখা যায়।
- মাছের দেহে অতিরিক্ত পিচ্ছিল পদার্থের উপস্থিতি দেখা যায়
- সংক্রমণের মাত্রা বেড়ে গেলে মাছের ক্ষুধা হ্রাস পায়, মাছ ধীরে ধীরে ও অলসভাবে চলাফেরা করে, মাছের আক্রান্ত অংশে পচন ধরে, মাছে ব্যাপক হারে মড়ক দেখা দেয়।

প্রতিরোধ

- হ্যাচারির সকল যন্ত্রপাতি ও ট্যাংক সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করার পর শতকরা ১০ভাগ ফরমালিন পানি দিয়ে ধৌত করা
- অনিষিক্ত ও মৃত ডিমগুলোকে অবিলম্বে হ্যাচারি ট্যাংক থেকে সরিয়ে নেয়া এবং অধিক খাদ্য প্রয়োগ না করা।

প্রতিকার

- হ্যাচারিতে লালনকৃত ডিমগুলোকে ২৫০ পিপিএম ফরমালিন দিয়ে ধৌত করা
- ০.১০-০.১৫ পিপিএম মিথিলিন ব□ দ্বারা আক্রান্ত পোনা বা ডিমগুলোকে ধৌত করালে বা দ্রবণে ১-২ ঘন্টা গোসল করালে প্রতিকার পাওয়া যায়
- ০.১৫-০.২০ পিপিএম হারে ম্যালাকাইট গ্রীন পুকুরে প্রতি সপ্তাহে একবার দু' থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- ২.০-২.৫ শতাংশ লবণে আক্রান্ত মাছকে যতক্ষণ সহ্য করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত মাছকে গোসল করানো।

cÖEi A2v Rwb! †ivM

পরিমিত খনিজ লবণ ও ভিটামিনের অভাবে মাছের দেহে বিভিন্ন প্রকার রোগ বালাই হতে দেখা যায়।

লক্ষণ

- দেহ বেঁকে যায়
- লেজের অংশ বেঁকে যায়

প্রতিকার

- দেহ বা লেজ বেঁকে গেলে কোন প্রতিকারের উপায় নাই।

প্রতিরোধ

- সুষম খাদ্য প্রয়োগ
- খনিজ লবণ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ।

চিংড়ির রোগ

<u>G‡, bv 6 mH•. c% 5‡m cTv</u>

কারণ

- ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণ

লক্ষণ

- মজুদের ৩-৪ মাস পর এন্টেনা, সন্তরণপদ খতি অথবা ঝরে পড়তে থাকে।

প্রতিকার

- সাময়িকভাবে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করা
- পানি পরিবর্তন করা
- পিএইচ পরীক্ষা করে ২৫০-৩০০ গ্রাম/শতাংশ হারে ডলোমাইট প্রয়োগ করা।

<u>‡5vjm kQ R‡$ /v6$v</u>

কারণ: পরিবেশগত পিএইচ, লবণাক্ততা বা তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে খোলস পাল্টায় না, শক্ত হয়ে যায়।

লক্ষণ

- খোলস স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে শক্ত হওয়া
- বয়সের তুলনায় চিংড়ির কম দৈহিক বৃদ্ধি হওয়া।

প্রতিকার

- পানির পরিবেশ উন্নয়ন
- পরিবেশের যে কোন হঠাৎ পরিবর্তন, যেমন- পানির উচ্চতা বৃদ্ধি অথবা রাসায়নিক সার প্রয়োগ

<u>K¨vi‡cm 6 ki‡ii Bci cv1i Rgv</u>

কারণ: পরিবেশগত যে কোন গুণাগুণ/বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। বিশেষ করে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে এটি বেশি হতে দেখা যায়।

*লক্ষণ:*করাত ও ক্যারাপেস অংশে ধূসর রংয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর দেখা যায়।

প্রতিকার

- পুকুরের পানি পরিবর্তন
- স্বাদু পানির সরবরাহ বৃদ্ধি
- পানির উচ্চতা বৃদ্ধি।

<u>big †5vjm v =3‡ƒi g! †%R</u>

চাষাবাদের মাঝামাঝি সময়ে প্রায়ই গলদা চিংড়ির মাঝে এ রোগ দেখা দেয়।

কারণ

- পানিতে ক্যালসিয়াম কমে যাওয়া
- এ্যামোনিয়া ও তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া
- পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব
- অনেকদিন পানি পরিবর্তন না করা।

লক্ষণ

- খোলস নরম হয়ে যায়
- পা লম্বা ও লেজ ছোট হয়
- দেহ ফাঁপা হয়ে স্পঞ্জের মত হয়।

প্রতিকার

- পুকুরে ২-৩ মাস অন্তর শতাংশ প্রতি ০.৫ কেজি হারে চুন প্রয়োগ
- খাবারে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

†5vjm cv„¯‹bvi ci g&E

*কারণ:*খাদ্যে ভিটামিন বি-কমপে□ক্স, ফ্যাটি এসিড, প্রোটিন এবং খনিজ দ্রব্যের অভাব।

লক্ষণ

- দেহ নরম থাকে এবং রং নীলাভ হয়ে যায়
- মৃত চিংড়ি রান্না করলে রং হালকা কমলা বর্ণ ধারণ করে। উল্লেখ্য যে সুস্থ চিংড়ি রান্না করলে রং লাল হয়।

প্রতিকার: প্রতি কেজি খাদ্যের সংগে ৫০ মিলি হারে ভিটামিন প্রি-মিক্স (এমবাভিট-জি) প্রয়োগ।

Mv‡$ †k6jv cTv

*কারণ:*খোলস পরিবর্তন না করা ও চিংড়ির চলাফেরার গতি কমে যাওয়া।

*লক্ষণ:*চিংড়ি ধরার পর সারা দেহে সবুজ অ্যালজি দেখা যায়।

*প্রতিকার:*পানি বাড়িয়ে দিতে হবে এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

gvS 6 wPswTi †ivM cÖ‡iv4

আমাদের দেশে চাষির আর্থ-সামাজিক অবস্থা, উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা ও চিকিৎসা পদ্ধতির জটিলতার কারণে মাছ ও চিংড়ির রোগ-চিকিৎসা চাষিদের পক্ষে শুধু কষ্টসাধ্যই নয়, অনেকটা অসম্ভবও বটে। এ কারণে মাছের রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধই অধিক শ্রেয়। চাষের শুরুতেই নিচের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে মাছ ও চিংড়ির রোগ চিকিৎসার মতো বিরক্তিকর বিষয় পরিহার করা যেতে পারে -

- পুকুরে পরিমিত সূর্যালোকের ব্যবস্থা করা
- পুকুর শুকিয়ে নিয়মিত চুন দেয়া
- কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত চারাপোনা বা জুভেনাইল মজুদ না করা
- বাইরের অবাঞ্চিত প্রাণি ও পানি পুকুরে ঢুকতে না দেয়া
- তলায় অতিরিক্ত কাদা না রাখা
- পরিমিত সার ও খাদ্য সরবরাহ করা
- পুকুরে ঘন ঘন জাল না ফেলা
- পুকুরে ঘোলাত্ব সুষ্টির উৎস বন্ধ করা।

xwX ¨ =v̶ebv

সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর অধিক এবং লাভজনক উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। ভাল ব্যবস্থাপনার পরও চাষকালীন সময়ে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে ফলে উৎপাদন ব্যাপক হ্রাস ঘটার আশংকা থাকে। নিচে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে এরূপ কিছু ঝুঁকি সর্ম্পকে আলোচনা করা হলো:

() iv7‡m 6 APv#‡/vM¨ gv‡Si cÖk

পুকুর শুকানো অথবা রোটেনন প্রয়োগ করার পরও অনেক সময় পুকুরে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ থেকে যেতে পারে। এ ছাড়াও বর্ষাকালে পানির সাথে বা অন্য কোন ভাবে যে কোন সময় বাইরে থেকে শোল, টাকি, কৈ, শিং, মাগুর, চান্দা, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছ পুকুরে প্রবেশ করতে পারে। এতে ব্যাপকভাবে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন কমে যেতে পারে।

cÖwZKvi

পাখি, জাল, বৃষ্টির পানি বাইরে থেকে আসা স্রোত বা মানুষের মাধ্যমে রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ প্রবেশ করে। তাই এ সমস্ত উৎস থেকে সতর্ক থাকতে হবে। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উল্লেখিত সমস্যার প্রতিকার করা যেতে পারে-

- পুকুরে বাইরের পানি ঢুকতে না দেয়া
- জাল ব্যবহারের সময় সর্তকতা অবলম্বন
- বাচ্চাদের নজরে রাখা
- প্রয়োজনে পুকুরের চারদিকে ৩০ - ৪০ সেমি উঁচু বানা বা মশারি জালের বেড়া দেয়া।

2) cwbi Bci jbm E=i

অতিরিক্ত শেওলার জন্য পানির রং ঘন সবুজ হয়ে যায়। ফলে রাতের বেলায় পানিতে অক্সিজেন কমে যায় এবং দিনের বেলায় পিএইচ মান বেড়ে যায়। এ ছাড়া শেওলা মরার পর পুকুরের তলায় জমা হয় এবং পচে গিয়ে পানি দূষণ ও বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় অতিরিক্ত অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে মাছ ও চিংড়ি পানির উপরি তলে খাবি খায় এবং কখনও কখনও ব্যাপকহারে মারা যায়।

cÖwZKvi

তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে পুকুরে অগভীর নলকূপের পরিষ্কার ঠান্ডা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা গেলে ভাল হয়। সেই সাথে পুকুরে খাদ্য ও সার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। এছাড়াও কিছু সিলভার কার্পের চারা পোনা ছেড়ে জৈবিকভাবে অতিরিক্ত উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

+) cwbi Bci jvj mi

অতিরিক্ত লৌহ অথবা লাল শেওলার জন্যে পানির উপর লাল স্তর পড়তে পারে। ফলে সূর্যের আলো পানিতে প্রবেশ করতে পারে না। এ জন্যে পুকুরে খাদ্য ও অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দেয়।

cÖwZKvi

ধানের খড় বা কলাপাতা পেচিয়ে দড়ি বানিয়ে পানির উপর টেনে তুলে ফেলা যায়।

C) G‡gwb$v Rgv R6$v

বিভিন্ন কারণে পুকুরের তলদেশে এমোনিয়া সৃষ্টি হতে পারে। উচ্চতর পিএইচএ এমোনিয়া চিংড়ির জন্য অত্যন্ত মারাত্মক। পুকুরে ফাইটোপ□প্লাংকটন বেড়ে গেলে পানির পিএইচ দ্রুত বাড়তে থাকে। ফলে ব্যাপক সংখ্যায় মাছ ও চিংড়ি মারা যায়। চিংড়ির ফুলকায় কালো দাগ পড়লে বুঝতে হবে নাইট্রোজেন বর্জ্য ও অন্যান্য রাসায়নিকের মাত্রা বেশি। এমোনিয়া বেড়ে গেলে রক্ত পরিবহনতন্ত্র দ্রুত আক্রান্ত হয়।

cÖwZKvi

মজুদ ঘনত্ব কমিয়ে সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখা, সম্ভব হলে ৩০-৫০% পানি বদল ও পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণ। প্রাথমিক অবস্থায় ৬০% শক্তির ব্লিচিং পাউডার ০.৫ পি পি এম মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

*) 5w 5v6$v

অনেক পুকুরেই আগষ্ট-সেপ্টেম্বর এবং এপ্রিল-মে মাসে এ সমস্যা প্রকট আকারে দেখা দেয়। সাধারণত ভোর রাতের দিকে মাছ ও চিংড়ি পানির উপর ভেসে উঠে খাবি খেতে থাকে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাওয়ার কারণে এটা ঘটে। অক্সিজেন স্বল্পতা যদি খুব বেশি ও দীর্ঘ মেয়াদী হয়, তবে মাছ ও চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায়।

cÖwZKvi

প্রাথমিক অবস্থায় সাময়িকভাবে সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।এর সাথে সাথে বাঁশ পিটিয়ে বা সাঁতার কেটে অথবা এলুমিনিয়ামের ডেকচি দিয়ে পানিতে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়াতে হবে। বিপদজনক অবস্থায় পুকুরে পরিষ্কার নতুন পানি সরবরাহ বা স্যালো টিউবওয়েলের মাধ্যমে একই পুকুরের পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তবে দীর্ঘসময়ব্যাপী পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতা চলতে থাকলে বড় মাছ ও চিংড়ি ধরে বিক্রি করা যেতে পারে।

F) iv7‡m cÖi Bc%ª

সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ও উদ খেয়ে ফেলে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন অনেকাংশে কমিয়ে দিতে পারে।

cÖKvi

সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ও উদ দেখার সাথে সাথেই মেরে ফেলতে হবে। এ সমস্ড় প্রাণি নিয়ন্ত্রণে কায়িক মাধ্যমই সবচেয়ে ভাল। উদ নিয়ন্ত্রণে চুন ভর্তি ডিমের খোসা পুকুরের পাড়ে রেখে দিলে উদের উৎপাত কমে যায়। বাঁশের চাঁই ব্যবহার করে সহজেই কাঁকড়া মারা যায়। সাধারণভাবে ব্যাঙ যে সব জায়গায় ডিম দেয় (যেমন- পানি ও পাড়ের সংযোগ স্থল) সেসব স্থলের ঘাস দূর করে ফেলতে হবে। এছাড়াও যে সমস্ত পুকুরের আশেপাশে জঙ্গল থাকে সেখানেই এসব প্রাণির উপদ্রব বেশি হয়। এ জন্য পুকুরের চারপাশ আগাছা-জঙ্গল মুক্ত রাখতে হবে।

G) Aw!wiQ 5v%¨ cÖ$M

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ সমস্যা। প্রায় সব চাষিই প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ করে। ফলে এ সব খাদ্যের একটা বড় অংশ তলায় জমা হয়ে পানির পরিবেশ নষ্ট করে ফেলে। এতে মাছ ও চিংড়ি সহজেই রোগাক্রান্ড় হয়ে মারা যায়।

cÖKvi

প্রয়োগের পূর্বে খাদ্যের সঠিক মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। মাঝে মাঝে খাদ্য প্রয়োগ স্থানের মাটিতে জমে থাকা পচা জৈব পদার্থ অপসারণ করতে হবে।

J) †jvjv!Y

বৃষ্টি ধোয়া পানিতে পুকুর ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। এর ফলে সূর্যের আলো পানিতে প্রবেশ করতে পারে না এবং প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি বাধাগ্রস্ড় হয়। এ ছাড়াও মাছের ফুলকা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

cÖKvi

বৃষ্টি ধোয়া পানির প্রবেশ রোধ করার জন্য সমতল ভূমি থেকে পুকুরের পাড় উঁচু রাখতে হবে। ঘোলাত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি শতাংশে ১-২ কেজি করে পোড়া চুন বা জিপসাম প্রয়োগ করা যেতে পারে। খসখসে পাতাবিশিষ্ট (খোকসা, শেওড়া, বাঁশ) গাছের ডাল, ধানের খড় এক সপ্তাহ ডুবিয়ে রাখলেও ঘোলাত্ব নিবারণ হতে পারে।

e) !jvi K‡jv Kv%v

অতিরিক্ত খাদ্য ও জৈব পদার্থ পুকুরের তলায় জমা হয়ে তলার মাটি কালো দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে চাষ করা পুকুরে এ সমস্যা প্রকট। এর ফলে বিষাক্ত গ্যাস তলায় জমা হয়ে রুই জাতীয় মাছ, থাই পাঙ্গাশ চিংড়ির মড়ক দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়াও চিংড়ির দেহ কালো হয়ে বাজার মূল্য হ্রাস করে।

cÖKvi

চিংড়ি ছাড়ার পূর্বে তলার অতিরিক্ত কালো কাদা তুলে ফেলতে হবে। চাষকালীন সময়ে চিংড়ির মাকড় দেখা দিলে দ্রুত পানি বদল, মজুদ ঘনত্ব হ্রাস এবং সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

(K) =Rw!‡2wR!v

চিংড়ি চাষের এটি একটি বড় সমস্যা। স্বভাবগত কারণে চিংড়ি স্বজাতিভুক প্রাণী। যখন এদের খাদ্যাভাব দেখা দেয় তখন এরা ছোট ও দুর্বল আকৃতির চিংড়িগুলোকে ধরে খায়।

cÖKvi

মজুদকালীন সময়ে পুকুরে একই আকৃতির পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করতে হবে। এ ছাড়াও নিয়মিত সার ও সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করে পুকুরে খাদ্যের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে হবে।

(() &i ci †2‡m B<v

বৃষ্টির পর অনেক সময় মাছ ও চিংড়ি পানির উপর ভেসে খাবি খেতে পারে। পানির পিএইচ কমে যাওয়ার ফলে ও ক্ষতিকর হাইড্রোজেন সালফাইডের বিষক্রিয়া বেড়ে যাওয়ায় এটা ঘটে থাকে।

প্রতিকার

বৃষ্টির পরপরই পানির পিএইচ পরিমাপ করতে হবে। প্রতিবার ভারী বৃষ্টির পর প্রতি শতকে ৭৫-৮০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

(2) Agv k¨\cw~ygv$ wPswTi cv‡T P‡j Avmv

অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার তিথিতে রাতের বেলায় চিংড়ি পাড়ের উপর চলে আসতে পারে। ফলে শিয়াল বা অন্য কোন নিশাচর রাক্ষুসে প্রাণী দ্বারা চিংড়ি আক্রান্ত হতে পারে।

প্রতিকার

অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার সময় অতিরিক্ত সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা। তবে পুকুরের পানির পরিবেশ ভাল থাকলে এ অবস্থা দেখা যায় না।

(+) 5iv

অনাবৃষ্টিজনিত সমস্যায় পুকুরের পানি কমে/গরম হয়ে পুকুরের অক্সিজেন স্বল্পতা সহ মাছের উৎপাদন ব্যাহত হয়।

প্রতিকার

গভীর/অগভীর নলকূপ থেকে ভূগর্ভস্থ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। পুকুরের পানির এক তৃতীয়াংশ কচুরিপানার আচ্ছাদন তৈরী করে পানি ঠান্ডারাখার ব্যবস্থা করা অন্যথায় ঝুঁকি এড়াতে বড় আকারের মাছ আহরণ ও বাজারজাত করাই শ্রেয়।

(C) b¨v

যৌক্তিক কারণেই সকল স্তরের জলাশয়ে মাছচাষ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই জলাশয়গুলোর উপযুক্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়াই চাষ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এতে বর্ষাকালে বন্যা বা অতি বর্ষণজনিত কারণে অনেক জলাশয় প্লাবিত হওয়ায় মাছচাষিরা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছেন।

প্রতিকার

- পুকুর বা চাষের জলাশয়প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বন্যার অব্যবহিত পূর্বেই জলাশয়ের চারপাশে জাল/বানা দিয়ে মাছ বের হয়ে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা
- পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা
- বন্যার পূর্বেই মাছ আহরণ করা
- বন্যার পরপরই প্লাবিত পুকুর প্রস্তুত করে বড় আকারের পোনা মজুদ করা।

. w # cÖ\M

পুকুরে শত্রুতামূলকভাবে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের ক্ষতিসাধন বর্তমানে একটি প্রকট সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

প্রতিকার

- বিষ প্রয়োগের পরপরই পুকুরে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি প্রবেশ করানো এবং অতি দ্রুতজীবিত মাছ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করা
- বিষক্রিয়ায় মৃত মাছ পুড়িয়ে ফেলা বা মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখা
- গোলযোগপূর্ণ জলাশয়ে মাছচাষে নিরুৎসাহিত করা
- সামাজিকভাবে সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা
- বাণিজ্যিক খামারে পাহারার ব্যবস্থা করা
- বাড়তি সতর্কতা হিসেবে বড়মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ।

[[

. gvS PwÍ

বিষ প্রয়োগের ন্যায় মাছ চুরিও অপর একটি সামাজিক সমস্যা- যা নিরসনে চাষিকে স্থানীয় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রতিকার

- পুকুর পাহারার ব্যবস্থা রাখা
- পুকুরে বাঁশের কঞ্চি পুঁতে রেখে জাল টানায় প্রতিবন্ধকতা তৈরী করা
- বিক্রয়যোগ্য বড়মাছ দ্রুত আহরণ ও বাজারজাত করা
- সামাজিকভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করা।

(G) cwb %#.

নিম্নোক্ত বিশেষ বিশেষ কারণে পুকুর/জলাশয়ের পানি দূষিত হয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাস সহ মৃত্যুর মাধ্যমে ক্ষতি সাধিত হয়।

- শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য
- শহর/আবাসিক এলাকার পয়ঃ নিঃসরণ
- কৃষি জমির কীটনাশক/রাসায়নিক উপাদান নিঃসরণ
- অতিরিক্ত জৈব সার ও খাদ্যোপাদান পুকুরের তলায় জমা হওয়া
- হঠাৎ করে মাত্রাতিরিক্ত পশুর রক্ত ও নাড়ি-ভুঁড়ির বর্জ্য পুকুরে প্রয়োগ
- গৃহস্থ বাড়ির আঙিনা থেকে জৈব পদার্থ (গোবর/কম্পোস্ট/মলমূত্র) ইত্যাদি বৃষ্টির পানিতে চুঁয়ে পুকুরে পতিত হওয়া।

প্রতিকার

- দূষিত পানি দ্রুত পরিবর্তন ও বিশুদ্ধ পানি পুকুরে দেয়া
- শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য যেন পুকুরে পড়তে না পারে তার ব্যবস্থা নেয়া
- পুকুরের পাড় উঁচু করা
- অবস্থাভেদে প্রয়োজনীয় মাত্রায় চুন এবং পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ করা
- অতি দ্রুততার সঙ্গে দূষণ উপাদান অপসারণ করা।

(J) Rvm-gEMi gj\wjUvi ¨ Rvi

পুকুরে হাস-মুরগির/লিটার প্রয়োজনের ফলে রোগ জীবাণু ছড়াতে পারে।
তাই এই সমস্যার সমাধান হাস-মুরগির মল/লিটার/ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

cÖKvi হাস-মুরগির মল/লিটার ব্যবহার থেকে বিরত থাকা।

g,m¨ AvRi‡.vli cwiP/v$ i‡di ¨ Rvi

() 2wgKv

সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালিয়ে দেশ এখন মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখনকার চ্যালেঞ্জ এই অর্জনকে স্থায়িত্বশীল করা। এর জন্য প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম চালু রাখার পাশাপাশি অপচয় হ্রাস করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থাগ্রহণ। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, দেশে যত মাছ উৎপাদিত হয় তার সবটাই পুষ্টিমান সহকারে ভোক্তার কাছে পৌঁছায় না, অপচয় হয়। এর সবচেয়ে বড় কারণ, মাছ খুবই পচনশীল দ্রব্য, মাছ ধরার পর দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ না করা হলে পচে যায়, ফলে এর পুষ্টিমানও দ্রুত কমে যায়। দেশের জন্য এর পুরোটাই অপচয়। অথচবরফ দেওয়ার মত সহজ কিছু ব্যবস্থা নিলে এই অপচয় বহুলাংশেহ্রাস করা সম্ভব।

2) gvS †Kb c‡P€

gvS cPvi w!b Kvi.Z

() ¨vK‡Uwi$vi AvOg‡.
2) GbRv8‡gi wO$vi d‡j
+) ‡!‡ji Aw…‡Rb †/a‡Mi d‡j (**oxidation**)

ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণই মাছ পচে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া যদি ভাল টাটকা মাছের সংস্পর্শে আসে তাহলে ভয়ানক রোগের সৃষ্টি হতে পারে এবং ঐ মাছ খেয়ে মানুষ মারাও যেতে পারে। যদি পরিষ্কার ও যথোপযুক্ত ভাবে বরফে রাখা হয়, এর সংক্রমণ কমিয়ে রাখা যায় এবং ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধিরহার নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তাহলে মাছকে অনেক বেশি সময় ধরে ভাল রাখা সম্ভব।
উপযুক্ত পরিবেশ না হলেব্যাকটেরিয়া এবং এনজাইম (বহুৎসব: এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ যামাংসপেশী, নাড়িভুঁড়ি, পরিপাকনালিতে পাওয়া যায় অথবা ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক তৈরি হয়) মাছ পচাতে পারেনা। এ দুটোরই প্রয়োজন উষ্ম তাপমাত্রা, খুব ঠান্ডাও নয় এবং খুব গরমও নয়। ব্যাকটেরিয়া টিকে থাকার জন্য পানি বা আদ্রতার প্রয়োজন। আর দরকার একটা কিছু খাদ্য যার উপর ভিত্তি করে টিকে থাকতে পারে – এক্ষেত্রে তা মাছের মাংস।

gv‡Si cPb cÖ$v %ª! R$ K? K‡i€ GwU R$Z

- আহরণের সময়ে মাছ ছোটাছুটি করলে বা উত্তেজিত হলে,
- খারাপ পরিচর্যা: ফলাফল আহত হওয়া বা পেশী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় দুর্বল ব্যবস্থাপনা (Improper sanitation)
- সংক্রমণ
- বরফ দেওয়ায় বিলম্ব
- সরাসরি সূর্য কিরণের নিচে রাখা

<u>বরফ প্রয়োগে বিলম্ব</u> – মাছের পচন কাজ দ্রুতকরার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী।

K?2v‡ gv‡SicPbw jw-! v r Kiv /v$€মাছের পচন বিলম্বিত বা বন্ধ করা যেতে পারে ঃ

<u>অপ্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ হলে</u>

- মাছকে শারীরিক ভাবে আহত না করে বা মাংসপেশীর ক্ষতি না করে,
- স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে মাছের পরিচর্যা করে এবং রোগজীবাণু ও সংক্রমণ পরিহার করে,
- দ্রুত তাপমাত্র কমিয়ে : পরিবহন এবং মজুদকালে ঠান্ডা পরিবেশ বজায় রেখে।

<u>প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ হলে</u>

- উচ্চতাপমাত্রা প্রয়োগ করে যেমন ক্যানিং (Canning), তাপ প্রয়োগ, ইত্যাদি দ্বারা এনজাইম ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে (ফিশ বল, ফিশ সসেজ, ফিশ স্টিক, ফিশ বার্গার, ইত্যাদি প্রস্তুতকালে)
- শরীর থেকে পানি কমিয়ে (শুকনো মাছ/ শুটকি মাছ, নোনা শুটকি, সংরক্ষণ কালে ধোঁয়া দিয়ে শুকিয়ে, ইত্যাদি)

আহরণের পরপরই মাছের পরিবেশের তাপমাত্রা কমিয়ে আনা মাছ পচন বিলম্ব বা বন্ধ করার অন্যতম উপায়।
মাছের তাপমাত্রা কমাতে বরফকুচি দিয়ে বরফায়িত করা সবচেয়ে সহজ এবং সুলভ উপায়।

id ও i‡di ¨ Rvi

মাছ সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে বেশি যে প্রযুক্তিটি ব্যবহৃত হয় তা হলো মাছের গায়ের তাপমাত্রা কমিয়ে এনে বেশি সময়ের জন্য মাছ ভাল রাখা। তাপমাত্রা কমিয়ে আনার বিষয়টি প্রধানত হিমায়িতকরণ বা ঈযরষষরহম নামে পরিচিত।

gv‡Si wRgvw$!Ki. (Chilling)

এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তাপ কমিয়ে মাছের তাপমাত্রা হিমাংক তথা ফ্রিজিং পয়েন্টের কাছাকাছি নিয়ে আসা হয় তবে তার থেকে নিচে নয়। বিভিন্ন মাছের হিমাংক -০.৬ থেকে -২.২°ঈ সে. তাপমাত্রার হয়ে থাকে তবে এটিকে সাধারণত -১°ঈ ধরে নেওয়া হয়। এভাবে প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ এবং মৎস্যজাত দ্রব্যকে হিমায়িত দ্রব্য (ঈযরষষবফ চৎড়ফঁপঃং) বলা হয়।

Aw!wRgvw$!Ki. (Super Chilling)

মৎস্য শিল্পে অতিহিমায়িতকরণ বলতে বুঝায় মাছের তাপমাত্রা হিমাংকের নিচে এনে মাছ মজুদ করা। এ তাপমাত্রায় মাছের অর্ধেক মাংস হিমাংকে পৌঁছে যায় অর্ধেক জমে যায়। অতিহিমায়িত মাছ -২.২°ঈ এর চেয়ে এমনকি এক ডিগ্রি কম তাপমাত্রায় মজুদ করা হয়। অতিহিমায়িতকরণে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা -২.২°C যা - ২.০ থেকে -৫.০°C পর্যন্ত কম বেশি হতে পারে। এই তাপমাত্রায় মাছের পানির অর্ধেক জমে যায়। কম বেশি হওয়ার কারণ হলো মাছের গায়ের পানিতে অন্যান্য দ্রব্যের উপস্থিতির পরিমাণের ভিন্নতা। মাননিয়ন্ত্রণের মাপকাঠিতে বলা যায় যে, বরফে মাছ যত দিন ভাল রাখা যায় তার চেয়ে অতি হিমায়িত মাছ ২-৩ সপ্তাহ অধিক সংরক্ষণযোগ্য।

wRgvw$!Ki‡.i w w2bONw!

১. বরফ দিয়ে মাছ ঠান্ডা করে,
২. মাছের গায়ের উপর দিয়ে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত করে,
৩. হিমায়িত পানিতে মাছ চুবিয়ে (যেমন সমুদ্রের হিমায়িত পানি),
৪. শুকনা বরফ (Solid carbondioxide), তরল নাইট্রোজেন, ঠান্ডা এ্যামোনিয়া এবং অন্যান্য হিমকারক (refrigerant), ইত্যাদি দ্বারা মাছ হিমায়িত করে।

gv‡Si idv$b

বরফে ঢেকে মাছের তাপমাত্রা কমিয়ে আনা এক ধরনের হিমায়িতকরণ প্রক্রিয়া। বরফের তাপ শোষনের উচ্চ ক্ষমতা এটিকে একটি আদর্শ হিমায়িতকরণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মাছের বরফায়ণ একটি সহজ প্রক্রিয়া, এতে খুব উঁচু মাপের দক্ষতার প্রয়োজন পরে না। দেশে বরফ সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং ঠিকঠাক মত বরফ দেওয়া হলে মাছ ২০ থেকে ৩০ দিন যাবৎ গ্রহণযোগ্য থাকে। অবশ্য সঠিক জ্ঞানের অভাবে সনাতন মৎস্য পরিচর্যা ও সংরক্ষণে সঠিকভাবে বরফ প্রয়োগ করা হয় না। অথচ বরফ সঠিক ভাবে ব্যবহার করা হলে আহরণোত্তর অপচয় বন্ধ হওয়ার পাশপাশি সংরক্ষিত মাছের গুণগত মানেরও উন্নতি ঘটে।

idv$‡bi mE4v wj

প্রথমত: বরফ তাপমাত্রা কমিয়ে মাছের পচন রোধ করে। তাছাড়া বরফ প্রয়োগের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধাদিও পাওয়া যায়:

- বরফগলা পানি মাছের গায়ের রোগজীবাণু ও দুষণকারী পদার্থসমূহ ধুয়ে দূর করে ফেলে,
- বরফগলা পানি মাছের শরীর ভেজা রেখে শুকিয়ে যেতে দেয়না ফলে মাছের চকচকে চেহারা অক্ষুণ্ণথাকে,
- এই পানি মাছকে ঠান্ডা রাখতেও সাহায্য করে,
- সুপেয় পানি ব্যবহার করে বরফ তৈরি করলে তা বিষাক্ত (toxic) নয়, নিরাপদ,
- বরফ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজেই স্থানান্তর করা যায়। বস্তুতপক্ষে, এটিকে বহনযোগ্য হিমায়ন পদ্ধতিও বলা যায়।
- যেহেতু বরফ O°C এ গলে যায় সেহেতু বরফ মাছকে ঠান্ডায় জমিয়ে ফেলতে পারে না বরং আদর্শ ঠান্ডা মাত্রায় রাখার জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে,
- সংরক্ষণের অন্য পদ্ধতিসমূহ থেকে বরফায়ন অপেক্ষাকৃত সুলভ ও সস্তা,
- বরফ বাক্স (Ice box) না পাওয়া গেলে যেকোন পাত্রে বরফ দিয়ে মাছ রাখা যেতে পারে,
- যেকোন জায়গাতেই মাছে বরফ দেওয়া যায়। মাছে বরফ সবাই দিতে পারে - জেলে, পরিবহনকারী, বড়-ছোট ব্যবসায়ী, ভোক্তা, সবাই।

id W!wi‡! †Kgb cvwb ¨ Rvi Kiv BwP,€

পানির গুণাগুণের ওপর বরফের মান নির্ভর করে। ভাল মানের বরফ না হলে সংরক্ষণ যথাযথ হবে না, মাছ বরং দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে বরফ তৈরির জন্য যে পানি ব্যবহার করা হবে তার মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

- বরফ তৈরিতে পরিষ্কার এবং দূষণমুক্ত পানি ব্যবহার করতে হবে।
- পুকুর, হ্রদ, ডোবা, নদী, খাল-বিল বা সমুদ্র তীরবর্তী পানি ব্যবহার করা উচিৎ নয়। এসব পানিতে কাদা, ধূলাবালি, ব্যকটেরিয়াসহ বিভিন্ন দূষণীয় উপকরণ থাকে। এসব পানি সরাসরি ব্যবহার করা হলে নতুন করে মাছ দূষিত হবে এবং তার পচন দ্রুততর হবে।
- বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে সমুদ্রের পানিও ব্যবহার করা উচিৎ নয়। এর মান ভাল নয়। তাছাড়া এসব পানি দিয়ে বরফ বানাতে বেশি সময় লাগে এবং বিদ্যুৎ খরচও বেড়ে যায়।
- সবচেয়ে ভাল হয় টিউবওয়েল বা ডিপ টিউবওয়েলের পানি যথাযথ ভাবে পরিশুদ্ধ করে নিলে।
- বড় জলাধারে (tanks/reservoirs) বরফ বানানোর জন্য পানি জমিয়ে রাখলে সেসব জলাধার নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।
- জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহার করা হলে বরফায়িত মাছের ভাল থাকার সময়কাল (shelflife) বৃদ্ধি পাবে। তবে এক্ষেত্রে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন মেনে ঔষধ নির্বাচন এবং তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সার-সংক্ষেপ

১. বরফ তৈরির জন্য পানির মান ভাল হওয়া জরুরী।

২. মৎস্য সংরক্ষণের জন্য কুচি বরফ (Flake ice) অধিক উপযোগী।

৩. যত শীঘ্র সম্ভব আহরিত মাছ পরিষ্কার করে (বিশেষ করে, নাড়িভুঁড়ি বা Gut অপসারণ করে) ভাল পানিতে ধুয়ে তারপর বরফ দিতে হবে। নাড়িভুঁড়ি অপসারণ করা হলে অবশিষ্ট মাছ অনেক বেশিদিন ভাল থাকবে। অপেক্ষাকৃত বড় মাছ হলে নাড়িভুঁড়ির পাশাপাশি মাথাও কেটে আলাদা করে নিলে মাছ ভাল থাকার স্থায়িত্বকাল (Shelflife) আরও বৃদ্ধি পাবে। ছোট মাছে এ কাজগুলো একটু কষ্ট হলেও অপেক্ষাকৃত বড় মাছে এটি খুবই সম্ভব।

৪. মাছ রাখার পাত্রও (Styrofoam এর বা অন্য কিছুর) পরিষ্কার হতে হবে।

৫. ইনসুলেটড বরফ বাক্স (Insulated ice box) লম্বা দূরত্বে পরিবহনের জন্য খুবই উপযোগী। অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বে বা স্থানীয় পরিবহনের জন্য ঢাকনিযুক্ত এ্যালুমিনিয়ামের হান্ডি বা হাড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে।

- সকল ধরনের পাত্রের তলায় বরফ-গলা পানি বের করে দেওয়ার জন্য অবশ্যই ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বাঁশের ঝুড়িতে মাছ পরিবহনের জন্য রাখতে হলে এর তলাসহ ভেতরের চতুপার্শ্ব পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যেন মাছ ঝুড়ির সরাসরি সংস্পর্শে না আসে। প্রতিবার ব্যবহারের পর এই পলিথিন সিটটি ভাল পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। শুধু পলিথিনের বদলে পলিথিন দিয়ে একদিক মোড়ানো পলিথিন বস্তা (Polythene gunny bag) আরও ভাল।
- মাছ ধোয়া পানি বা উচ্ছিষ্ট যেন পরিবেশের ক্ষতি না করে সেদিকে তিক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

৬. মাছ সংরক্ষণের জন্য মাছ ও বরফের অনুপাত হবে : শীতকালে ১:১ এবং গ্রীষ্মকালে ১:২। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১০ কেজি মাছের জন্য শীতকালে প্রয়োজন হবে ১০ কেজি বরফ, অন্যদিকে একই পরিমাণ মাছের জন্য গ্রীষ্মকালে প্রয়োজন হবে ২০ কেজি বরফ।

৭. পরিবহনকালে অথবা খুচরা/পাইকারী বিক্রির সময়, কোন সময়েই মাছ সরাসরি রোদের কিরণে অল্প সময়ের জন্য হলেও রাখা যাবে না।

gvSPv‡# mvgwRK 6 cwi‡ kM! mÐv

() cwi‡ kM! mÐv m-3‡K"4vi.v@

cwi‡ ‡ki msLv@ আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। অর্থ্যাৎ, আমাদের চারপাশের জীব ও জড় বস্তু নিয়েই আমাদের পরিবেশ।

cwi‡ ‡ki Bcv%vb@ পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে পানি, মাটি, বায়ু, আলো, উদ্ভিদ, ও প্রাণী ।

জৈবিক পরিচর্যার মাধ্যমে মাছচাষ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাছচাষে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ। এক্ষেত্রে যেমন দ্রুত সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে, তেমনি প্রচুর ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকে। চাষ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপে কৌশলগত ভূল, কারিগরি ত্রুটি-বিচ্যুতি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ-দুর্বিপাক এবং মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি/সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ধরনের পন্থা/উপায় অবলম্বন করে ঝুঁকির মাত্রা কমিয়ে/সমস্যা দূরীকরণের মাধ্যমে মাছচাষে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হয়। প্রকল্পের কার্যক্রমে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষায় সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব/ক্ষেত্র/দিকগুলো মূল্যায়ন করা এবং সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন খূবই গুরুত্বপূর্ণ।

পুকুরের পরিবেশের মধ্যে রয়েছে পানি, মাটি, বায়ু, উদ্ভিদ, আলো, প্রাণী ইত্যাদি তথা পুকুরের চারপাশের সকল কিছুই পরিবেশের অংশ। পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের কার্যকর উপস্থিতিই কাঙ্খিত উৎপাদনের জন্য অনুকুল পরিবেশ। এই সুসমন্বিত রূপের ব্যতয় ঘটলেই পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে যা কাঙ্খিত উৎপাদন ব্যহত করে। পরিবেশগত সুরক্ষা বলতে পরিবেশকে নেতিবাচক প্রভাবমুক্ত রাখার লক্ষ্যে মাছচাষ ব্যবস্থাপনায় সঠিক পদক্ষেপ ও কৌশলগ্রহণ।

()(gvS Pv# Kv/Ū‡g cwi‡ ‡ki Bci m-¦ ¨ †bw! vPK cÖ mgR-wPw†!Ki.

যেহেতু, প্রকল্পে ‘‘উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন” বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই ধরে নেয়া যায় যে, পুকুরের পরিবেশের উপর তেমন কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কম। তারপরও মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারে। মাছচাষের প্রতিটি খামারে/পুকুরে ‘‘সীমিত পরিবেশগত মূল্যায়ন ((Limited Environmental Assessment - LEA)” খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এনএটিপি-২ কার্যক্রমে প্রদর্শনী পুকুরসহ যেকোন মাছচাষ খামারে মূল কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে এই মূল্যায়ন পরিচালনা করা প্রয়োজন। সীমিত পরিবেশগত মূল্যায়নে প্রদর্শনী পুকুরসহ যে সকল পুকুরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে ‘‘পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা” প্রণয়ন সমাপ্ত করতে হয়। যেমন, পুকুরের অবস্থান দেখে যদি মনে হয় প্রদর্শনী বাস্তবায়নকালে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেক্ষেত্রে, ‘‘পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা” প্রণয়ন করতে হয়। এক্ষেত্রে, পুকুরে মাছচাষ ব্যবস্থাপনাকালীন নিম্নলিখিত নেতিবাচক প্রভাবসমূহের সম্ভাবনা থাকে:

- মাছ চাষের পুকুরের অবস্থান আশপাশের জলাশয়ের (যেমন খাল, নিচু জলাভূমি, ইত্যাদি) পানি প্রবাহে বাঁধা দিতে পারে;
- আশপাশের জলাশয়ের দূষিত/নোংরা পানি দ্বারা চাষের পুকুরের পানি দূষিত হতে পারে;
- মাছ চাষের পুকুরে অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহকৃত, সার প্রয়োগ, এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে পুকুরের পানি দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে;
- উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ফলে দেশী জাতের মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীর জীববৈচিত্র হুমকিতে পরতে পারে। যেমন, প্রস্তুতির সময় পুকুর শুকানো হলো ছোট মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী মারা যেতে পারে;
- আশপাশের বাড়ি থেকে মাছ চাষের পুকুরে গোয়াল ঘরের বর্জ্য, হাঁস-মুরগির লিটার ফেলার সম্ভাবনা থাকে।
- পুকুর পাড়ে পায়খানা/প্রস্রাবখানা থাকলে পুকুরের পানি দূষিত হয়;
- এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২ ও এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-৩ পরিচালনায় পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। যেমন, ডিজেলচালিত সেচ পাম্প দিয়ে পানি সরবরাহের সময় পুকুরের পানিতে ডিজেল মিশতে পারে; ফিস ল্যান্ডির সেন্টার ধোয়া পানি দূর্গন্ধ ছড়াতে পারে;
- বিল ব্যবস্থাপনায় যেমন অভয়াশ্রম, নার্সারী, পোনা মজুত, আবাসস্থল উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

()2 wPw†! cwi‡ kM! †bw! vPK cÖ mgR-ckÖg‡bi Rb¨ mRKvi? g,m¨ KgK!ÿ\‡Dc mRKvi?i Ki.?$Z

মাছচাষে পরিবেশগত সুরক্ষায় উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (Focal point) সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কমকর্তার নির্দেশ মোতাবেক পুকুরের নেতিবাচক প্রভাবসমূহ প্রশমনে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ক্ষেত্র সহকারী নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

K) cÖkb? cKE

প্রদর্শনী পুকুরের সীমিত পরিবেশগত মূল্যায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনসহ প্রদর্শনী পুকুর মালিকদের পুকুরের পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমে সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। যেমন-

- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রদর্শনী পুকুরের ‘‘পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা” প্রণয়নে সহযোগিতা;

- প্রদর্শনী পুকুরে গুণগতমান সম্পন্ন পরিমিত খাদ্য প্রয়োগে পরামর্শ প্রদান ;
- প্রদর্শনী পুকুরের পুকুরের পাড় নীচু, ভাঙ্গা বা ছিদ্র থাকলে তা ঠিক করার পরামর্শ প্রদান;
- প্রদর্শনী পুকুরটি যাতে বন্যা কবলিত না হয় সেজন্য পাড় উঁচু করার পরামর্শ প্রদান;
- বৃষ্টির সময় আশপাশের বাড়ির আঙ্গিনার ধোয়া নোংরা পানি/ময়লা/আবর্জনা যাতে পুকুরে না পরে সেজন্য পুকুর মালিকদের সতর্ক করা;
- আশপাশের বাড়ির গোয়াল ঘরের বর্জ্য, হাঁস-মুরগির লিটার যাতে পুকুরে না পরে সে বিষয়ে পুকুর মালিকদের সতর্ক করা;
- পুকুর পাড়ে পায়খানা/প্রস্রাবখানা থাকলে তা অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি।

5) RjR c‡?i R? W wPc msiD.

‘‘উত্তম মাছচাষ অনুশীলন’’ না করলে পুকুরের জলজ প্রাণীর জীববৈচিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন, মাত্রাতিরিক্ত চুন প্রয়োগ করলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মারা যেতে পারে। প্রকল্প অনুমোদিত প্রজাতির মাছ ব্যতিত অন্য কোন প্রজাতির মাছ পুকুরে যাতে না ছাড়ে সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবেন এবং সম্ভব হলে জাল টেনে তা পরীক্ষা করবেন।

M) GwMÖjPvivj 8‡bv‡2kb dvP-2 6 GwMÖjPvivj 8‡bv‡2kb dvP-+

এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২ ও এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড বাস্তবায়নে পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করবেন। যেমন, পানি পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত রি-এজেন্টের খালি বোতল যেখানে সেখানে না ফেলে মাটিতে পুঁতে রাখতে পুকুর মালিকদের পরামর্শ প্রদান করবেন। বরফ কল স্থানের কাছাকাছি যাতে শৌচাগার না থাকে এ বিষয়ে কল মালিককে সতর্ক করবেন।

j) w j ¨ =ªebv

বিল ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বিলের চারপাশের সিআইজি, অন্যান্য মাছচাষি, ওংশ্লিষ্টব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানকে সচেতন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। যেমন- বিলের আশপাশে কোন হাট বা বাজার থাকলে সেখানকার ময়লা আবর্জনা, পশুর বর্জ্য ইত্যাদি বিলে না ফেলার ব্যাপারে হাট বা বাজার সমিতিকে সতর্ক করবেন। বিলে যারা মাছ ধরে তাদের মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন মেনে চলার জন্য পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি।

m) cwi‡ kM! mEv Kv/Ogmg‡R !%viwK 6 cÖ‡ %b cÖ‡b mR‡/wM!v

সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নির্দেশ মোতাবেক সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ক্ষেত্র সহকারী প্রদর্শনী পুকুরসহ প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রমে পরিবেশগত সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়মিত তদারকি করবেন। সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ক্ষেত্র সহকার পরিবেশগত সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে উপজেলা কার্যালয়ে সংরক্ষণ করবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, মৎস্য অধিদপ্তর চাহিদা মোতাবেক প্রযোজ্য পরিবেশগত সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে সরবরাহ ও উপজেলা প্রতিবেদন প্রণয়নে সহযোগিতা করবেন। প্রকল্পের সকল কাজে পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে মাছচাষিদের সচেতন ও পরামর্শ প্রদান করবেন

২. gvSPv‡# mvgwRK mEvZ

2wgKvZ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ৩৬.৩ নম্বর অনুচ্ছেদে কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ প্রদান করার বিষয়ে উল্লেখ আছে। অপরদিকে, জাতীয় মৎস্যনীতি ১৯৯৮ ও জাতীয় মৎস্য কৌশল ২০০৬ এর আলোকে ইতোমধ্যেই গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কৌশল ও নীতিমালায় মৎস্যচাষ ও এতদ্‌শংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকান্ডে সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ

অগ্রাধিকার ও সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন, মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন কর্যক্রমে নিয়োজিত থেকে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে নারীর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ রয়েছে। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার সাথে সম্মিলিতভাবে বাড়ির আঙ্গিনাস্থ পুকুরে পুষ্টিসমৃদ্ধ ছোট মাছ চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে পারিবারিক আয়বৃদ্ধি, নারী/শিশুদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও সামাজিকভাবে নারীাদের ক্ষমতায়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। নারীদের পাশাপাশি প্রকল্পের সুফল যাতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর হাতে পৌঁছনোর জন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা সিআইজির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। পুরুষ সদস্যের পাশাপাশি নারী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যরাও প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডে যেমন প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ, এআইএফ–২, অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর ইত্যাদি সক্রিয় অংশগ্রহন করছে। প্রকল্পে নারী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ঘটছে। ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অংশীদারিত্ব যেমন বাড়ছে তেমনি জেন্ডার সমতাকরণের কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে।

2)(mvgwRK mÐv m-3‡K"4vi.vZ

সামাজিক সমস্যা হলো এমন একটি নেতিবাচক বিষয় যা সমাজে বসবাসকারী মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাঁধা সৃষ্টি করে । এটি সামাজিক জীবনযাত্রায় বাঁধা প্রদান করে আবেগীয় ও অর্থনৈতিক ভাবে সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত করে। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মাছচাষিরা অধিক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। এতে তাদের জীবনযাত্রায় গুণগতমানের পরিবর্তন আসবে। যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হবে। মাছচাষিদের সাথে প্রতিবেশী/এলাকার লোকজনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক রেষারেষির কারণ মাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে মাছচাষির জীবন-জীবিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। মাছচাষি, প্রতিবেশি ও এলাকার লোকজনের মধ্যে পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় থাকলে সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। সুতারাং, মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা বলতে মাছচাষ সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সঠিক পদক্ষেপ ও কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা/ঝুঁকি কমিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

K) cKÖí bvi?i AskMÖ 6 Dg!v$bZ

ক্ষমতায়ন হলো ব্যক্তির নিজ জীবন ব্যক্তি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে তা ঠিক করা। ক্ষমতায়ন ব্যক্তির ভেতরে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করে, যার দ্বারা সে সিদ্ধান্ত নিতে ও সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়। এভাবে একজন নারী বা পুরুষ যখন জীবন জিজ্ঞাসার মতামত গ্রহণে ক্ষমতার অধিকারী হয় তখন মনে করা হয় তার ক্ষমতায়ন হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন লক্ষ্য মাত্রায় সিআইজির সদস্যদের মধ্যে ৩৫% নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অংশগ্রহণকারী নারীদের ক্ষমতায়নের বিষয়টিও সমভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নারীর ক্ষমতায়ন না হলে নারীরা উন্নয়ন কার্যক্রমে কাঙ্খিত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে না। নারীর ক্ষমতায়নে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে। এজন্য প্রয়োজন নারীর ক্ষমতায়নের পথে বাধা/অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা দূরীভূত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এলক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট- মৎস্য অধিদপ্তর নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করেছেঃ

5) wmAv8wR‡! bvi? m%m¨ ms5¨v wbw^!Ki.@

এ বিষয়ে ইতোমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ক্ষেত্র সহকারী সিআইজির নারী সদস্য সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। উপজেলা অফিসেও এসংক্রান্ত তথ্যা সংরক্ষিত আছে।

M) bvi? m%m¨‡%i Dg!v$‡b cKÖíi Kv/Ô‡g c~"AskMÖ‡. v4v 1vK‡j !v wPw†!Ki.@

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ক্ষেত্র সহকারী এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন।প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট- মৎস্য অধিদপ্তর এ বিষয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

j) cKÖí D%ªb&Mv'?i AskMÖ 6 Bb$Öbi gj4viv$ m-3Q Ki.Z

প্রকল্পের সুফল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাদের সিআইজির অন্তভুক্ত করতে প্রকল্প বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের প্রকল্পের আওতায় আনতে না পারলে তারা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকারান্তরে রাষ্ট্রের উন্নয়নের মূলধারায় প্রবেশ করতে পারবে না। এজন্য প্রয়োজন, সুফলভোগী হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অসুবিধাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এলক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট- মৎস্য অধিদপ্তর নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে:

✧ wmAv8wR‡! D%ªb&Mv'?i m%m¨ AH2Q Ki.@

সিআইজি গঠনের পর প্রথম পদক্ষেপ হলো সিআইজিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা নির্ণয় করা। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত ছক মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উপজেলা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ক্ষেত্র সহকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। উপজেলা অফিসেও এদ্সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংরক্ষিত আছে।

✧ D%ªb&Mv'?i m%m¨‡%i cKÖíi Kv/Ô‡g c~"AskMÖ‡. v4v 1vK‡j !v wPw†! Ki.@

সুফলভোগী হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রকল্পের কার্যক্রমে পূর্ণ অংশগ্রহণে বাধা থাকলে প্রকল্প তা চিহ্ণি করবেন।প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট- মৎস্য অধিদপ্তর এ বিষয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

নির্দেশনা মোতাবেক উপজেলা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ক্ষেত্র সহকারী এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। উপজেলা অফিসেও এদ্সংক্রান্ত তথ্যাবলী ভবিষ্যতের সংরক্ষিত থাকবে।

2)2 mvgwRK mÐv$ m-| ¨ mgm¨vmgR wPw†!Ki.

মাছচাষ সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত সামাজিক ঝুঁকি/সমস্যাসমূহ দেখা যায়। যেমন,

- মাছচাষ কার্যক্রমে অধিক সংখ্যাক নারীদের অংশগ্রহণ না করা;
- সিআইজিভূক্ত সদস্য হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ খুবই কম;
- এলাকা ভিত্তিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে পুকুরের/ বিলের মাছ চুরির সম্ভাবনা ;
- সামাজিক সম্পর্কের অবনতি। পারিবারিক কিংবা সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত রেষারেষির কারনে পুকুরে বিষ প্রয়োগে মাছ মেরে ফেলা;
- সুফলভোগী নারী সদস্যদের প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে অভিযোগ থাকতে পারে;
- বিলে মাছচাষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নারীদের অসচেতনতা এবং অংশগ্রহণ কম;
- বিলে মাছের বাসস্থানের উন্নয়ন কার্যক্রমে বাধা অথবা বাসস্থানের ক্ষতি করা;
- প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুফলভোগী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিযোগ;
- মাছচাষে হঠাৎ যে কোন আপদ/দুর্যোগে আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে ঋণগ্রস্থ হওয়া।

2)+ mvgwRK mЕDv$ m-| ¨ mgm¨vmgR-%i?Ki‡. mRKvi? g,m¨ KgK!¶\‡Dc mRKvi?i Ki.?$

মাছচাষ ব্যবস্থাপনায় সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমে উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের কারিগরি টীমের সদস্য হিসেবে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ক্ষেত্র সহকারীর করণীয় সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক) মাছচাষে নারীদের অংগ্রহণবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ

মাছচাষের মাধ্যমে প্রকল্পে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ক্ষেত্র সহকারী সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন। যেমন, পারিবারে কাউন্সেলিং করা, নারী-পুরুষ সমতা উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা ইত্যাদি। এতে নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন টেকসই হবে এবং ক্ষমতায়ন ঘটবে। যেমন, নারীদের পারিবারিক-সমাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি, দূরবর্তীস্থানে/সরকারি-বেসরকারি কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর ইত্যাদি কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ।

খ) উন্নয়নের মুলধারায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সিআইজির সদস্য হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা । এ ধরনের জনগোষ্ঠীদের প্রকল্পের সেবায় এনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা এবং ক্ষমতায়ন ঘটানো।

গ) মাছ চুরি/বিষ প্রয়োগ বন্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি

- প্রদর্শনী পুকুরের/বিলের মাছ চুরির বিষয়টি পূর্বেই বিবেচনায় এনে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য পরামর্শ প্রদান;
- পারিবারিক কিংবা সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত রেষারেষির কারণে বিষ প্রয়োগে মাছ মেরে ফেলা/বিলের আবাসস্থল নষ্ট করার মত ঘটনা ঘটলে পারস্পারিক আলোচনা, সমঝোতা, সামাজিক বিচার-শালিসীর মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার জন্য পরামর্শ প্রদান‰

ঘ) সামাজিক বন্ধন দৃঢ়করণ

মাছ বাজারজাতকরণের সময় প্রতিবেশী/আশপাশের লোকজন মাছ কেনার আগ্রহ প্রকাশ করলে তাদের কাছে বাজার দরে কিছু মাছ বিক্রি করার পরামর্শ প্রদান করা। এতে সামাজিক বন্ধন অটুট থাকে।

ঙ) এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২ ও এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-৩

এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২ ও এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-৩ সুষ্ঠভাবে পরিচালনায় সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করা। যেমন, প্রকল্পের অনুদানে ক্রয় করা সেচ পাম্প, মাছ পরিবহন ও বাজারজাতকরণের ভ্যান সিআইজিসহ অন্যান্য মাছচাষিরা যাতে ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে সিআইজিতে নীতিমালা প্রণয়নে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান ।

চ) দলীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি

নিয়মিত দলীয় সঞ্চয়ের পাশাপাশি আপদকালীন ব্যবহারের জন্য বিশেষ সঞ্চয় করার পরামর্শ প্রদান।

ছ) অভিযোগ নিরসন/প্রতিকার

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুফলভোগী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিযোগ বা ক্ষোভ থাকলে তা ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করা এবং তা নিরসন/প্রতিকার প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন কৌশল নির্দেশনা মোতাবেক দায়িত্ব পালন করা।

যেমন, প্রকল্পের নির্দেশনা মোতাবেক উপজেলা মৎস্য অফিসের সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বা সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা অথবা অন্য কোন কর্মকর্তাকে Grievance Redress Officer (GRO) হিসেবে মনোনীত করবেন এবং মনোনিত ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নম্বর দপ্তরের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সুতারাং সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট মৎস্য উপজেরা কার্যালয়ের Grievance Redress Officer (GRO) হিসেবে মনোনিত হলে

অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন কৌশল নির্দেশনা মাতাবেক দায়িত্ব পালন করবেন।

2)C mvgwRK mËv msOvH•Kv/Ügmg‡R !%viwK 6 cÖ‡ %b cÖS‡b mR‡/wM!v

সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নির্দেশ মোতাবেক সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ক্ষেত্র সহকারী প্রদর্শনী পুকুরসহ প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রমে পরিবেশগত সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়মিত তদারকি করবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, মৎস্য অধিদপ্তর চাহিদা মোতাবেক প্রযোজ্য সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নির্দেশ মোতাবেক সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রণয়নে সহযোগিতা করবেন। প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন ও মাছচাষিদের পরামর্শ প্রদান করবেন।

সর্বোপরি একথা বলা যায় যে, বর্ধিত জনস্যংখ্যার চাহিদার কথা বিবেচনা রেখে উত্তম মাছচাষ অনুশীলন-এর মাধ্যমে মাছ উৎপাদন করা হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক ও পরিবেশগত দিক দিয়েও সবাই উপকৃত হবে।

<u>g,m¨ msOvH•Av8b 6 w w4gvjv</u>

বাংলাদেশের মৎস্যবিষয়ক কয়েকটি আইন

মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব, এ সম্পদের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা প্রাপ্যতা এবং যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার মৎস্যবিষয়ক কতিপয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত মৎস্য বিষয়ক আইনসমূহ কয়েকটির সংক্ষিপ্তসার নিচে দেয়া হলঃ

মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০

দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিস এ্যক্ট-১৯৫০ সাধারনভাবে মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ নামে পরিচিত। নির্বিচারে পোনা মাছ নিধন মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধিতে বিরাট অন্তরায়। এ সমস্যা দূরীকরণে সরকার মাছের আকার, প্রজনন ও বৃদ্ধির সময়, বিচরণক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে কতিপয় বিধি নিষেধ আরোপ করে ১৯৫০ সালে এ আইন প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে বাস্তব প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে আইনটি সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নরুপ-

১. চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি কর্তৃক-

(ক) প্রতি বছর জুলাই হতে ডিসেম্বর (আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি হতে পৌষ মাসের মাঝামমাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটার (৯ ইঞ্চি) ছোট আকারের কাতলা, রুই, মৃগেল, কালবাউস, ঘনিয়া;

(খ) প্রতি বছর নভেম্বর হতে মে (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটার (৯ ইঞ্চি) ছোট আকারের ইলিশ (যা জাটকা নামে পরিচিত)।

(গ) প্রতি বছর নভেম্বর হতে এপ্রিল (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটার (৯ ইঞ্চি) ছোট আকারের পাঙ্গাস।

(ঘ) প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী হতে জুন (মাঘ মাসের মাঝামাঝি হতে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ৩০ সেন্টিমিটার (১২ ইঞ্চি) ছোট আকারের সিলন, বোয়াল ও আইড় মাছ ধরা, নিজের দখলে রাখা, পরিবহণ বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।

২. চাষের উদ্দেশ্যে মাছ ধরার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে (বর্তমানে সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা) নির্ধারিত ফি'র বিনিময়ে লাইসেন্স প্রাপ্ত না হলে বিধিবদ্ধ ২৭ টি নদী খাল ইত্যাদিতে নির্ধারিত সময়ে যে কোন আকারের রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস, এবং ঘনিয়া আহরণ বা আহরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৩. চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারণভাবে নদী-নালা, খাল ও বিলে সুযোগ আছে এরূপ জলাশয়ে প্রতি বছর ১ এপ্রিল হতে ৩১ আগস্ট (চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হতে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি) পর্যন্ত শোল, গজার, টাকি মাছের পোনার ঝাঁক বা দম্পতি মাছ ধরা ও ধংস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৪. জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নর্দমার উদ্দেশ্য ব্যতীত নদী-নালা, খাল ও বিলে অস্থায়ী বাঁধ বা কোনরুপ অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।

৫. নদী-নালা, খাল ও বিলে স্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে (ফিক্সড ইন্জিন) মৎস্য আহরন করা যাবে না, এরুপ ক্ষেত্রে স্থায়ী স্থাপনা অপসারণ এবং জব্দ করা যাবে ।

৬. বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার করে মাছ মারা যাবে না। অভ্যন্তরীণ জলাভূমিতে বিষ প্রয়োগ, পরিবেশ দূষণ, বাণিজ্যিক বর্জ্য বা অন্যবিধ উপায়ে মাছ ধংসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে ।

৭. মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সেন্টিমিটার বা তদাপেক্ষা কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁসজাল এর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

(ঘ) দি ফিস এন্ড ফিস প্রডাক্টস (ইন্সপেকশন এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ এবং মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৯৭ ।

১. লাইসেন্স ব্যতীত মৎস্য ও মৎস্যজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ, সরবরাহ ও রপ্তাণি করা যাবে না ।

২. মৎস্য প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরনের প্রতি ধাপে হ্যাসাপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ।

৩. অস্বাস্থ্যকর, পঁচা অথবা দূষিত মাছ প্রক্রিয়াকরণ অথবা রপ্তাণি করা বা সরবরাহ করা যাবে না ।

৪. স্বাস্থ্যসম্মত সার্ভিস সেন্টার/অবতরণ কেন্দ্র /ডিপো/আড়তের মাধ্যমে মাছ চিংড়ির প্রাথমিক পরিচর্যার কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

৫. মাছ/চিংড়ি চাষে এমন কোন এন্টিবায়োটিক, পেষ্টিসাইড, এমন কোন উপাদান ব্যবহার করা যাবে না, যা মাছের গুনগতমান নষ্ট করে।

৬. স্বাস্থ্যকরত্ব সনদপত্র ব্যতীত কোন মাছ রপ্তানি করা যাবে না ।

৭. প্রক্রিয়াকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট সমুদয় বিষয়দি পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শনযোগ্য ।

৮. স্বাস্থ্যকরত্ব সনদপত্র প্রদানের অযোগ্য মাছ বিনষ্টযোগ্য ।

৯. নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে লাইসেন্স, স্বাস্থ্যকরত্ব সনদপত্র নমুনা পরীক্ষা এবং আপপীলের সুযোগ গ্রহণ করা যাবে।

১০. বিধিমালায় যে কোন শর্ত ভঙ্গ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ।

(ঙ) মৎস্য হ্যাচারি ও মৎস্যচাষকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা

সরকার (শিল্প মন্ত্রণালয়ের পত্র নং – শিম/শিনি/-৩/চি-২/৯১/৩১, তারিখ: মে ২৬, ১৯৯৯) হ্যাচারি ও মৎস্যচাষকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃত পূর্বক হ্যাচারি ও মৎস্যচাষকে বিনিয়োগ তফসিলে হ্যাচারি ও মৎস্য চাষ উপ-খাতে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। বিনিয়োগ বোর্ডের প্রচলিত বিধি প্রয়োজনে এ শিল্প খতের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে ।

মৎস্য সংরক্ষণ আইনের বিধি, ধারা (১৯৫০) এবং শাস্তি

অপরাধের ধরন	বিধি	ধারা	শাস্তি
জলাশয়ে স্থায়ী বা অস্থায়ী মাছ ধরার যন্ত্র স্থাপণ	৩(৩এ)(১)	৫(১)	১-২ বছর জেল/পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড।
অস্থায়ী/স্থায়ী বাঁধ, কোন স্থাপণা নির্মাণ করা ।	৩(৩এ)(২)		

মাছ ধরার জালের ব্যবহার এবং জালের মেস সাইজ, তৈরি, বিপনন, আমদানি, বহন, পরিবহন, কাছে থাকা	৩(৩এ)(৩)	৫(২)	পরপর একই অপরাধের জন্য শাস্তি দ্বিগুণ।
বিস্ফোরক দ্রব্য/বন্দুক/তীর/ধনুক দিয়ে মাছ শিকার	৩(৩ বি)		
বিষ প্রয়োগে/পানি দূষণ/বর্জ্য নির্গমন/ মাছ শিকার	৩(৩ সি)		
নির্ধারিত মৌসুমে/সময়ে নির্ধরিত মাছ আহরণ নিষিদ্ধ	৩(৩ ডি)		
শুকিয়ে/পানি সেচ দিয়ে মাছ শিকার নিষিদ্ধ	৩(৩ জি)		
আটকৃত স্থায়ী বা অস্থায়ী স্থাপণা/মাছ ধররার যন্ত্র,মাছ ধরার জাল, করেন্ট জাল বাজেয়াপ্ত	৩(৪এ)		
আটকৃত মাছ, মাছ ধরার যন্ত্রপাতি, মাছ ধরার জাল, কারেন্ট জাল বাজেয়াপ্ত	৩(৪ বি)		
আটকৃত মাছ, মাছ ধরার যন্ত্র পাতি, মাছ ধরার জাল কারেন্ট জাল মাছ বিনষ্টকরণ	৩(৪ সি)		
নদী, খাল বা বিলের সাথে সংযুক্ত জলশেয়ে শোল, গজার বা টাকি মাছের ঝাঁক ধ্বংস (মে-আগষ্ট)	৩(৪ সি)		
নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত আকারের নির্ধারিত মাছ আহরণক, বিক্রয়, বহন, প্রদর্শন, পরিবহন, নিষিদ্ধ।	৪		
কোন ব্যক্তি কারেন্টজাল তৈরি, আমদানি বিপনন, সংরক্ষণ, করতে পারবে না ।	৪এ(১)		৩-৫ বছর জেল এবং সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা জরিমানা।
কারেন্ট জাল বহন, পরিবহন, কাছে রাখা বা ব্যবহার করা।	৪এ(২)		১-৩ বছর সশ্রম কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড।
আইনের আওতায় জব্দ দ্রাব্যাদি বাজেয়াপ্ত করা যাবে ।	৩,৪, ৪ক		
আটক ক্ষমতা (বিনা পরোয়ানায়)	৬ (১)	যদি নাম ও ঠিকানা গোপন থাকে অথবা নাম ঠিকানা গোপন রাখে ।	
আটক সময়	৬ (২)	যতক্ষণ নাম ও ঠিকানা নিশ্চিত হওয়া যায় ।	
অনুসন্ধান, আটক ও তদন্ত ক্ষমতা (মৎস্য অফিসার)	৬ (৪)	উপ-পরিদর্শক পদমর্যাদা পুলিশ অফিসার	আটককৃত কারেন্ট জাল ৩০ দিন পরে ধ্বংস করতে হবে। মালিক পাওয়া না গেলে ।
আমলযোগ্য অপরাধ	৭ (এ)		
মামলা রজু	৭ (বি)		মৎস্য অফিসার/উপ-পুলিশ পরিদর্শক
বিচারিক ক্ষমতা	৭ (সি)		মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট।
সামারি ট্রায়াল	৭ (ডি)		

মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৮৫ (১৬/১০/৮৫) এবং শাস্তি

অপরাধের ধরন	বিধি	ধারা	শাস্তি

নদী/খাল/বিলে ফিক্সড ইঞ্জিন নিষিদ্ধ	৩ (১)	৫(১)	১-২ বছর জেল/পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড।
নদী/খাল/বিলে স্থাপিত ফিক্সড ইঞ্জিন আটক, অপসারণ ও বাজেয়াপ্ত	৩ (২)		
কতিপয় উদ্দেশ্যে বাঁধ নির্মাণ নিষিদ্ধ	৩ (৪)		পরপর একই অপরাধের জন্য শাস্তি দ্বিগুণ।
বিষ্ফোরক দ্রব্য প্রয়োগে মৎস্য নিধন নিষিদ্ধ	৩ (৫)	৫(২)	
বিষ প্রয়োগে মৎস্য নিধন নিষিদ্ধ	৩ (৬)		
নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট মাছ ধরা ও নিধন নিষিদ্ধ	৩ (৭)		
নির্ধারিত জলাশয়ে কার্প জাতীয় মাছ ধরা নিষিদ্ধ	৩ (৮)১		
মাছ ধরার লাইসেন্স প্রদান	৩ (৮)২		
লাইসেন্স ফি ১০০/- টাকা	৩ (৮)৩		
মোহনা এবং উপকূলীয় জলাশয়ে মাছ/গলদা/ বাগদা চিংড়ির পোনা ধরা নিষিদ্ধ	৮(ওঅ)	৫(১)	
নির্ধারিত প্রজাতির নির্দিষ্ট আকারের মাছ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধরা, পরিবহন, প্রদর্শন, নিজের দখলে রাখা নিষিদ্ধ	৯		
বাজেয়াপ্ত মাছ, ফিক্সড ইঞ্জিন, জাল, খাঁচা, নৌকাসহ অন্যান্য মাছ ধরার সরঞ্জামাদি নিলামে বিক্রয় এবং সরকারি কোষাগারে জমা	১০	৫(২)	
বাজেয়াপ্ত মাছ গরীব, দুস্থ অথবা এতিমের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে।	১০ (১)এ		
আটককৃত মাছ ধরার সরঞ্জামাদিসহ নৌকা, ইঞ্জিন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রি করতে হবে।	১০ (১)বি		
মাছ ধরার জাল ৩জন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে নষ্ট করতে হবে।	১০ (১)সি		
নিলামে বিক্রয়লব্ধ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।	১০ (২)		
ব্যাঙ ধরা, বহন পরিবহন, প্রদর্শন	১১	৫(১)	১-২ বছর জেল/পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড।
যে কোন জালের ব্যবহার ও প্রেয়োগ পদ্ধতি নিষিদ্ধ	১২(১)এ		
জালের আকার এবং ফাসের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ	১২(১)বি		
জাটকা ধরা, বহন, পরিবহন, বিক্রয়, নিজের দখলে রাখা	১২(২)	৫(২)	পরপর একই অপরাধের জন্য শাস্তি দ্বিগুণ।
ইলিশ অভয়াশ্রমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ	১৩		
হালদা নদীতে মাছ আহরণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষিদ্ধ	১৪		

মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৮৫ (১৬/১০/৮৫) এবং শাস্তি

অপরাধের ধরন	বিধি	ধারা	শাস্তি
বাতিল	১৫		
পিরানহা মাছ আমদানি, বহন, প্রজনন, চাষ, বিক্রয় নিষিদ্ধ	১৬	৫(১)	১-২ বছর জেল/ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড।
শুকিয়ে অথবা পানি সেচে মাছ ধরা	১৭(১)		
শুকিয়ে অথবা পানি সেচে মাছ ধরার সরঞ্জামাদি আটক এবং বাজেয়াপ্ত হবে	১৭ (২)	৫ (২)	পরপর একই অপরাধের জন্য শাস্তি দ্বিগুণ।
আফ্রিকান মাগুড় আমদানি, প্রজনন, চাষ, বিক্রয় নিষিদ্ধ	১৮		

মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৮৫ (১৬/১০/৮৫) এবং শাস্তি

প্রজাতি	আকার	নিষিদ্ধ সময়	শাস্তি
রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ, ঘনিয়া	<২৩ সে: মি:	জুলাই-ডিসেম্বর	৫ (১) ১-২ বছর জেল/ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড। ৫ (২) পরপর একই অপরাধের জন্য শাস্তি দ্বিগুণ।
ইলিশ	<২৫ সে: মি:	নভেম্বর-জুন	
পাংগাস	<৩০ সে: মি:	নভেম্বর-জুলাই	
সিলন, ভোলা, আইড়	<৩০ সে: মি:	ফেব্রুয়ারী-জুন	
শোল, গজার, টাকি মাছের/পোনা ঝাঁক।		মে-আগস্ট	

মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০*

ধারা-৩: মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মৎস্য খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হইবেন।

ধারা-৪: লাইসেন্স ব্যতীত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইত্যাদি

এ আইন কার্যকর হইবার পর কোন ব্যক্তি ধারা ৬ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবেন না।

ধারা-৫: লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা মহাপরিচালক কর্তক এতদুদেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির কোন কর্মকর্তা লাইসেন্সিং কর্তপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবেন।

*আংশিক

ধারা-৬: লাইসেন্স প্রদান

১. কোন ব্যক্তি মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরন এবং আনুষঙ্গিক কর্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্ত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে আবেদন করিতে পারিবেন।

২. লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হইলে কর্তপক্ষ যদি সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী নির্ধারিত শর্তাবলি পূরণ করিয়াছেন তবে নির্ধারিত ফী আদায় করিয়া ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে লাইসেন্স প্রদান করিবে।

৪. এ আইন কার্যকর হইবার অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ, পরিবহন এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলিতে জড়িত কোন ব্যক্তি লাইসেন্সের জন্য আবেদন না করিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিবে।

ধারা-৭: লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন

১. এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর।

২. লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্ধারিত ফি সহ নবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করিতে হইবে।

৩. আবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ যদি সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী লাইসেন্সের শর্তাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করিয়াছে তবে আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নবায়ন ফি পরিশোধ সাপেক্ষে লাইসেন্স নবায়ন করিবেন অন্যথায় আবেদনটি নামমঞ্জুর করিবেন এবং লিখিতভাবে লাইসেন্স গ্রহীতাকে অবহিত করিবেন।

ধারা-৮: লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি

এই আইনের অধীনে প্রদেয় লাইসেন্স এর ফি ও নবায়ন ফি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ধারা-৯: লাইসেন্স বাতিল ও স্থগিতকরণ

১. কোন লাইসেন্স গ্রহীতা এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে কর্তপক্ষ যুক্তিসঙ্গত কারন দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া প্রদত্ত লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

২. কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা হইলে স্থগিত বা বাতিল আদেশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লাইসেন্স গ্রহীতা সরকারের নিকট নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে আপীল করিতে পারিবে এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩. আপীল আদেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

ধারা-১০: আদর্শ মাত্রা

১. সরকার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত মৎস্য খাদ্যের গুনগতমান বজায় রাখিবার লক্ষে বিধি দ্বারা মৎস্য খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের আদর্শ মাত্রা নির্ধারণ করিয়া দিবে এবং উক্ত আদর্শ মাত্রা অনুসরণ বাধ্যতামূলক হইবে।

২. মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে ও পরীক্ষায় আদর্শ মাত্রা না পাওয়া গেলে বা পুষ্টি বিরোধী কোন উপাদানের উপস্থিতি প্রমাণিত হইলে বা উহাতে মৎস্যখাদ্যের অযোগ্য বা ক্ষতিকর কোন দ্রব্যের মিশ্রণ পাওয়া গেলে উক্ত মৎস্যখাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে।

ধারা-১১: মৎস্য খাদ্যের মান নিশ্চিতকরণ

১. মৎস্য খাদ্যের মান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন উৎপাদক, আমদানিকারক বা বিক্রেতার নিকট হইতে নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করাইতে পারে।

২. পরীক্ষায় মৎস্যখাদ্য ব্যবহারের অনুপযোগী প্রমাণিত হইলে উক্ত মৎস্যখাদ্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং উহার আমদানিকারক, উৎপাদনকারী ও বাজারজাতকারী এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা-১২: ক্ষতিকর ও ভেজাল মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, বিক্রয়, পরিবহন ও বিপণন নিষিদ্ধ

১. কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এমন কোন মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি-রপ্তানি বিক্রয়, পরিবহন বা বিতরণ করিতে পারিবেন না:

ক) যাহাতে মানুষ, মৎস্য বা পরিবেশের জন্য কোন বিষাক্ত বা ক্ষতিকর পদার্থ থাকে।

খ) যাহা আদর্শমাত্রার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ।

৩. কোন ব্যক্তি উপরোক্ত বিধান লংঘন করিলে উহা অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

ধারা ১৩: পাত্র ও লেবেলিং

১. কোন মৎস্যখাদ্য বাজারজাত করা যাইবে না যদি-

ক) উক্ত খাদ্য অনুমোদিত পাত্র বা প্যাকেটে সংরক্ষিত এবং বায়ুনিরোধ অবস্থায় মোড়কজাত না হয়।

খ) উক্ত পাত্র বা প্যাকেটে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো উল্লেখ না থাকে,

যথা: ১) প্রস্তুতকারকের নাম ও যে দেশে প্রস্তুত সেই দেশের নাম;

২) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর;

৩) মৎস্যখাদ্যের প্রকৃত ওজন;

৪) বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের ও পুষ্টি উপাদানের নাম এবং শতকরা হার;

৫) মৎস্যখাদ্য চিহ্নিত করার জন্য প্রদেয় লট নম্বর বা অন্যবিধ উপায়;

৬) উৎপাদিত পণ্যের উৎস শনাক্তকরণ কোড;

৭) কোন জাতীয় মৎস্য খাদ্য তাহার উল্লেখ;

৮) উৎপাদনের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ;

ধারা-১৪: মৎস্যখাদ্যে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ

১. মৎস্যখাদ্যে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, স্টেরয়েড ও কীটনাশকসহ অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাইবে না।

২. কোন ব্যক্তি এই বিধান লংঘন করিলে উহা অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

ধারা-১৫: কারখানা বা সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রবেশের ক্ষমতা

মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যুক্তিসঙ্গত সময়ে কোন মৎস্যখাদ্য কারখানা ও উহার প্রাঙ্গণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি, মৎস্যখাদ্যের যে কোন উপাদান ও উপাদানসমূহ মজুদ করিবার স্থান, পরিবহনকারী যে কোন যান, বিতরণ কেন্দ্র বা এতদসংশ্লিষ্ট অন্য কোন স্থান বা যানবাহন এবং মাননিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যে কোন দলিল পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

ধারা-১৬: ক্ষতিকর ও ভেজাল খাদ্য বাজেয়াপ্তকরণ, বিনষ্টকরণ

১. কোন মৎস্যখাদ্য ক্ষতিকর ও ভেজাল প্রমাণিত হইলে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত মৎস্যখাদ্য এবং উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত পণ্য ও যন্ত্রপাতির সমুদয় বা কোন অংশ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

২. বাজেয়াপ্ত অস্বাস্থ্যকর বা পচা দূষিত বা ভেজাল মিশ্রিত মৎস্যখাদ্য মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনষ্ট করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

ধারা-১৮: অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ ও বিচার

১. মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

২. ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

ধারা-১৯: অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা

১. এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non cognizable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

ধারা-২০: দন্ড

যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনুরুপ অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব ৫০০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উক্ত দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ধারা-২১: অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা

ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইন অনুমোদিত যে কোন দন্ড আারোপ করিতে পারিবে।

মৎস্য/চিংড়ি চাষ/ হ্যাচারিতে ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ এবং অনুমোদিত রাসায়নিক সামগ্রী ও ঔষধপত্রের তালিকা (মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ তফশীল-৩)
LIST OF RESTRICTED & APPROVED DRUGS CHEMICALS FOR AQUACULTURE

গ্রুপ-এ (এৎড়ঁঢ়-অ) ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ রাসায়নিক সামগ্রী ও ঔষধপত্রের তালিকা) LIST OF RESTRICTED & APPROVED DRUGS & CHEMICALS ১। স্টীলবিনস এবং সহযোগী লবণ ও তার এ্যাস্টার (চিংড়ি হ্যাচারি/ খামারের জন্য উক্ত দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিতে হবে) ২। স্টেরয়েড। ৩। ইসি নির্দেশিত ২৩৭৭/৯০, ২৬ জুন ১৯৯০ এর সংযুক্ত ৪ এর উল্লেখিত ড্রাগসমূহঃ (ক) ক্লোরামফেনিকল (খ) ক্লোরোফর্ম (গ) ক্লোরোপ্রমাজিন, (গ) কোলছিসিন, (ঙ) ডেপসন, (চ) ডাইমেট্রিডায়াজল (ছ) মেট্রোনিডায়াজল (জ) নাইট্রোফিউরান, এবং (ঝ) রোনোডাজন ১, ২ ও ৩ নং ক্রমিকে বর্ণিত দ্রব্যাদির উপস্থিতি সম্পর্কে বছরে অন্ততঃ একবার পরীক্ষা করে তার		গ্রুপ-সি (এৎড়ঁঢ়-C) ক) নিম্নলিখিত রাসায়নিক সামগ্রী টঝঋউঅ এবং ঘঋও অনুমোদিত মাত্রানুসারে ব্যবহার করা যাবেঃ ১. কোরিওনিক গোনাডোট্রপিনঃ স্পনিঃ এর জন্য ব্রুডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। ২. ফরমালিনঃ প্রোটোজোয়া, মনোজেনেটিক ট্রেমাটোড এবং ফাংগাস নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা যাবে। খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হবে এমন কোন মৎস্য বা তার মাংসল অংশে ব্যবহার করা যাবে না। ৩. অক্সিটেট্রাসাইক্লিনঃ চিংড়ি ও মাছের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। ব্যবহারের কমপক্ষে ৩০ দিন পর মৎস্য ধরা যাবে। ৪. সালফাডাইমিথোক্সিন বা আরমেট্রপিন যৌগঃ চিংড়ি/ মৎস্যে ব্যবহার করা যাবে। ব্যবহারের কমপক্ষে ৪২ দিন পর মৎস্য ধরা যাবে। মৎস্যের মাংসল অংশে এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা ০.১ পিপিএম। (খ) বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের গ্রহণযোগ্য মাত্রাঃ নিম্নবর্নিত রাসায়নিক দ্রব্যাদির উপস্থিতি সম্পর্কে বছরে অন্ততঃ একবার পরীক্ষা করে এর প্রতিবেদন সংরক্ষণ করতে হবেঃ (১) লেড, (২) মারকারী,

প্রতিবেদন সংরক্ষণ করতে হবে।

গ্রুপ-বি (এৎড়ঁঢ়-ই)

প্রাণির চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা যাবে এমন ঔষধপত্র এবং তার অবশিষ্টাংশঃ

১। সালফোনিলামাইডস এবং কুইনোলনস।

২। (ক) অন্যান্য পশু বা প্রাণির চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ।

(খ) এ্যাসথালমিনটিকস।

৩। অন্যান্য দ্রব্য এবং পরিবেশ হতে মিশ্রিত অবশিষ্টাংশ-

(এ) চঙ্গইং সহ অরগানো-ক্লোরিন যৌগ।
(বি) অরগানো-ফসফরাসের যৌগ
(সি) রাসায়নিক পদার্থ।
(ডি) মাইকোটক্সিন।
(ই) রং।

৩ নং ক্রমিকের দ্রব্যাদির উপস্থিতি সম্পর্কে বছরে অন্ততঃ একবার পরীক্ষা করে তার প্রতিবেদন সংরক্ষণ করতে হবে।

গ্রুপ-সি (এৎড়ঁঢ়-C)

(ঘ) বিভিন্ন এন্টিব্যাকটেরিয়াল দ্রব্যের গহণযোগ্য মাত্রাঃ

(১) টেট্রাসাইক্লিনঃ ৫০.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(২) অক্সিটেট্রাসাইক্লিনঃ ৩০.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(৩) সালফামিথোক্সিনঃ ২৫.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(৪) সারফাডাইমিথোক্সিনঃ ২৫.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(৫) সালফাডায়াজিনঃ ২৫.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(৬) সালফাথায়াজিনঃ ২৫.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(৭) এমোক্সিসিলিনঃ ২৫.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(৮) অক্সিলিনিক এসিডঃ ৫.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(৯) ডাইফ্লক্সিনঃ১০.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(১০) ক্লোরোটেট্রাসাইক্লিনঃ ৩০.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(১১) সালফোনিলামাইডসঃ ৫০.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(১২) কোইনোলনসঃ ৫০.০ মি.গ্রাম/কেজি।

(৩) ক্যাডমিয়াম,
(৪) কপার,
(৫) আর্সেনিক,
(৬) জিংক।

(গ) বিভিন্ন কীটনাশকের গ্রহণযোগ্য মাত্রাঃ

(১) অরগানোক্লোরিন: ৫০.০ মা.গ্রাম/কেজি।
(২) পিসিবিএস (চঙ্গইং): ৫০.০মা.গ্রাম/কেজি।
(৩) এলড্রিন: ০.০২ মা.গ্রাম/কেজি।
(৪) ডিডিটি: ২.০ মা.গ্রাম/কেজি।
(৫) হেপ্টাক্লোর ২.০ মা.গ্রাম/কেজি।
(৬) ডাইএলড্রিন: ২.০ মা.গ্রাম/কেজি।

(ঙ) রোগ প্রতিরোধে চিংড়ি হ্যাচারিতে ব্যবহারযোগ্য রাসায়নিক সামগ্রী ও ঔষধপত্রের তালিকাঃ

১। ব্লিচিং পাউডার (৬০-৬৫% ক্লোরিন)।
২। সোডিয়াম হাইপো-ক্লোরাইড (তরল)।
৩। ফরমালিন (এল.আর)।
৪। ফরমালিন (কমার্শিয়াল)
৫। সোডিয়াম থায়োসালফেট।
৬। সোডিয়াম বাই-কার্বনেট।
৭। অক্সিটেট্রাসাইক্লিন।
৮। ট্রেফলন।
৯। ইডিটিএ।
১০। এ্যাকোয়াকালচার প্রো-বায়োটিক।
১১। জুথামসাইড/প্রোটোজোয়াসাইড।
১২। মিথিলিন-ব্লু।
১৩। ভিটামিন প্রি-মিক্স/মাল্টিভিটামিন/ভিটামিন-সি।
১৪। এম.আর -২২২ (চেতনা নাশক)।
১৫। কুইনালডিন (চেতনা নাশক)।
১৬। ক্লোভ অয়েল (চেতনা নাশক)।
১৭। খাবার লবণ, ছত্রাক নাশক ও জীবাণু নাশক।
১৮। প্রভিডন আয়োডিন।

মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ ভাদ্র ১৪১৮/ ১১ সেপ্টেম্বর ২০১১

এস,আর,ও নং ২৮৫-আইন/২০১১। - মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২নং আইন) এর ধারা ২২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ।-এই বিধিমালা মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায় -

(ক)''আইন'' অর্থ মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২ নং আইন);

(খ) ''আদর্শ মাত্রা'' অর্থ এই বিধিমালার ১০ এর তফসিল ৬ এ বর্ণিত মৎস্যের পুষ্টি সাধন ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মৎস্য খাদ্যে প্রয়োজনীয় মাত্রার উপাদান, যেমনঃ আমিষ, স্নেহ, শর্করা, ভিটামিন, খনিজ লবণ, আর্দ্রতা ভস্ম, আঁশ ইত্যাদি উপাদানের এবং সময় সময় মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রা;

(গ) ''কারিগরি জনবল'' অর্থ মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ ও সংরক্ষণাগারে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী;

(ঘ) ''খাদ্যদ্রব্য'' অর্থ তফসিল-৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ) এ বর্ণিত মৎস্যখাদ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ, উপকরণের মিশ্রণ, ফিড বাইন্ডার (ঋববফ নরহফবৎ), ফিড এডিটিভস (ঋববফ ধফফরঃরাবং) এবং খাদ্য সংরক্ষক (ঋববফ ঢ়ৎবংবৎধঃরাবং); এবং সময় সময় মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যদ্রব;

(ঙ) ''তফসিল'' অর্থ এই বিধিমালার কোন তফসিল;

(চ) ''ফরম'' অর্থ বিধিমালায় সংযোজিত কোন ফরম;

(ছ) ''ফিড প্রিজারভেটিভ'' অর্থ তফসিল-৪ এ বর্ণিত মৎস্যখাদ্যে মিশ্রিত উপাদান যাহা খাদ্য দ্রব্যের পুষ্টিমান ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করে;

(জ) ''ফিড এডিটিভস'' অর্থ তফসিল-৪-এ বর্ণিত মৎস্যখাদ্যে মিশ্রিত উপাদান যাহা পুষ্টিযুক্ত বা পুষ্টিবিহীন এবং খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়;

(ঝ) ''ফিড বাইন্ডার'' অর্থ তফসিল-৫-এ বর্ণিত খাদ্যে ব্যবহৃত এমন উপাদান যাহা খাদ্য উপকরণসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংযুক্ত করিয়া রাখে যাহাতে উপকরণসমূহ দ্রুত আলাদা না হইয়া পড়ে;

(ঞ) ''ফি'' অর্থ আইনের ধারা ৮ এর অধীন প্রদেয় বিধি ৫- তে উল্লিখিত ফি; এবং

(ট) "লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ" অর্থ আইনের ধারা ৫ এ সংজ্ঞায়িত কর্তৃপক্ষ।

৩। লাইসেন্স এর জন্য আবেদনের পদ্ধতি ও ফরম।—

(১) আইনের ধারা ৬ এর অধীন লাইসেন্সের জন্য কোন ব্যীক্ত বিধি ৪ এ উল্লিখিত কাগজপত্র ও তথ্যাদিসহ শর্তাবলী পুরণক্রমে ফরম ১ বা, ক্ষেত্রমতে, ফরম-২ বা ফরম-৩ এর মাধ্যমে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপবিধি-(১) এর অধীন আবেদনে উল্লিখিত তথ্য যাচাই বাছা ও বিবেচনার জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কারখানা, সংরক্ষণাগার, প্রতিষ্ঠান বা স্থান পরিদর্শন করিতে বা প্রয়োজনবোধে তৎসংশ্লিষ্ট যে অন্য কোন তথ্য চাহিতে পারিবেন।

(৩) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্র ও উহার সিহত সংযুক্ত তথ্য ও কাগজাদি যাচাই বাছাই করিবার পর সন্তুষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট কোড বা খাতে বিধি ৫ এ উল্লিখিত লাইসেন্স ফি পরিশোধের জন্য আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৪) আবেদনকারী উপ-বিধি (৩) অনুসারে অবহিত হইবার পর উল্লিখিত বিধি ৫ এ উল্লিখিত লাইসেন্স ফি নির্ধারিত খাতে পরিশোধ করিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ৬ এর বিধান সাপেক্ষে ফরম ৪ এ আবেদনকারী বরাবর লাইসেন্স ইস্যু করিবেন।

(৫) উপবিধি-(১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারী লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য বিধি-৪ এ উল্লিখিত শর্তাবলী পালন করিতে সক্ষম হন নাই, তাহা হইলে তিনি আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী না মঞ্জুর করিয়া ফরম ৫ এ আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

৪। লাইসেন্স প্রাপ্তির শর্তাবলী।-আইনের ধারা ৬ অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত ৩(তিন)টি ক্যাটাগরিতে উল্লিখিত শর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ক্যাটাগরি -১: মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপনন সংক্রান্ত লাইসেন্সের শর্তাবলীঃ-

(১) হালনাগাদ আয়কর সনদ থাকিতে হইবে;
(২) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদ থাকিতে হইবে
(৩) কারিগরি জনবল থাকিতে হইবে (বিধি ২ (গ);
(৪) তফসিল-১ ও ২ এ বর্ণিত সুবিধাদি বিদ্যমান থাকিতে হইবে ;
(৫) বার্ষিক মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতার তথ্যাবলি থাকিতে হইবে;
(৬) মৎস্যখাদ্য উপকরণের মাত্রা ও পুষ্টিমান নির্ধারণের জন্য তফসিল ৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ) এ বর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালন করিতে হইবে;

(খ) ক্যাটাগরি -২: মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত লাইসেন্সের শর্তাবলীঃ

(১) আমদানি ও রপ্তানি লাইসেন্স থাকিতে হইবে;
(২) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদ থাকিতে হইবে;
(৩) হালনাগাদ আয়কর সনদ থাকিতে হইবে;
(৪) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স থাকিতে হইবে;
(৫) তফসিল ২ এ বর্ণিত সুবিধাদি বিদ্যমান থাকিতে হইবে;
(৬) মৎস্যখাদ্য গুদামজাতকরণ উপযোগী, মানসম্মত ও প্রয়োজনীয় ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্থাপনা থাকিতে হইবে;
(৭) বি. এস. টি. আই (BSTI) হইতে পণ্যের মান সম্পর্কে প্রত্যয়ন থাকিতে হইবে; এবং
(৮) আমদানির ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রত্যয়ন থাকিতে হইবে।

(গ) **ক্যাটাগরি -৩: মৎস্যখাদ্য বিক্রয় সংক্রান্ত লাইসেন্সের শর্তাবলীঃ**

(১) বিক্রয়স্থলের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা থাকিতে হইবে;
(২) বাজার, হাট বা বন্দর নির্দিষ্ট দোকানঘর বা স্থাপনা থাকিতে হইবে এবং দূষণমুক্তভাবে মৎস্যখাদ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে;
(৩) হাল-নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স থাকিতে হইবে; এবং
(৪) মৎস্যখাদ্য মানসম্মত সংরক্ষণের উপযোগী স্থাপনা থাকিতে হইবে।

৫। লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি ও আপিল ফি।- এই বিধিমালার অন্যান্য বিধিনাবলী সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত হারে লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি ও আপিল ফি প্রদান করিতে হইবে।

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরি	লাইসেন্স ফি (টাকা)	নবায়ন ফি (টাকা)	আপিল ফি (টাকা)
১।	মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ (ক্যাটাগরি-১)	১০,০০০	৫,০০০	৬,০০০
২।	মৎস্যখাদ্য আমদানি ও রপ্তানি, সংরক্ষণ (ক্যাটাগরি-২)	১০,০০০	৫,০০০	৬,০০০
৩।	মৎস্যখাদ্য বিক্রয় পাইকারী (ক্যাটাগরি-৩ক)	১,০০০	৫০০	১০০০
৪।	মৎস্যখাদ্য বিক্রয় খুচরা (ক্যাটাগরি-৩খ)	৫০০	৩০০	৫০০

৬। মৎস্য খাদ্যে ব্যবহৃত এডিটিভস, ফিড বাইন্ডার এবং উপকরণের আদর্শমাত্রা।- (১) গুণগত মা বজায় রাখিবার লক্ষ্যে মৎস্যখাদ্য আইনের ধারা ১০ এর অধীন তফসিল ৪ এ উল্লিখিত এডিটিভস, তফসিল ৫ এ উল্লিখিত ফিড বাইন্ডার এবং তফসিল ৬ এ নির্ধারিত আদর্শমাত্রা থাকিতে হইবে এবং উক্ত আদর্শমাত্রা অনুসরণপূর্বক মৎস্যখাদ্য প্রস্তুত করিত হইবে।

৭। ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য।- আইনের ধারা ১৪ এর বিধান মোতাবেক মৎস্যখাদ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদির তালিকা তফসিল ৭ ও ৭(ক) এ নির্ধারণ করা হয়েছে।

৮। মৎস্য খাদ্যে উপকরণসমূহের আদর্শমাত্রা/পুষ্টিমান নির্ণয় পদ্ধতি।- (১) মৎস্যখাদ্যের উপকরণের আদর্শমাত্রা নির্ণয়ে বিধি ৯ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট নমুণা সংগ্রহকরতঃ নির্দিষ্ট মান নিয়ংত্রণ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করাইতে পারিবেন।

(২) বাণিজ্যিক মৎস্যখাদ্যের গুণগতমান ও পুষ্টিমান নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি দ্বারা নির্ণয় করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) আমিষঃ জেলডাল পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কোন পদ্ধতি;

(খ) তৈলঃ সলভেন্ট এক্সট্রাকসন (এসিটন/ইথার এক্সট্রাকসন) পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কোন পদ্ধতি;

(গ) জলীয়ঃ ১০৫$^{\circ}$-১১০$^{\circ}$ সেলিসিয়াস তাপমাত্রায় ওভেন ড্রাইং পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কোন পদ্ধতি;

(ঘ) ভষ্ম বা ছাইঃ ৬০০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৬(ছয়) ঘন্টা ফার্নেস বার্ণিং পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কোন পদ্ধতি;

(ঙ) আশঁ: সলভেন্ট এক্সট্রাকসন এবং এসিড ও অ্যালকালি পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কোন পদ্ধতি; এবং

(চ) শর্করাঃ আমিষ, তৈল, আর্দ্রতা, ছাই এবং আঁশের শতকরা হারে নিণর্য়কৃত মান বাদ দেওয়ার পর বাকী অংশ শর্করা হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

৯। মৎস্যখাদ্যের উপরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতি।- দেশে উৎপাদিত বা আমদানীকৃত কোন মৎস্যখাদ্য বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বাজারজাত করিবার যে কোন পর্যায়ে উহার মান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) মৎস্যখাদ্য উৎপাদক, প্রস্তুতকারক, আমদানীকারক, বিক্রেতা, মৎস্যখাদ্য উৎপাদন কারখানা, গুদাম, পরিবাহন বা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী বা পরিচালক বা সচিব বা ম্যানেজার বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি এবং লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যৌথভাবে সংগৃহীত নমুনা প্যাকেটবদ্ধ ও সিলগালা করিয়া প্যাকেট স্বাক্ষর করিবেন, তবে কেহ স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে সেই ক্ষেত্রে দুই জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে সংগৃহী নমুনা প্যাকেটবদ্ধ ও সিলগালা করিতে হইবে;

(খ) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংগৃহীত নমুনা ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে নির্দিষ্ট মান নিয়ংত্রণ ল্যঅবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিবেন;

(গ) নমুনা প্রাপ্তির অনূর্ধ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি মৎস্যখাদ্যের পরীক্ষার প্রতিবেদন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন;

(ঘ) কোন মাননিয়ংত্রণ ল্যাবরেটরি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরীক্ষার প্রতিবেদন বা ফলাফল দিতে অপারগতা প্রকাশ করিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুমোদিত অন্য ল্যাবরেটরিতে নমুনা প্রেরণ করিবে। কোন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি মৎস্যখাদ্যের গুনগতমান পরীক্ষায় অপারগতা প্রকাশ করিলে উক্ত ল্যাবরেটরী কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক সংগৃহীত নমুনা অবিকৃত অবস্থায় লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরত প্রদান করিবেন;

(ঙ) কোন মৎস্যখাদ্যে প্রস্তুতকারক পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতঃ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংগৃহীত নমুনা অন্য কোন অনুমোদিত মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মর্তা উক্ত খাদ্যের সংগৃহীত অন্য একটি নমুনা পুনঃপরীক্ষার জন্য অন্য কোন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে প্রেরণ করিতে পারিবেন;

(চ) কোন মৎস্যখাদ্য দুইটি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবটেরিতে পরীক্ষার পর ভিন্ন রূপ প্রতিবেদন বা ফলাফল পাওয়া গেলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত মৎস্যখাদ্যের নমুনা ৩য় কোন অনুমোদিত মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করাইতে পারিবে;

(ছ) কোন মৎস্যখাদ্য ৩টি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা ইহলে সেই ক্ষেত্রে দুটি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির পরীক্ষার ফলাফল অনুরূপ বা কাছাকাছি হইবে তাহার ভিত্তিতে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত মৎস্যখাদ্যের পুষ্টিমান বিবেচনা করিবেন; এবং

(জ) দফা (খ) এর ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ এবং দফা (ঙ) এবং (চ) এর ক্ষেত্রে মৎস্যখাদ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী বা প্রতিনিধি ল্যাবরেটরি পরীক্ষার খরচ বহন করিবেন।

১০। বাজেয়াপ্তকরণ।- কোন মৎস্যখাদ্য ক্ষতিকর বা ভেজাল প্রমাণিত হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ১৬ অধীন উক্ত মৎস্যখাদ্য এবং মৎস্যখাদ্য উৎপাদন কাজে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত পণ্য ও যন্ত্রপাতি সমুদয় বা কোন অংশ ফরম ৬ অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০

ধারা-৪: হ্যাচারি নিবন্ধন

১. নিবন্ধন কর্মকর্তাঃ সকল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা।

২. নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফরমে এবং ফি পরিশোধ সাপেক্ষে নিবন্ধন কর্মকর্তার নিকট আবেদন।

৩. আবেদনকারী আইন ও বিধি অনুযায়ী নিবন্ধনযোগ্য মর্মে নিবন্ধন কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হলে আবেদন প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সনদ ইস্যু অথবা নামঞ্জুরের কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে অবহিতকরণ।

৪. নিবন্ধনের তারিখ হতে ১ বছর পূর্ণ হওয়ার অন্যূন ৩০ দিন পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ফি পরিশোধ সাপেক্ষে নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে। (প্রতি বছর)।

৫. এই আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বে স্থাপিত ও চালু হ্যাচারির ক্ষেত্রে এই আইন চালু হবার ৬০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে।

ধারা-৫: নিবন্ধন ব্যতীত

হ্যাচারি পরিচালনায় নিষিদ্ধ কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন নিবন্ধীকরণ ব্যতীত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হ্যাচারি স্থাপন বা পরিচালনা করতে পারবে না।

ধারা-৬: সংকরায়নে বিধি-নিষেধ

১. সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন মৎস্য গবেষণা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি মাছের সংকরায়ন করতে পারবে না।

২. ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন ব্যতীত উদ্ভাবিত সংকরায়ন জাতের মাছ উৎপাদন বা চাষের জন্য অবমুক্ত করা যাবে না।

ধারা-৭: অন্তঃ প্রজনন নিষিদ্ধকরণ

কোন হ্যাচারিতে প্রণোদিত বা কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রে অন্তঃ প্রজনন করা যাবে না।

ধারা-৮: আমদানি সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি বিদেশ হতে কোন জীবিত মৎস্য, রেনু, পোনা বা পিএল আমদানি করতে পারবেনা।

ধারা-৯: পোনা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতীত কোন হ্যাচারিতে নিবন্ধন সনদে উল্লেখিত অনুমোদিত পোনা ব্যতীত অন্য পোনা উৎপাদন করা যাবে না।

ধারা-১০: হ্যাচারি নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন, প্রজাতি সংরক্ষণ ও মৎস্য উন্নয়ন

১. ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্কর্তা যে কোন সময়, যে কোন মৎস্য হ্যাচারি ও এর প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করতে পারবেন এবং উপকরণাদি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি যাচাই, প্রজননক্ষম মৎস্য রেণু, পোনা ও পিএল, যন্ত্রপাতি, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এতদসংক্রান্ত যেকোন লিখিত নির্দেশ দিতে পারবেন।

২. পরিদর্শনকালে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ পালনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাধ্য থাকবেন।

ধারা-১১: অননুমোদিত দ্রব্য জব্দ ও বাজেয়াপ্তকরণ

১. কোন হ্যাচারিতে বিধি দ্বারা অনুমোদিত দ্রব্য বা দ্রব্যাদি ব্যতিরেকে অন্য কোন দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে না।

২. কোন ব্যক্তি বিধি দ্বারা অনুমোদিত দ্রব্য ব্যতিরেকে অন্য কোন দ্রব্য ব্যবহার করলে তা বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে।

৩. উপধারা-২ এর কোন দ্রব্য বা দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্তযোগ্য হলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত দ্রব্য বা দ্রব্যাদি জব্দ করে সংশ্লিষ্ট হ্যাচারিতে বা নিজস্ব এখতিয়ারে ও জিম্মায় রাখতে পারবেন।

৪. ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, বাজেয়াপ্ত দ্রব্য বা দ্রব্যাদি ধ্বংস করা প্রয়োজন তাহলে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হবার পর কর্তৃপক্ষ তা ধ্বংস বা ক্ষেত্রমত নিলামে বিক্রি করতে পারবেন।

ধারা-১২: নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা

১. ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনে পরীক্ষার জন্য হ্যাচারির প্রজননক্ষম মৎস্য, মাছের আইশ, চিংড়ির খোলস, রেণু, পিএল , পোনা, মৎস্য দেহের যে কোন অংশ, মৎস্যখাদ্য সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যেরও নমুনা সংগ্রহ করতে পারবেন।

২. হ্যাচারিতে ব্যবহৃত সকল প্রকার দ্রব্যের পরিচিতি এবং তা সংগ্রহের উৎস প্রকাশ করতে হ্যাচারি মালিক বা হ্যাচারি পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বাধ্য থাকবেন।

ধারা-১৫: নিবন্ধন বাতিলকরণ

কোন হ্যাচারি মালিক বা হ্যাচারি পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি নিবন্ধনের কোন শর্ত ভঙ্গ করলে বা এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত হলে, নিবন্ধন কর্মকর্তা তাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করে উক্ত হ্যাচারির নিবন্ধন লিখিত আদেশ দ্বারা বাতিল করতে পারবেন।

ধারা-১৬: নিবন্ধন স্থগিতকরণ

নিবন্ধন কর্মকর্তার নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিবন্ধনের শর্ত যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে না বা শর্ত লংঘন করা হচ্ছে বা এই আইনের কোন ধারা বা তদধীন কোন বিধি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাহলে, নিবন্ধন কর্মকর্তা ,লিখিত আদেশ দ্বারা, এই আইনের অধীন অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সনদ সাময়িকভাবে স্থগিত করতে পারবেন।

ধারা-১৮: দন্ড

অনূর্ধ এক বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড বা ন্যূনতম ১,০০,০০০ টাকা হতে ৫,০০,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড (ধারা ৫, ৬, ৭ ও ৯ এর লঙ্ঘন)।

স্বর্বনিম্ন ২৫,০০০ টাকা হতে ১,০০,০০০ টাকা জরিমানা (ধারা ৫ ,৬ ,৭ ও ৯ ব্যতীত যে কোন ধারা লঙ্ঘন)। মৎস্য হ্যাচারি আইন , ২০১০ এর আলোকে প্রণীত মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১ অনুসরণপূর্বক মৎস্য হ্যাচারি পরিচালনা করতে হবে।